বাগ্‌দত্তা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

যাঁহাদিগের

পুণ্য চরিত্র চিরদিনের জন্য

জীবনের আদর্শ-স্বরূপে

গ্রহণ করিতে চাহিয়াছি,

সেই

পুণ্যশ্লোক এবং পুণ্যশ্লোকাগণের

শ্রীচরণ-কমলোদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র নির্ম্মাল্যটুকু

হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত
অন্যান্য উপন্যাস

মন্ত্রশক্তি	৪৷৷০
পোষ্যপুত্র	৪৷৷০
বাঙ্গা শাঁখা	১৲
হাবানো খাতা	৩৲
গবীবেব মেয়ে	৪৷৷০
পথেব সাথী	৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-৬

বাগ্‌দত্তা

নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে চিলের অশ্রান্ত স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিপ্রহরের তপ্ত হাওয়ায় চারাগাছগুলি ম্রিয়মান। ঝোপের মধ্যে নীল কাপড় পরা কচি মেয়েটির মতই অপরাজিতা ফুল সবুজ শয্যায় শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিয়াছে,—বাতাস খেলার সাথীর মতই তাদের উঠাইবার জন্য নাড়া দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু নিদ্রাতুর ফুলগুলি সে আহ্বানে সাড়া ত দিতেই ছিল না বরং তার তপ্ত শ্বাসে আরও শুকাইয়া উঠিতেছিল।

বৃহৎ পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর চারিধারে কলমের আম গাছ। গাছে এ বৎসর অজস্র মুকুল ধরিয়াছে, স্ফুটনোন্মুখ মুকুলদলে মধুপিপাসু মৌমাছিদের আনাগোনার অন্ত নাই। তাদের গুণ্‌গুণানি দূরশ্রুত সঙ্গীতের মতই উচ্ছ্বাস-মত্ত বাতাসের গায়ে ভাসিয়া ফিরিতেছিল!

সকাল হইতে বলয়-ঝঙ্কৃত কোমল কঠিন হস্তের আলোড়নের পর কিছুক্ষণ পুষ্করিণীর জল স্থির হইয়াছে। সমস্ত উদ্যান প্রকৃতিও সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠোত্থিত হাস্য রহস্য কোন্দল কোলাহল প্রতিধ্বনিত চঞ্চল দৃশ্যপট অপসৃত করিয়া শান্তির পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিল। প্রভাতের কর্ম্মোদ্দীপনার পাশে দাঁড়াইয়া মধ্যাহ্নের বিশ্রাম লক্ষ্মী সমস্ত জগতের উপর স্নিগ্ধ প্রশান্তি ঢালিয়া দিয়াছেন।

পুষ্করিণীর দক্ষিণ ধারে কেয়াবনের ঝোঁপের পরে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া একটি বালক বসুন্ধরার এই বিশ্রাম নীতি অগ্রাহ্য করিয়া এক নিরীহ জীবরাজ্যে আকস্মিক বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। বঁড়শি বাঁধা একগাছা ছিপ ফেলিয়া জলরাজ্যের অধিবাসী মৎস্যকুলকে ময়দার টোপে সে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ মৎস্য-গণের নিকট বিমানবিক্ষিপ্ত লৌহ গোলক বা মেঘান্তরালস্থিত মেঘনাদের

অস্ত্র-জালের মতই ইহা সংঘাতিক পদার্থ বলিয়া পরিচিত; কেবল মূঢ়বুদ্ধি শিশুগুলাই তাহা জানে না। সেই মৎস্য দুর্ল্লভ খাদ্য আহরণ করিতে গিয়া মারা পড়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বালকের উৎসুক দৃষ্টি 'ফাৎনার' স্পন্দন পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া আসিল, একটি চুনা পুঁটিও তাহার সহিষ্ণুতার পুরস্কার দিতে আসিল না। মাছগুলাও নির্লোভ হইয়া উঠিল না কি? ঐ বুঝি, ফাৎনাটা নড়িয়া উঠিল, না! ঐ—ঐ যে মাছে টোপ গিলিতেছে,—ঐ যাঃ—ছাড়িয়া পলাইল!

বিরক্ত বালক ছিপগাছা আছড়াইয়া ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল। মৎস্যজাতির অকৃতজ্ঞতায় মনে তার ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছে। তপ্ত বাতাসে একবার পুষ্করিণীর সমুদয় জলটার সহিত পার্শ্বস্থিত শালুকসহ শৈবালদল কাঁপিয়া উঠিল। ছায়াময় জলের স্থানে স্থানে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। চূর্ণ তরঙ্গে সেই রৌপ্য কিরণ ঝকমক করিয়া আরও খানিকটা রূপা ছড়াইয়া দিল। গাছের ডাল হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত একটা পাপিয়া অলস কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "পি-পি-পিউ কাঁহা?"—ছিপটা আবার জলে নামিল।

পিছন হইতে কে ডাকিল "সত্য!" ছিপধৃত হাতটার সহিত ছিপটাও নড়িয়া উঠিল,—টোপ গিলিতে উদ্যত মৃগেলশাবক চকিত হইয়া পলাইল। বিরক্তিপূর্ণ ক্ষোভে ছিপধারী অধর দংশন করিয়া ছিপগাছা ভূমে আছড়াইয়া ফেলিল,—দিনটা নেহাৎই বৃথায় গেল! যে তাহাকে দূর হইতে ডাকিয়াছিল, সে ব্যক্তি বৃক্ষচ্ছায়াঘন তীর হইতে নামিয়া পাশে আসিয়া তার বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "মাছ ধরে যে সুখে খাবে, তারও ত লক্ষণ দেখিনে! সমস্ত দিন বসে বসে হ'ল কি?" একে নৈরাশ্য, তাহার উপর অপমান! সত্যেন্দ্র এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কুঞ্চিত ভ্রূমধ্য হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার প্রশ্ন-কর্ত্তার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, তারপর প্রশান্তভাবে পবন-সঞ্চালিত সলিলোপরিস্থ শালুকপত্র পর্য্যবেক্ষণে মনঃসংযোগ করিল।

আগন্তুক ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "এত করে তোমায় বুঝিয়েও কিছু

করতে পারলাম না! ছি, ছি, সত্য, তুমি নিজের ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখচ না? চিরকাল কি ছেলেখেলা করে কাটান সাজে?"

ভৎর্সিত হইয়া সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্লান্তির সহিত গা ভাঙ্গিয়া আলস্যের স্বরে কহিল, "সকালে ত পড়েছি, কত পড়ব? ঐ যাঃ, মোটে একটা বাটা মাছ পেয়েছিলুম, তাও দেখচি, চিলে নিয়ে গেছে!"

"বেশ করেছে,—খুসী হয়েচি! আয়, অঙ্ক কষবি চল। ঐ কারা আসছেন, আমি যাই—দেরি করিসনে, আয়—"

বেলা পড়িয়া আসায় গ্রাম্য রমণীর দল কেহ কলসী কক্ষে, কেহ শূন্য কক্ষে পুষ্করিণীতে গা ধুইতে আসিতেছিল। দূর হইতে তাদের চাবি চুড়ি ও হাসির সাড়া পাইয়া মণীশ অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সত্যেন্দ্রকে তার জ্যেষ্ঠের উপদেশ পালনের জন্য ত্বরা করিতে দেখা গেল না। ছিপ প্রভৃতি মাছ ধরার সরঞ্জামগুলা নিকটস্থ কেয়াবনের ভিতর লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ সে প্রত্যাশিত নেত্রে আগন্তুক নারীদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সেই দলের মধ্য হইতে একটি মেয়েও দূর হইতে তাহার দিকে তাহারই মত উৎসুক দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে তাহাকে দেখিতে পাইয়া কালো আঙুরগুচ্ছের মত আপনার খাটো কোঁকড়া চুলের থর নাচাইয়া, চঞ্চল মৃগশিশুর মত সহর্ষ ধ্বনি করিয়া ছুটিয়া আসিল,— "সত্যদা, আজ কটা মাছ পেলে গা?"

"ঐ রে—পোড়ারমুখী ছিপ দেখতে পেয়েছে!" মেয়েটি কাছে আসিলে মুখ ভার করিয়া কহিল, "তুই সারাদিনে একবারও এলিনে কেন, বাঁদরি? যা মাছ ধরেছিলুম, সব চিলে নিয়ে গেল। আমি মাছ ধরব, না, চিল তাড়াব? আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে,— কটা মাছ পেলে গা!"

মেয়েটির নাম বাঁদরি নয়,—গৌরী। গৌরী তিরস্কারে লজ্জিত হইল না, বরং কৌতুক অনুভব করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল, "আচ্ছা—ক'টা মাছ চিলে নিয়েছে?"

এই অবজ্ঞার হাসি ও প্রশ্ন কোনটিই আজিকার সমস্ত দিনের জলযুদ্ধে পরাজিত নায়কের ভাল লাগিল না। তখনই সে রুষ্ট তর্জ্জনের সহিত খিঁচাইয়া উঠিল, "একশোটা—"

"সত্যি বলই না।"

"দশটা।"

"দশটা—ইঃ। দশ থেকে একটা বাদ দিলে যা থাকে, তাই বুঝি? ঠিক বল ত সত্যদা?"

সত্য ছিপটাকে লইয়া শূন্যে আস্ফালন করিয়া বেশ একটু জোরেই তাহা বিদ্রূপকারিণীর পৃষ্ঠে ছপাৎ করিয়া বসাইয়া দিল, "এই যে,—দেখাচ্ছি কটা!—আর চাই?"

যদিও এই কৃত্রিম কশা গৌরীকে নিজের প্রভাব জানাইয়াছিল, তথাপি গৌরব-রক্ষার্থে সে হাসিয়া অম্লান স্বরে কহিতে লাগিল, "বেশ, বেশ, মারো না, যত খুসী মারো,—আমার ত আর হাত নেই? আমি ত শোধ নিতে জানিনে? এক, দুই, তিন, চার—আচ্ছা তোলা রইল।"

এতক্ষণে অন্য অন্য মহিলাগণ পাড়ের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন—তাঁদের দলের সকলেই প্রায় প্রবীণা বা প্রৌঢ়া, দুই একজন যুবতী ও বালিকা ছিল, তাহারা সকলেই দেশের 'ঝিউড়ি-ছেলে', যে দুইএকটি বধূ ছিল, তাহারা কিশোর সত্যকে দেখিয়া বক্ষকুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনের মাত্রা বর্দ্ধিত করিল না। কারণ পাড়ায় এমন কোন বধূ ছিল না, যাহার জন্য গাঙ্গুলিদের 'পাগলা সত্য' একদিন না একদিন ফলটা আমটা সওগাত সংগ্রহ করিয়া দিয়া পারতে এক লেচিভোর মাথা-ঘষা, বা একটা পানের খিলি, বা এমনই কিছু না কিছু সামগ্রী আদায় করিয়া আনিয়াছে। এই দলের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা ও বধূ ছিলেন। গৌরীর মাতুলানী তাঁর ননন্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওগো দেখচো, মেয়েটাকে চাবুক পেটা করে দিলে! যেমন দস্যি মেয়ে তা হবে না ত কি? বেশ হয়েছে।"

কথাটা সত্য এবং গৌরী দুই জনেরই কানে গেল। ফস্ করিয়া ছিপ সত্যর হাত হইতে টানিয়া লইয়া গৌরী তার ডগা দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর পৃষ্ঠে একটা গুরুতরকম আঘাত বসাইয়া হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুট দিল। "কেমন মজা!—এখন? আমায় চাবুক পেটা করা মুখের কথা!"

ছেঁড়া গেঞ্জির ভিতর দিয়া পিঠের উপর আঘাতটা বেশ ভাল করিয়াই পৌঁছিয়াছিল। আচম্কা আক্রান্ত হওয়ায় আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ সত্য নিজ

অপমানিত বোধ করিয়া রাগিয়া গেল। পিঠে একবারমাত্র হাত বুলাইয়া সে তার দিকে ছুটিল। "বোস্ ত বাঁদরমুখী! দেখাচ্চি তোকে,—এত জোরে কি আমি তোকে মেরেছিলুম?—কক্ষন না।"

ছুটিতে ছুটিতে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া গৌরী তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "না বই কি! নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি,—বা রে ছেলে!"

বাগানটাকে চক্র দিয়া যতক্ষণ পারিল, দুজনে ছুটিল; তারপর গৌরী স্বেচ্ছায় শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবু, না হয় তুমিও আমাকে তেমনি জোরেই মার, তা হলে ত শোধ যাবে?"

সত্য পরাজিত শত্রুর প্রতি আলেকজাণ্ডারের চেয়ে কিছুমাত্র অল্প মহত্ত্ব প্রদর্শন করিল না। একটু পরে দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে যখন পুকুরধারে ফিরিয়া আসিল, তখন ছায়ানিবিড় বন-বীথির উপর হইতে সশঙ্ক সান্ধ্য অন্ধকার মৃদু চরণে জলের উপর নামিয়া আসিতেছিল। পল্লীনারীগণ, ভরাকুম্ভে যে যার গৃহ পথে চলিয়া গিয়াছে, কেবল আর্দ্র বসনে কুম্ভকক্ষে দাঁড়াইয়া একজন চারিদিকে উৎকণ্ঠাদিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিতে করিতে ডাকিতেছেন, "রাণি!"

সত্যর হাত ছাড়িয়া গৌরী ছুটিয়া কাছে আসিল, "তুমি এখনও বাড়ী যাওনি মাসিমা? গেলে না কেন, সত্যদা আমায় পৌঁছে দিত।"

মাসিমা তিরস্কারের ভাষা প্রয়োগ না করিয়া মৃগশিশু-চঞ্চলাকে কাছে টানিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "চল মা! বাড়ী যাই দেরী হয়ে গেছে।"

দুই

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে গ্রামের 'মেরুদণ্ড' বলিয়া পাঁচজনে আখ্যা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি ছিল না। বিদ্যাবুদ্ধিতে ত বটেই, এ ছাড়া সহৃদয়তার জন্যই তাঁর খ্যাতি দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামান্তরের যে কোন বিবাহ সভায় বা রোগশয্যা পার্শ্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্ভুল নিমন্ত্রণ, বিয়োগ কাতরা জননী ও সদ্য বিধবার সান্ত্বনার ভার তাঁহারই ইজারা করা; দুঃখের কারণ ভুলাইয়া দুঃখকে দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া আশার দ্বারা দুঃখকে সহনীয় করিয়া তিনি দুঃখের মূল চিত্তকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সকল স্থানেই যে কিয়ৎপরিমাণে সফলও না হইতেন, এমন নয়।

আশ্রম নিয়ম যাহা ভারতবর্ষ হইতে বহু দিন বিদায় লইয়া কাল সমুদ্রের তরঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইয়াছে, তাহারই পুনরাবর্ত্তন প্রয়াস করিয়া উমাকান্ত আপনার অধ্যয়ন কাল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে কাটাইয়া অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার পর দূর পল্লীগ্রামের হরিকিঙ্কর ন্যায়তীর্থের কন্যা গঙ্গামণিকে বিবাহ করিয়া যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন সরস্বতীর পাশে গৃহলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করা হইল। সত্যই তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা।

দেশ হইতে পাণ্ডিত্যের আদর তখনও এতখানি কমিয়া যায় নাই, বিবাহে, উপনয়নে, আদ্য এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় গৃহস্থগণ তখনও বিশেষ কল্যাণকর মনে করিতেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেজন্য অর্থাভাব ছিল না, বরং নূতন বস্ত্র ও পিতলের ঘড়ায় ছোট কুঠ্‌রিটি পূর্ণ থাকিত। কিন্তু যখনই কোন গরীব পিতার কন্যাদায়ে অথবা পুত্রের পিতৃ কর্ত্তব্য পালনে অনাটনের সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর হইত, তখনই বাড়ীর ও টোলবাড়ীর ছেলেদিগকে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন গুজরান করিতে হইত। পাক-কারিণী গঙ্গামণির জন্য হাঁড়িতেও সবসময় অবশিষ্ট থাকিত না।

রাজগৃহ হইতে সভাপণ্ডিতের পদ ও বিদ্যালয় হইতে অধ্যাপকত্ব গ্রহণের জন্য বার কয়েক আহ্বান আসিয়াছিল,—সে সব পূর্ব্বেকার কথা। এ

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রবীণ হইয়াছেন। ব্রহ্মতেজে দীপ্ত শরীর যদিও জরার করস্পর্শে হীনতেজ হয় নাই, শরীরের মত মনের উপরও অবসাদ বা ক্লান্তি তার সর্ব্বনাশি ছায়াপাত করিতে সাহস না পাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি উপযুক্ত পুত্রের হস্তেই এখন তিনি নিত্য অধ্যাপনার ভার দিয়া পর-হিত সাধনের অবসরই বাড়াইয়া লইয়াছেন।

উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভক্তিনাথ পিতৃনির্দ্দেশানুসারে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ৺কাশীধাম হইতে ন্যায়ের প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও পিতৃ-প্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত সমাজে বরণীয় হইয়াও উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ছোট ছেলে শচীকান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম লইলে যে ভাগ্য বহন করা এ দেশের ঋষি-গঠিত আইনের আদেশ এবং যে বিলাস বর্জ্জিত সহজ সরলতার বলে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেণীর উর্দ্ধে আসন বিস্তার করিয়াছিলেন, শচীকান্তের স্বভাবের মধ্যে সেই জিনিসের মস্ত অভাব ছিল। ভোগসুখকেই পরমার্থবোধ থাকায় উচ্চ পদে ও উত্তম আহার-বিহারে যে একটা প্রবল স্পৃহা থাকে, সেইটুকু জন্মগত ছিল তার।

ছেলেবেলা হইতে ভক্তিনাথ বিনীত, স্বল্পভাষী, গম্ভীর এবং কষ্টসহিষ্ণু। শচী কোন মতেই দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারিত না। মোটা চাল চলনে চলিতে সে একেবারেই নারাজ। ইহা লইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইতে কোন দিনই সে কুণ্ঠিত নয়। বড় হইয়া শচী বলিল, সে সংস্কৃত পড়িবে না, ইংরাজী পড়িবে, এবং ইহার স্বপক্ষে এমনই জিদ যে নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পিতাকে অবশেষে সম্মতি দান করিতে হইল। প্রসন্ন মুখ চিন্তাগ্রস্ত করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে—অনাচারী অব্রাহ্মণ হয়েই যখন জন্মেছে, তখন তাকে কে বাধা দেবে? যাক্, ওর প্রারব্ধের পথেই ও যাক্।"

ইংরেজী পড়া চলিল। গ্রামের পর নিকটবর্ত্তী সহরে, এবং পরে কলিকাতায় সে বিদ্যা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এখন সে কলিকাতার মেসে কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী ইতঃমধ্যেই তাঁর প্রবেশদ্বার মুক্ত করিয়া এই ভক্তটিকে আপনার কনক মন্দিরে ডাকিয়া

লইয়াছিলেন! চোখে সোণা বাঁধানো চশমা এবং ঘরের মধ্যে একটি বক্স হারমনিয়মই তার সৌখীনত্বের যথেষ্ট পরিচয় নয়, মরক্কো বাঁধা সোণার জলে নাম ছাপান ছোট খাতাখানির প্রতি পৃষ্ঠা নূতন ছন্দে ও ভাবে পূর্ণ হইয়া এক দিকে সুভব্য রুচি ও অপর দিকে কবি যশঃপ্রার্থী হৃদয়েরও সন্ধান বলিয়া দেয়। শচীকান্ত আধুনিক হরি, মধু, বিপিনের মত নিতান্ত নিরাশ-কবিও নয়। বন্ধু মহলে তার কবিতা উচ্চ প্রশংসা লাভ করিত; এবং তার মত ক্ষমতাশালী বন্ধুলাভে তারা যে গৌরবান্বিত এমন কথাও উচ্ছ্বসিত চিত্তে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করিত না। এসবই ঘটিয়াছিল শচীকান্তের মাসিমার সহায়তায়।

মণীশ ছেলেটা সকল বিষয়েই বন্ধুর বিপরীত। যদিও সে শিক্ষা দীক্ষায় শচীকান্তের চেয়ে হীন ছিল না, তথাপি নিজের সেই সাধারণ দুর্লভ শক্তিকে সে তার মত দর্পিত বিস্ময়ে বরণ করিয়া লইতে সক্ষম হয় নাই, বরং নিজের সহস্র ছোট খাট অক্ষমতার খুঁৎ টানিয়া লজ্জায় খিন্ন হইত। একদিকে যেমন সে পরোপকারী, সহৃদয়, অন্য দিকে তেমনই মুখচোরা লাজুক। তার এই নারী প্রকৃতি তার সঙ্গী সহচরদিগের নিকট পদে পদে তাহাকে অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ করিবার বেশ একটু সঙ্গীন উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাদের অনেকের নিকট হইতে সে যেসকল পত্র পাইত, তাহাতে সম্বোধনপদে তার নামের ঈষৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া মণীশের পরিবর্ত্তে, 'মনীষা'—এই নারীজনোচিত পাঠ দেওয়া থাকিত। মণীশ ইহার বিরুদ্ধে দুই একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলিয়াই নিরুপায়ে আরক্ত গণ্ডে চুপ হইয়া গিয়াছিল। তাদের বিদ্রূপকুশল লিপিযুদ্ধে সে নিরস্ত্র, নিরীহ,—পারিয়া উঠিত না। কাজেই নামটা বন্ধুমহলে বিস্তার লাভই করিতেছিল। বলা বাহুল্য, এই কলির শিখণ্ডীপদে তাহাকে আরূঢ় করাইয়াছিল, তারই আশৈশব-বন্ধু, কবি শচীকান্ত।

দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রতেজে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত তাতিয়া উঠিয়াছিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া রৌদ্রতপ্ত হাওয়া মধ্যে মধ্যে বকুল ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। দেওয়ালের একটা বড় ফাটলের ভিতর হইতে কপোতের বিশ্রামকুজন স্বপ্ন লোকের পার হইতে ভাসিয়া আসা ধ্বনির

মতই শুনাইতেছিল। এমন সময় কোঁচার কাপড়ে ঘাম মুছিতে মুছিতে শচীকান্ত ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "মণীশ আছিস?"

মণীশ ঘরেই ছিল। জানালার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল; মুখ ফিরাইল, "এস, এস,—"

"কি করছিস্? দপ্তরখানার দলিলের মত—কি ওগুলো?"

মণীশ ঘরের একমাত্র চৌকিখানা বন্ধুর দিকে সরাইয়া দিয়া মৃদু হাসির সহিত জবাব দিল, "ওগুলো দলিলই বটে! কাকা মেলাতে দিয়েছেন।"

শচী কহিল, "কল্‌কেতা গিয়ে তুই তবু বেঁচেছিস। কতকগুলো বাজে খাটুনি খাটতে হয় না।"

মণীশের সঙ্গে বন্ধুর এইখানেই বিরোধ। শচীকান্ত সমস্ত বিনয় বাধ্যতার গণ্ডী ছাড়াইয়া নিজের প্রতি সাহঙ্কার সহানুভূতিতে চাহিয়া দেখিত, মণীশকে তাহা শুধু আঘাত দিত, এমন নয়, আতঙ্কিতও করিত। বন্ধুর সমালোচনায় ঈষৎ ব্যাহত হইল এবং বলিয়া উঠিল, "ভালটা কি হয়েছে? আমি থাকি না, সত্য ছেলে মানুষ, কাকার নিজেকেই সব করতে হয়।—তুমি আবার সেখানে কি করতে গিয়েছিলে?"

শচীকান্ত কহিল, "ছিপ ধরে দেখছিলুম, বঁড়সিতে মাছটা গাঁথে কি না!"

"সত্যর মত? তারপর কি হল? গাঁথল? না, বসে থাকাই সার হল।"

"গাঁথে গাঁথে, এমন সময় দাদার জোর তলব গেল,—আর গাঁথল না।"

মণীশ হাসিয়া কহিল, "সত্যও ঠিক এই কথাই বলেছিল! না, না. সত্যি,—ব্যাপারখানা কি—খুলেই বল না। ছুটীতে বাড়ী থাকতে ইচ্ছে হয় না? আশ্চর্য্য!"

"আচ্ছা, বলছি, শোন, কিন্তু দেখো, এখন কাউকে কিছু বলে ফেলো না যেন। আমাদের মেসের দুটো বাড়ী উত্তরে একটা হল্‌দে বাড়ী আছে, দেখেছ?"

"হ্যাঁ, কোন্ এক ডাক্তারের বাড়ী শুনেছি। নামটা মনে নেই, কি যেন মুখুয্যে—?"

"নিখিল মুখুয্যে, ডাক্তার। তার একটি বোন আছে। মধ্যে মধ্যে

জানালায়, বারান্দায়, সে কাপড় তুলতে বা রাস্তার কোন হুজুক দেখতে এসে দাঁড়ায়—দেখেছিস ?”

মণীশ আরক্ত হইয়া উঠিল, কোন্ গৃহ-বাতায়নে কোন্ কুতূহলী ভদ্রমহিলা অবস্থিতি করিতেছেন, সে খপর সে কি দরকারে রাখিতে যাইবে ?

“তবে তুই বুঝতেই পারবি নে।”

এই বলিয়া শচীকান্ত তার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। “সে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রতিমা! বিশ্বের সমস্ত কবিকুঞ্জ ত্যাগ করে কাব্যলক্ষ্মী সেই ছোট্ট বাড়ীখানার মধ্যে তাদের কি পুণ্যে যে আবির্ভূতা হয়েছেন, তা ভেবেই পাইনে! এখন খুব মজা হয়েছে—সেই কথাই বলছিলুম—তার ভাই তাদের সেই কোহিনুরটিকে আমার হাতে দান করতে চায়। আর বুঝতেই পারছ, এমন হস্তিমূর্খ পৃথিবীতে কেউ নেই যে, করতলাগত রত্নকে ত্যাগ করে।”

মণীশ সবিস্ময়ে তার স্বপ্নবিভোর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, পরে কহিল, “সে কি ? তারা যে মুখুয্যে ! রাঢ়ী শ্রেণী।”

“ঐ ত! ঐখানেই ত হচ্ছে মজা! ওরা মনে করেছে আমিও রাঢ়ী-শ্রেণীর। তা হোক, তাতে ক্ষতিটাই বা কি ? রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিয়ে চলে, এটা কি সমাজের পক্ষে শুভ নয় ?”

মণীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল,—সে কহিল, “শুভ বই কি! কিন্তু এ'কি তাই ? মিথ্যা দিয়ে এত বড় কাজটা তুমি করতে চাচ্ছ! যখন তারা জানতে পারবে যে তুমি তাদের ঠকিয়েছ—! না, না, তুমি ঠাট্টা করচ। এত বড় জুয়াচুরি কি করতে আছে ?”

শচীকান্ত বিরক্ত হইল, মণীশের এত বাড়াবাড়ি কোন দিনই তার ভাল লাগে না। বিদ্রূপে বিরক্ত ভাব ঢাকিয়া বলিল, “জুয়াচুরি কি ? জাহাঙ্গীর নুরজাহানের জন্য কি করেছিল ?”

“সেই কি সাধুতার উদাহরণ ?”

“না হোক, এতে ধর্ম্মতঃ কোন পাপ হয় না।”

মণীশ একথা মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে বলিল, “তোমার বাবা মত করবেন কি ? তিনি ত তাদের কিছু লুকোবেন না। তার চেয়ে

তাঁকেই কেন সব বল না। তিনি জ্ঞানী লোক উচিত বোধ হয়ত তাদের বুঝিয়ে মত করাতে পারেন। এ যদি হয় তাতে সমাজেরও মঙ্গল।"

শচীকান্ত আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিরক্তির সহিত হাসিয়া উত্তর দিল, "ক্ষেপেছ! তিনি কোন মতেই মত দেবেন না। বিয়ের পর তখন তাঁকে বলব, এখন ঘুণাক্ষরেও না। তারা জানে আমার কেউ নেই। চল্লুম।"

মণীশ বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত দুই চক্ষু তীব্র ভর্ৎসনায় পরিপূর্ণ করিয়া বন্ধুর দিকে চাহিল, কহিল, "ছি, শচি!"

তিন

হরিনারায়ণ ও শিবনারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া দেশের লোক ত্রেতা যুগের রাম লক্ষ্মণ ও দ্বাপরের পাণ্ডবকে স্মরণ করিত। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত সামান্য নহে।

হরিনারায়ণ বয়সে বড় হইলেও উপার্জ্জনে শিবনারায়ণই বড় হইতে পারিয়াছিলেন, তাই বলিয়া যে হরিনারায়ণ তাঁর কনিষ্ঠের চেয়ে জ্ঞানবুদ্ধিতে খাটো ছিলেন, তাহা নয়। তিনি ইংরাজি বিদ্যা শিখেন নাই। ইহার গৌণ কারণ, ইংরাজি শিক্ষা এখনকার মত তখন গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজ লভ্য ছিল না। কিন্তু আসল কারণ, স্বদেশী ভাষার প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ। পাছে ইংরাজি শিখিতে গিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয়,—যেমন সে সময় অনেক নব্য ইংরাজিওয়ালাদের মধ্যে ঘটিতেছিল,—সেই ভয়ে তিনি কৌতূহল সত্ত্বেও ঐ জনমুগ্ধকারী অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার প্রয়াস পান নাই। কিন্তু শিবনারায়ণ যখন মস্তকে শিখা রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া "সহর্ণেঘঃ" প্রভৃতি মুগ্ধবোধের সূত্র এবং "অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা যাত্রাকালে তু মধ্যমা" ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্র মুখস্থ করিতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া ছিলেন, তখন জ্যেষ্ঠের আদেশ হইল, "কাল থেকে তুমি ইংরাজি পড়তে আরম্ভ কর।" এ আদেশ কনিষ্ঠ শিবনারায়ণের নিকট তেমন স্নেহ সম্ভাষণ বলিয়া মনে হয় নাই—তাই ব্যথিত বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "কেন দাদা?"

"ভেবে দেখলাম, আজকালকার দিনে শুধু দেবভাষায় চলবে না। তোমায় চিরদারিদ্র্যে থাকবার ব্যবস্থা আমি কেমন করে দেব?"

হরিনারায়ণ নিজের অল্প আয় হইতে পয়সা বাঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ তাঁদের ছিল, তার আয় হইতে মোটা ভাত কাপড়ের অনাটন পড়িত না। এমন কি সম্বৎসরের খরচ চালাইয়া বড় বধূর জন্য রূপার পৈঁছা ও সোণার পাঁচনর গড়ানও হইয়াছে, দুইটি ঢেঁড়ি ঝুমকা বা পাইতে তাঁর বাকী।

কিন্তু এই সময় হঠাৎ বৌঠাকুরাণীর ঝুমকা পরার সাধে বাদ পড়িল। এমন কি পাঁচনর ছড়াও দেবদারু কাঠের সিন্দুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া

পোদ্দারের কাছে যাচাইয়ের জন্য চলিয়া গেল। শিবনারায়ণকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য হরিনারায়ণের কিছু মোটা টাকার প্রয়োজন।

যাহা হৌক সস্ত্রীক অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও দাদা ছোট ভাইকে পড়ার খরচ নিঃশব্দে জোগাইয়া চলিলেন, ইহার জন্য যতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল, একদিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ করিলেন না; মনে একমাত্র আশা, শিবু মানুষ হইলে তাঁহার সকল দুঃখ ঘুচিবে।

এরূপ স্থলে সাধারণতঃ বিপরীত ফলই ফলে,—কিন্তু হরিনারায়ণের সুকৃতির বল ছিল। ছোট ভাই শিবনারায়ণ পড়াশুনায় কৃতী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কৃতিত্বের যে প্রধান বিভূতি তাহা লাভ করিতে পারিলেন না। না উঠিল চোখে চশমা, না পড়িল পেলিটির হোটেলে পায়ের ধূলা,—এমন কি দোলাই গায়ে, চটি পরা, পাড়াগাঁয়ে দাদা ও হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া মলিন বসনা বৌদিদির পায়ের ধূলা মস্তকে লইতে লজ্জা সঙ্কোচও দেখা গেল না।

তখনকার দিনের পাশ করা ছেলেদের জীবনযাত্রা এখনকার মত সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়ায় নাই। শিবনারায়ণ মোটা মাহিনায় সুদূর পশ্চিমে চাকুরী লাভ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল দাদা প্রথমে স্নেহের ভাইকে স্নেহহীন দূর দেশে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষে চারিদিক ভাবিয়া দেবদেবীগণের মাঙ্গল্য ও অকৃত্রিম আশীর্বাদের সহিত অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। বৌদিদি ঠাকুরপোকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস না করিয়া সঙ্গে গেলেন।

কিন্তু অধিক দিন তাহাকে ঠাকুরপোর সংসার দেখিতে হয় নাই। শিব-নারায়ণের বিবাহের অল্পদিন পরেই তার মৃত্যু হইল। তারপর সহসা একদিন হরিনারায়ণেরও ডাক পড়িল,—কিন্তু তখন আর মনে ক্রুত আন্দোলনের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ জাগিল না। সোনার সংসার ধনে মানে যশে পূর্ণ হইয়া মা কমলার কৃপা কটাক্ষে উথলিয়া উঠিতেছিল। ঠাকুর দালানে মার মূর্ত্তি সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে, বার মাসে তের পার্ব্বণ। মেটে দালান কোঠায় পরিণত,—বধূর অঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত, তবে আর কিসের কষ্ট? মণীশের মা প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, 'কতদিন আর একা ফেলে রাখবে?' শুধু বালক মণীশ? তা সে ভাবনা তার নয়, শিবুর।

জাহ্নবী সলিলে রোগীর অধো-অঙ্গ আবৃত; চারিদিকে বন্ধুগণ 'তারক-ব্রহ্ম নাম ডাকিতেছে, শিবনারায়ণ কাঁদিয়া ডাকিলেন, "দাদা—"

"ভাই!"

"আমি যে কিছু জানিনে, আমি কি করব?"

শোকাতুর ভ্রাতার হাত ধরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে দাদা কহিলেন, "ভয় কি ভাই! আমার বদলে সার্ব্বভৌম মহাশয় রইলেন, তিনি তোমায় দেখবেন,—আর যিনি সবাইকে দেখেন, তিনি ত আছেনই।"

পুত্র মণীশের কথা হরিনারায়ণ মুখেও আনিলেন না।

হরিনারায়ণ ভ্রাতার প্রতি যে বিশ্বাস পোষণ করিয়া নিজ সন্তানের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, সে বিশ্বাস কখনও ভঙ্গ হয় নাই। মণীশ ও সত্য করুণাময়ীর দুই কোলেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, শিবনারায়ণ ঘরে ফিরিয়া মণীশকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

তারপর হইতে অল্প লোকেই জানিল যে মণীশ শিবনারায়ণের নিজ সন্তান নয়। এমন কি দূরস্থ প্রতিবেশিদের মধ্যে কেহ কেহ বাটী আসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মণীশের চেয়ে কনিষ্ঠ সত্যর প্রতি অযত্ন দেখিয়া তাহাকেই হরিনারায়ণের পুত্র বোধে আড়ালে গিয়া বলাবলি করিয়াছে, "ওমা, এরই এত ধন্যি, ধন্যি! বুড়ো ছেলেকে ট্যাঁকে করে ঘুরচে,—কচি ছেলেটার পানে তাকিয়েও দেখে না!"

বড় হইয়া মণীশ দেখিল সে ছোট ভাই সত্যর প্রতি অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। কাকাবাবু ও খুড়িমার বাৎসল্য রস সে একাই ভোগ করিতেছে। বাড়ীর মধ্যে ভাল ঘরটা হইতে গাছের বড় আমটা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাল জিনিসই তাহার পাওনা। সত্যর মায়ের কোল ও বাপের অবসর তাহারই ইজারা করা। মনে মনে সে একটু কুণ্ঠিত হইল, কিন্তু কৃতজ্ঞতা কি জিনিষ এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা কেমন করিয়া জানাইতে হয় এ বংশের সন্তান তাহা জানিত। মণীশ অন্তরের অন্তর দিয়া তাহার জীবন্ত দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে সহস্র প্রণাম করিল।

সত্যর সম্বন্ধে তার পিতা মাতা নিশ্চিন্ত ছিলেন। শিবনারায়ণ জানিতেন, মণীশকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহার সংসারের কর্ত্তব্য শেষ

হইয়া যাইবে। বাকী কাজ মণীশ করিবে, সে দায়িত্ব তাঁর নয়। করুণাময়ীর মনেও এ বিষয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না, ভাসুরপোর উপর তাঁরও অসীম বিশ্বাস। দুরন্ত দাম্বাল শিশুকে যখন সংসারিক কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, মণীশকেই ডাকিয়া বলিতেন, 'বাবা মণি! তোমার ভাইটিকে সামলাও বাপ, কাজ করতে দেয় না।"

এখনও তার নামে যে নালিশ ফরিয়াদ করিতে হয়, শিবনারায়ণের পরিবর্ত্তে তিনি তাহারই নিকট করেন। মণীশও বরাবর তাহার সমস্ত উপদ্রব অম্লান মুখে সহিয়া যায়।

এখন আর শুধু সহিবার দিন নাই। মণীশ দেখিতেছিল, তার কলিকাতা বাসের সুযোগে সত্য পড়াশুনায় একান্ত অমনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে। সে কাপড়ের কোঁচার অংশ পালোযানের মত জড়াইয়া হাতে বাঁখারি চাঁছা ছিপ লইয়া কিম্বা ঘুড়ির লাটাই তুলাইতে তুলাইতে ও পাড়ার হরে যুগী বা মাখ্‌না তেলির সঙ্গে পুকুর ঘাটে কি ভুলুনির ডাঙ্গায় হৈ-হৈ করিয়াই দিন কাটায়। দেখিলে মনে হয়, সরস্বতীর সঙ্গে বৈমাত্রেয় সম্বন্ধের চেয়েও দূর সম্পর্ক পাতাইবার মৎলব আঁটিয়াছে!

করুণাময়ী বলিলেন, "বাবা মণি! সতি হ'তে তোমার উঁচু মাথা হেঁট হবে, ও ছেলে মানুষ হ'ল না।"

মণীশের মনে সংশয় জাগিলেও সে এই ভীষণ অভিযোগের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না, সবেগে বলিয়া উঠে "না, খুড়িমা! একথা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। দেখুন না, আমার পড়াটা শেষ হয়ে যাক্।"

এইটুকু সান্ত্বনাতেই খুসী হইয়া করুণাময়ী মনে মনে হাঁফ ফেলেন। ছুটির সময় মণীশ স্নানাহার বাদ অবশিষ্ট সময় সত্যকে লইয়া পড়ে। স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে আকস্মিক শত্রু-বিপ্লব ঘটিলে যেমন হয়, দক্ষিণপাড়ার ছেলের দলের সর্দ্দার সত্য দাদার দ্বারা গ্রেপ্তায় হওয়াতে তার দলের মধ্যে তেমনই একটা আতঙ্কপূর্ণ উত্তেজনা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইয়া যায়। দাদার হাত ছাড়াইয়া সত্য যখন তার সযত্ন নিয়ন্ত্রিত নিয়মাবলীর ছোট বড় বিশৃঙ্খলা দেখে আইনভঙ্গকারী প্রজাদের উপর জমিদার নায়েবের মতই ক্ষুব্ধ রোষে গর্জ্জিতে থাকে। দাদার প্রতি মন ত প্রসন্ন থাকেনা। নাদির

সা বা তৈমুরলঙ্গের মতই তাদেব স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য দাদা এখানে আসিযা যেন অনধিকাব প্রবেশ কবিযাছে,—কেন সে তাব কলিকাতাব বাসায থাকিল না? সেখানে কত ট্রাম, গ্যাসেব আলো, কত কি আছে, সে সব ফেলিযা তাদেব এই ছায়া-ঢাকা বটের তলে বৌদ্রস্মাখা ঘাটের জলে সে তাকে হুমকি দিতে আসে কেন? আসে ত তুই দিন পবেই কি ফিরিযা গেলে চলে না? কিন্তু বাহিবে স্পষ্ট কবিযা বিদ্রোহ ঘোষণা কবিবাব সাহস তাব নাই। মিউটিনিযাবদেব মত 'গোযাব' আডালে থাকিযাই সে মনে জোব পায কিন্তু চোখোচোখি হইলেই মুস্কিল। এতটুকু সাধ্য থাকে না যে, তাহাকে অবজ্ঞা দেখায। চোখে তাহাব জল আসে, নাসাবন্ধ্র ফুলিতে থাকে, কথা রাখিতে হয।

ইতিমধ্যে শচী আসিযা যেন এক পাতা নভেল শুনাইযা দিযা গেল।

শচীকান্ত চলিযা গেলেও তাব কথাগুলি বেতালা সুবে মণীশেব কানে পুনঃ পুনঃ ঘা দিতে লাগিল। 'নুবজাহানেব জন্য জাহাঙ্গীব কি না করিযাছিল?' অপূর্ব্ব যুক্তি। ছি, ছি, এত লেখাপড়া শিখিযা শচীকান্তব কি এই বিদ্যা হইল? এত বড জুযাচুরি দিযা যে জীবনের আবম্ভ হবে, সে জীবনেব পবিণাম কোথায? নিজেব পবিত্যক্ত আসনেব উপব বসিযা ফিবিযা বদ্ধ শ্বাস সবেগে টানিযা লইল। এই সন্নিবেশে কাহিনী শ্রোতাকে এমনই অভিভূত কাবযা দিল যেন সে-ই এই গূঢ চক্রেব চক্রী এবং সমস্ত অপবাধেব অপবাধী।

বোদ্রের তেজ কমিতে কমিতে কখন এক সময সূর্য্যকিবণ ছাদেব আলিসা ছাডাইযা গিযাছে। গ্রীষ্মেব অপবাহ্নে পিছন দিক্‌কার আম বাগানে স্নিগ্ধ বাযু বহিতে আবম্ভ কবিয়াছে। বোদ্রতাপাহত ম্রিযমান গাছপালা সেই বাতাসে বোগ-শয্যাত্যাগী শিশুব মত নবীন স্বাস্থ্যতেজ হইযা উঠিযা প্রচুব পুষ্প-ভূষণে দেহ সাজাইযা তুলিতেছে। বর্ণে গন্ধে চাবিদিক আলোকিত পুলকিত হইযা উঠিযাছে।

কাগজেব তাডা গুছাইযা উঠিতে মনে পডিল, বহুক্ষণ হইতে পাশেব ঘবে পাঠের সাডা পাওযা যায নাই, সত্য বোধ করি পলাইয়াছে। দবজা খুলিতেই সন্দেহ প্রত্যক্ষ হইযা দেখা দিল। সে ঘবে সত্য নাই। শুধু ঘবেব মেজেব ছড়ান কতকগুলা কুচানো কাগজ এবং উল্টানো দোয়াত নিঃসৃত কালিব স্রোত তার পূর্ব্বাবস্থিতির সাক্ষ্য দান কবিতেছিল।

চার

মণীশ স্থির করিল, শচীনকে সে এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়া জানিবে, ইহা সত্য না তার পরিহাস মাত্র।

তরুণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বাহিরে সারা বিশ্ব হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পশ্চিমের ঘরের ক্ষুদ্র জানালা তার সুপ্রচুর কিরণের কণা লাভ করিয়া ঘরের ভিতরকার অন্ধকারকে কথঞ্চিৎ তরল করিতে পারিয়াছে মাত্র।

পঙ্করাশি-উদ্গত অদূর পুষ্করিণীর অসংখ্য মশককুল সে অন্ধকার গৃহে মহোল্লাসে মাতিয়া উৎসবের বাদ্য বাজাইতেছিল। ঘরের মধ্যে মানুষের সাড়া নাই। চৌকাঠে দাঁড়াইয়া মণীশ সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকিল, "শচী ঘরে আছ?" সাড়া না পাইয়া আবার ডাকিল, "শচি! --"

শচী ঘরে নাই স্থির করিয়া মণীশ ফিরিতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া দাঁড়াইল। একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত ভাঙ্গা স্বরে সাড়া আসিল, "কে?"

অন্ধকারে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "আমি, শচি! তুমি এমন সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে? শরীর ভাল নেই?" আবার একটা আলস্য-জড়িত নিশ্বাসের শব্দ স্তব্ধ গৃহে ভাসিয়া উঠিল। অন্ধকারের মূর্তি হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া গলা ঝাড়িয়া অবশেষে কথা কহিল,—সে শচীকান্তই।

শচী কহিল, "হ্যাঁ, মাথাটা ধরেছে,—বসো, একটা আলো আনি।" সে উঠিতে গেল।

মণীশ বাধা দিল, "না, না, আলো কি হবে? আমি এখনই যাব, সত্যকে পড়াতে হবে, একটা কথা বলতে এলাম—"

কথাটা কি শচীকান্তর বুঝিতে বাকি ছিল না। এই 'কথা'র ভয়েই এতক্ষণ সে সাড়া দেয় নাই। মনটা একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, আত্মদমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, ক্ষুদ্র শব্দটা তাহাই প্রতিপন্ন করিল।

"তুমি আমার উপর রাগ করেচ, শচি ?"

মণীশের প্রশ্ন শচীকান্তকে গোপনে আরক্ত করিয়া তুলিল। বিরক্তিও যে না ধরিল, এমনও নয়, সে জানিত কথাটা সত্য। তবু সামলাইয়া বলিল, "রাগ কিসের ?"

"মনে হচ্চে, তুমি রাগ করে রয়েচ ! আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

অনুতপ্ত মণীশ বন্ধুর হাত ধরিল।

"ক্ষমা !"

"হ্যাঁ, আমার মন বড় ছোট। তোমার সেই তামাসাটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আমি তোমার অপমান করেছিলাম। অপরাধ ক্ষমা কর্ব্বে কি ?"

শচীকান্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। এত বড় বিশ্বাস কি ভাঙ্গা যায় ? তাহার হাত পায়ের তলাগুলা অকস্মাৎ যেন হিম হইয়া আসিল। লজ্জিত হইলেও সে তাহা প্রকাশ করিল না। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বন্ধুর হাত চাপিয়া ধরিল, "কুচ্ পরোয়া নেই, ও এমন কিছু অপরাধ নয় ! ও ধরতে গেলে ত আর বাঁচা যায় না। কলকেতায় ফির্চ কবে ?"

"এখনই ? এইত কদ্দিন পরে এলাম।"

"আমি ত শীঘ্রই পাততাড়ি গুটোচ্চি—উঃ কি ভয়ানক মশা রে বাবা !" বলিয়াই সে দংশন-পরায়ণ মশকের উদ্দেশ্যে নিজের বাহুতলে অন্য হস্ত দ্বারা সজোরে চপেটাঘাত করিল। "আঃ, অস্থির করে তুলেচে।"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "বীর বটে ! মশার ভয়ে দেশ ছাড়বে ?"

শচীকান্ত মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "হাসচ কি ? এ ভয় বড় কম নয়। নাঃ, চল, বাইরে যাই। এরা নেহাৎ টেঁকতে দিলে না।"

বৈশাখী পূর্ণিমার ভোরে প্রাতঃস্নান সারিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় কালীতারা মহাবিদ্যা ইত্যাদি লেখা নামাবলী গায়ে প্রভাত সূর্য্যের মত জ্যোতির্মণ্ডিত মূর্ত্তিতে নিজের ক্ষুদ্র গৃহোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ফুল তুলিতে ব্যস্ত একটি মেয়েকে ডাকিয়া কহিলেন, গৌরদিদি ! "পূজার উদ্যোগটা শীঘ্র করে করে দাও ত। পূজা সেরে দক্ষিণপাড়ায় নবীনকৃষ্ণর ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে আসতে হবে।"

গৌরদিদি আর কেহ না, সেই সত্যেন্দ্রর শিষ্টা-সঙ্গিনী গৌরী। সাজি-

ভরা মল্লিকা, কুন্দ, জবা, গোলাপ সংগ্রহ করিয়া সে গোলাপ কাঁটা বেঁধা আচল ছাড়াইবার চেষ্টা কবিতেছিল, মাতামহের আদেশে খোঁপাখোলা বিনানী তুলাইযা হাসিয়া কহিল, "কি করে যাই, দেখুন না!—" ইঙ্গিতে সে অাঁচল দেখাইল।

দাদামহাশযও মৃদু হাসিলেন; কহিলেন, "ওবে হাবি, অমনকবে টানলে কি কাঁটা ছাড়ে? বোস্, আমি ছাড়িযে দিচ্ছি।"

বলিতে বলিতে কাছে আসিয়া তাহাকে কণ্টকদায় হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ছাড়া পাইযা গৌবী অত্যন্ত বিস্মযের সহিত দাদামহাশযের হাস্যমণ্ডিত সৌম্য মুখেব উপব ডাগব চোখেব চঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন কবিয়া কহিল, "তুমি কি কবে ছাড়ালে দাদু, আমিতো কিচ্ছুতে পাবিনি।"

"আমি বড হযেছি কিনা, তুমি যে ছেলে মানুষ। ফুল তোলা হযে গেছে ত? আব ঙুলছিস্ কেন? তুই যখন রাঁধুনি হবি, তখন দেখচি কাক পাতে আব ভাত দিবি নে', সব নিজে খাবি।'

গৌবী লজ্জিত হইযা আবক্ত মুখে "তা বই কি, কখ্খনো না" বলিযা নামানো কববীব ডালটা ছাড়িযা দিয়া সাজি তুলাইতে তুলাইতে বাড়ার দিকে ফিবিল। মাতামহ সকৌতুক স্নেহে একবাব গতিশীল ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটিব পানে দৃষ্টিপাত কবিযা নবীন সূর্য্যেব ঝলমল কিবণ রঞ্জিত পূর্ব্বাকাশেব দিকে চাহিযা দেখিলেন।—নিত্য-নবান, চিবন্তন, চিবপুবাতন, তবু প্রতি প্রভাতে সেই আদি প্রভাতেব সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুব মতই নির্ম্মল, অম্লান এবং ক্লান্তিলেশহীন!

পশ্চাৎ হইতে একটি মধুব কণ্ঠ তাঁহাকে আহ্বান কবিল, "দাদু!"

"কি বে গৌবমণি, আবাব ফিবলি যে?"

"তুলসি তোলা হযনি ত। কেশবার্থে চিনোমিত্বাং—তার পবে কি, ভুলে গেছি। কিছুতে মনে আসছে না, বলে দাও না, দাদু।"

"ববদা ভবশোভনে।' কিন্তু আজ পূর্ণিমা, আজ ত তুলসী তুলতে নেই, দিদি! ঠাকুব ঘবে তামাব টাটে তুলসা আছে, তাতেই আজ হয়ে যাবে'খন।" গৌরী ঠাকুব ঘরে ফুলের সাজি বাখিয়া আসিয়াছিল। মতামহের বাহু আকর্ষণ করিয়া আদরের সুরে কহিয়া উঠিল, "তুমি চল

না, দাদু! আমি চন্দন ঘষবো, আর তুমি ফুল সাজিয়ে নে'বে। হ্যাঁ দাদু চল।”

“আচ্ছা, চল্” বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খড়মের খুঁটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গৌরী আনন্দাতিশয্যে চলিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয় আসনে বসিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের মতই রাঙ্গা তাম্র থালিতে পীত লোহিত ও শুভ্র পুষ্পরাশি অপূর্ব্ব-শোভা বিস্তার করিয়াছিল, বোঁটা-কাটা বিল্বপত্র ও তুলসী-দূর্ব্বা যথাস্থানে আত্মনিবেদন কামনা করিয়া আসিল, এদিকে ছোট দুইখানি হাতের ঘন ঘন আন্দোলনে মন্দারমথিত সমুদ্রোত্থিত সুধাগন্ধি সুধার ন্যায় ঘন সুরভি ছড়াইয়া চন্দন-পাত্র পূর্ণ হইতে লাগিল।

পাঁচ

জনপূর্ণ কলিকাতা শহরে প্রাসাদ-মালার পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত গেল। রাস্তায় গ্যাসের আলো চন্দ্রালোককে খর্ব্ব করিয়া উর্দ্ধে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। ফেরিওয়ালার দল 'বেলফুল' ও 'কুল্‌পি বরফ' হাঁকিয়া চলিয়াছে।

কেরোসিনের একটি বিলাতি ল্যাম্প জ্বালাইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া শচীকান্ত পূর্ব্ব-কথিত মরক্কো-চর্ম্ম মণ্ডিত ঝকঝকে খাতাখানি খুলিয়া একটি পৃষ্ঠায় ঘন নীল কালি দিয়া কবিতা লিখিতেছিল।

ঘরখানি বাসাবাড়ীর গৃহোচিত ছোটখাট এবং সজ্জাগুলিও মূল্যবান্ নয়, কিন্তু সেগুলি পরিপাটী করিয়া সাজান, ইহাতে গৃহস্বামীর সৌখীন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একপাশে একটি লোহার আল্‌নায় দুইখানি মিহি ধুতি ও ইস্ত্রি-করা সার্ট ঝুলানো, পম্প-সু জুতার চলন বেশী ছিল না, নিতান্ত সৌখীন ছেলেরাই ব্যবহার করিত—ফিতার ফাঁস বাঁধা জুতাজোড়া ও রূপার কারুকার্য্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট হুড়িগাছি বিশেষ যত্নের সহিতই উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত। এই সবই মাসিমার অর্থানুকুল্যে কেনা।

যে কবিতা কবির লেখনী খাতার শুভ্র পটে অঙ্কিত করিতেছিল, তাহা এই,—

"আঁধার কুটীর মম ছিল চির-অন্ধকার,
আজি দেবি! তব স্পর্শে ঘুচে গেল সে আঁধার।
যদি গো, দিয়েছ দেখা, কর তবে হেথা বাস,
চিরারাধ্যা দেবী তুমি, আমি তব চির-দাস।

লেখকের লেখনী থামিয়া গেল। কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে না? হ্যাঁ, ঠিকইত। দরজায় কড়া নাড়িয়া কে ডাকিতেছিল, "ঝি! অ ঝি! বামুন ঠাকুর! শচীন্‌বাবু বাড়ী আছেন?"

ঝি কিম্বা বামুন ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না, অগত্যা শচীনবাবু স্বয়ংই চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে সিঁড়ি নামিয়া দ্বার খুলিলেন। মনটা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ গলার সাড়াটা যেন ভাবী-বড়-কুটুম্বের মতই ঠেকিতেছিল।

নিখিলনাথ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দরকান্তি যুবক। মুখখানি হাস্যমণ্ডিত, সরলতার লীলাভূমি। শচীকান্তকে কাছে পাইয়া তার হাত ধরিয়া অভিনন্দন করিলেন, "বাঃ! বেশ ত! দোর বন্ধ করে লুকিয়ে বসে আছেন। এসে খবরও দেননি!"

শচীকান্তর সন্দেহ কুণ্ঠিত চিত্ত এই প্রাণখোলা স্নেহ তিরস্কারে নিঃশঙ্ক আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে এই অনুযোগের বিরুদ্ধে জবাব দিল না, ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া মুখ নত করিল। নিখিলনাথ আজ যেন খুব ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পিঠে হাত দিয়া কহিলেন, 'একবার চলুন দেখি,—এখনও তো আপনার কনে দেখাই হয়নি, সেই কাজটা সেরে নেবেন। আর যদি তারপর মত থাকে, তাহ'লে কাল সকালে ঠাকুরমা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে দিন করাবেন বলচেন। বৈশাখ মাস পুণ্যাহ মাস। তাঁর ইচ্ছা, এই মাসেই বিয়েটা চুকে যায়। আপনার আপত্তি নেই ত?"

আপত্তি থাকা কি সম্ভব? তথাপি অন্তরের মধ্যে বিবেক যেন কি একটা দ্বিধার ছুতা তুলিতে চাহিতেছিল। বিবেকের এইটাই প্রধান দোষ, মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিলেও সে স্নেহময়ী মায়ের মতই তাকে আঁকড়াইয়া থাকে, ছাড়িতে চায় না। নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "আ—আমার? না, তা' কিছু নেই।"

কিন্তু সেদিনটায় আর কনে দেখা ঘটিল না! ভর্ সন্ধ্যার বারবেলায় কন্যা দর্শনে দোষ ঘটিতে পারে,—অগত্যা ক্ষুণ্ণ শচীকান্ত সন্দেশ ক্ষীরমোহন গিলিয়াই ঘরে ফিরিল। কথা রহিল, পরদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্ত্তে নিখিলনাথ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কন্যা দেখাইবে।

পরদিন যথাসময়ে সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল এবং নিখিলনাথও শুভক্ষণে দূতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীকান্ত অনেক পূর্ব্ব হইতেই মস্তকের কেশগুচ্ছ হইতে পদতল পর্য্যন্ত শরীরের যেখানের যেমন প্রসাধন সযত্নে সমাধা করিয়া হাত-আয়নায় মুখবিম্ব দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিল। জানালার মধ্য দিয়া নিখিলনাথকে আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল ঘেরিয়া খানকয়েক চৌকি, তারই

একখানার দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিখিলনাথ কহিলেন, "একটু দেরি আছে, বসুন, আমি আসছি।"

শচীকান্তর ললাট ঘামিয়া উঠিতেছিল, বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল। নিখিলনাথ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

যে ঘরে গৃহস্বামী গৃহের ভাবী জামাতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, তাহারই পিছনে বাড়ীর ভিতরকার লম্বা একটি দালান। এই ঘরের মধ্য দিয়া একটি দ্বার ও দুইটি জানালা খোলা থাকিলে বাহির অন্দরের মধ্যে অন্তরাল থাকে না। দ্বার বন্ধ থাকিলেও জানালা দুইটিই মুক্ত ছিল। সহসা সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটু সুললিত স্বর কোমল কণ্ঠের কলহাস্যে মণ্ডিত হইয়া গৃহের স্তব্ধ বায়ু স্তরে ঝঙ্কার তুলিল,—"সীতারাম বল্লিনে? বল্লিনে? তুই আজ খেতে পাবি না!"

শচীকান্ত চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিল। জানালার উপরার্দ্ধ কবাট-মুক্ত, পিছনে ভিতর দালানে কড়িকাঠে ঝোলান খাঁচার নিকট দাঁড়াইয়া একটি তরুণী ঐ কথা বলিয়া পাখীকে শাসাইতেছে,—"বল্লি নে, বল্লি নে? এই আমি চল্লুম, ময়না! সীতারাম বলো, সীতারাম—"

শচীকান্ত স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সে কনে দেখিতে আসিয়াছিল। দূর হইতে পূর্ব্বেই এই কনেটির যে ছায়াদর্শন ঘটিয়াছে, সেই ছায়ার অঙ্গে সে নিজের কবি হৃদয়ের কল্পনাদ্বারা যথেষ্ট বসন্ত-পুষ্পমঞ্জরী ও নন্দন-পারিজাতের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি এ দৃশ্য যেন কল্পনাকে সবেগ ধিক্কারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। বৈশাখের সমুজ্জ্বল প্রভাত। বারান্দার খিলানের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের গাঢ় নীলিমা নাট্যগৃহের উত্তোলিত যবনিকার ন্যায় আপনাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের সোণালি রংয়ের জ্বলন্ত কিরণ মেয়েটির চাঁপাফুলের মত শরীরের উপর পড়িয়া তার চারিদিকে যেন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া তুলিয়াছে। অনুচিত হইতেছে বুঝিয়াও শচীকান্ত প্রশংসাপূর্ণ বদ্ধ দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না। এই কি কনে? সত্যই এত বড় ভাগ্যবান্ সে?

ইতঃমধ্যে তিরস্কৃত ময়না সীতারাম বলিল,—এবং "বল্লি নো, বল্লি নো"

বলিয়া বারম্বার তাহাকে ভেঙ্গাইয়া আবার তিরস্কার লাভ করিল। এমন সময় হঠাৎ অদূরে কে ডাকিল, "কমলা!"

মেয়েটি চকিতে মুখ ফিরাইল। প্রভাত-সূর্য্য তাঁর সমস্ত আলোক একত্র করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিলেন; জগতের সমুদয় সার্থকতার আনন্দ, পুষ্পবাস আকুলিত এলোমেলো 'দখিণ' হাওয়া বহিয়া আসিল। অদৃশ্য বাঁশির গান যেন, যবনিকার অন্তরাল হইতে আনন্দে ভাসিয়া উঠিল। শচীকান্ত দেখিল, এত দিন প্রকৃতির গড়া এবং মানুষের রচিত যত সুন্দর জিনিষের উপর দৃষ্টি ফেলিয়াছে, এই চোখের তারা দুইটির মত এমন সুন্দর বস্তু কিন্তু আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। তার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মেয়েটি চকিত হইয়া চলিয়া গেল। পুলক কণ্টকিত শরীরে ব্যগ্র হইয়া শচীকান্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নিখিলনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "আসুন শচীন্‌বাবু, মিষ্টিমুখ না করলে ঠাকুমা মেয়ে দেখাবেন না,- কিছু, ঘুষ আর কি! বুঝেছেন ত—"

দ্বিরুক্তি না করিয়া শচীকান্ত আসন ত্যাগ করিল। "ক্ষুধা নাই" ইত্যাদি লৌকিকতার বাঁধা গৎ ঝাড়িতেও তার রুচি হইল না, এমনই সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিলনাথ কহিলেন, "কমলকে আপনার মনে ধরবে,—সে ভয় আমি করিনে, কিন্তু দানের যোগ্য দক্ষিণা দিতে পারব না, এইটেই হচ্চে আসল ভয়। সময় বড় মন্দ, নতুন বেরুচ্চি, আর কিছুদিন—"

শচীকান্ত অসহিষ্ণুভাবে হাসিয়া বাধা দিল, "কিছু দরকার নেই! আপনাকে ও জন্য কুণ্ঠিত হতে হবে না।"

নিখিলনাথ ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রসন্ন মুখে কহিলেন, "আসুন।"

"শচীন্ না? বাড়ী থেকে ফিরেছ নাকি! কি ব্যাপার?

একজন সহাধ্যায়ী পথ চলিতে চলিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া এই কথা বলিয়া মুক্ত দ্বার পথে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কহিল, "কবে এলে?"

"পরশু।"

"এত শীঘ্র! মোটে পাঁচ দিন ছিলে তা হলে? বাড়ীর খপর ভাল ত? বাবা ভাল আছেন?"

অকস্মাৎ ঘরের ছাদ ফুঁড়িয়া আকাশ হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল। বেলার সমস্ত উজ্জ্বলতা নিমেষে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে ডুবিয়া . শচীকান্তর মুখের উপর খানিকটা কালি মাখাইয়া দিল। কষ্টরুদ্ধ শ্বাসে কোন মতে উচ্চারণ করিল, "হ্যাঁ।" দ্বিতীয় শব্দটুকু উচ্চারণ করিবার শক্তি রহিল না।

তাহার এই অবস্থার কারণ সম্বন্ধে বন্ধুর কোন ধারণাই ছিল না, সে তাই সহজ-ভাবেই বলিয়া গেল, "সেদিন শ্রীরামপুরে গেছলাম,—মৈত্র মহাশয়ের শ্রাদ্ধে মস্ত পণ্ডিত-সভা বসেছিল দেশের বড় বড় পণ্ডিত জমা হয়েছিলেন? তোমার বাবাও এসেছিলেন। একে তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীর সব চেয়ে বড় পণ্ডিত, তাতে ওঁদের কুলগুরু – কি সম্মান তাঁর! এক বার থকে সব্বাই উঠে দাড়িয়ে পায়ের ধূলো নেবার সে কি কাড়াকাড়ি! ঐ রকম হওয়া যায়, তবেই লেখাপড়া শেখা সার্থক। তুমি অমন আদর্শটা ত্যাগ করে কিন্তু ভাল করলে না শচীন। আচ্ছা, এখন চললাম। ও বেলা তোমার ওখানে আসবো'খন।'

বন্ধুটি যেমন অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তেমনই সহসা অদৃশ্য হওয়া গেল, দীর্ঘ পুচ্ছ ধূমকেতু যেমন অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে একটা বিপ্লব আনয়ন করিয়া দিয়া আবার নিজেরই কেন্দ্র-পথে অদৃশ্য হইয়া যায়,— পশ্চাতে কার জন্য কি রাখিয়া গেল, কিছুই জানিতে পারে না, এই ছেলেটিও তেমনই এদের মধ্যে কতখানি ভাঙ্গাগড়া করিয়া দিয়া গেল, সে সংবাদে অজ্ঞ রহিয়াই হাসিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নিখিলনাথ কহিলেন, "আপনারা বারেন্দ্র শ্রেণী,—আপনার বাবা আছেন, তিনি মস্ত পণ্ডিত, এ সব কথা লুকিয়ে রাখবার অর্থ কি, শচীনবাবু? মুখ তাঁহার গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীকান্ত নতমুখে নীরব রহিল। তার বলিবার কিই বা আছে?

"নিখিলনাথ আবার কহিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, আমারও একটা শিক্ষা হল।—পয়সা নেই, অভিভাবকদের দরে এঁটে উঠতে পারিনে, তাই একটি অভিভাবক-হীন পাত্র খুঁজতে গেছলাম—"

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নির্ব্বাক্ শচীকান্তর মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল,—

বলিয়া বা দয়া করে বিচার করুন!—রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিয়ে হওয়ায় দোষ কি? সময় হলে আমার উদ্দেশ্যটা ছোট ছিল না।”

নিখিলনাথ দাঁড়াইয়া ছিলেন, শচীকান্তর মুখে অকথ্য লজ্জার ছায়া দর্শনে তাঁহার সরল চিত্ত ব্যথিত হইল। আসল কথা, তিনিও নব্য তন্ত্রের লোক,—কুল, শ্রেণী এসব মানিতেন না,—বলিলেন, “ভেবে দেখলে এতে দোষ নেই।”

“তবে আমায় ত্যাগ করবেন না। বাবাকে জানাব, তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আপনি মত করবেন ত?”

নিখিলনাথ কহিলেন, “তিনি কি মত দেবেন?”

শচীকান্ত নতমুখে উত্তর দিল, “যদি দেন, আপনার অমত হবে না?” তার কণ্ঠস্বর গভীর সংশয়োদ্বেগে কাঁপিয়া উঠিল। প্রথম যৌবনের উত্তেজনা মানুষকে যে দুঃসাহসিক কর্ম্মে উৎসাহিত করে, সহজে তাহা হইতে মনকে ফিরানো যায় না। নিখিলনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন, পরে কহিলেন, “কাজটা বড় অন্যায় করেছেন, কিন্তু এই উপলক্ষে যদিই এমন অনর্থক বাধাটা সমাজ থেকে ওঠানো যায়—তাহলে এতে সমাজের মঙ্গল হতে পারে। আপনার বাপ যদি নিজে দাঁড়িয়ে এ বিয়ে দেন তবেই আমি কমলাকে আপনাকে দান করব, নচেৎ না,—সে আমার বড় আদরের বোন।”

ছয়

বৈশাখ মাসের সকাল বেলাটা ছোট মেয়েদের বেশ একটু ব্যস্ত রাখে। ভোর থাকিতে গাছ মুড়াইয়া ফুল তোলা সারা হইয়াছে, বাটি-ভরা চন্দন তৈয়ারী। কলসী-ভরা জল, মুঠা-ভরা কচি ঘাস, গণ্ডা গণ্ডা কড়ি, বাটা হলুদ, জোয়ানের পুঁটুলি, সিন্দুর কৌটা, চালের পিটুলি, এমনই বিবিধ সরঞ্জামে ছোট ছোট সাজি ও পিত্তলের থালাগুলি ত্বরিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেহ গৃহপালিত গাভীটিকে সিন্দুর-চন্দনের ফোঁটা দিয়া কদলী হাতে মন্ত্র পাঠ করিতেছে,—"গোকল, গোকুলে বাস, গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস, আমার হোক বৈকুণ্ঠে বাস।"—কোথাও বা শ্বেত চন্দনের বক্র অঙ্গুলিযুক্ত দুখানি পা আঁকিয়া তার উপর জোড়া মল্লিকা ফুল চাপাইয়া বালিকার দল সমস্বরে পাঠশালার নাম্‌তা পাঠের অনুকরণে মন্ত্র পাঠ করিতেছে, "চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা, হরি বলেন ওগো মা',—ইত্যাদি। এইরূপে দশ-পুত্তল আদা-হলুদ প্রভৃতি বালিকা-ব্রত চারিদিকেই মহা উৎসাহ কোলাহলের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

পূণ্যি-পুকুর ব্রতটি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েদের জন্য। ইহাতে শিব পূজার অনুষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া ছোট মেয়েরা এই ব্রতাচরণের সম্মান লাভ করিতে পারে না। অভিভাবিকারা শিবপূজার ফলে শিবের মত পতি লাভ প্রত্যাশায় নিজ কার্য্যের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মেয়েকে এই ব্রত করান। উঠানের এক পাশে হাতে কাটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকানো পোঁছানো পাড়ে পূজার উপকরণ সাজাইয়া পুষ্করিণীর গর্ভে তুলসী চারা ও বিল্ব ডালের তলায় শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজারিণী মাতৃ শিক্ষানুযায়ী আবৃত্তি করিতে থাকে, "খর্ব্বং থুল থলন্ত গজন্ত বদনং লম্বোদরং পেচ্ছন্নং মদগন্ধ মধু লুপ্ত"—ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাতিনী গৌরী মেয়েটির ধরণ এতটুকু মেয়েলি নয়। ছিপে মাছ ধরায়, জল-ডেঙ্গাডেঙ্গি খেলায়, এমন কি পেয়ারা গাছের ডালেও তার দুষ্টামি ভরা হাসিমুখ সাত ভাই চম্পার ছোট বোন পারুলের মত ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। সকল ঘরের সকল ঝি-বউ ব্রত কর্ম্মে ব্যস্ত, এমন

দিনেও সে দস্যি মেয়ে দাদামহাশয়ের পূজার উদ্যোগ করিয়া দিয়া চুপি চুপি খিড়কি দ্বারের দিকে পা টিপিয়া চলিয়াছে। মেয়েটি মাতৃহীনা—বাপও এক রকম নাই বলিলেই চলে। মেয়ে যখন মাতৃগর্ভে তখন তিনি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশতঃ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইতে সিবিল সার্জ্জনের পদে উন্নীত হইয়া কি একটা যুদ্ধে বহু দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন। সে পর্য্যন্ত কন্যার জন্ম, পত্নীর মৃত্যু এত বড় বড ঘটনায়ও তাঁর নিকট হইতে না এক লাইন সংবাদ আসিয়াছে, না তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছে। গৌরীকে তার মাসিমা বিন্ধ্যবাসিনীই মানুষ করিয়াছেন। এক্ষণে মেয়েব চরিত্র দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়াছেন। বড় হইতেছে এখন কোথায় দিন দিন ঘরকরণাব কাজ শিখিবে, মামীর ছেলে বহিবে, ব্রত-নিয়মাদি করিবে,—তাহা না হইয়া সৃষ্টিছাড়া মেয়ের কেবল ছেলের দলে ভিড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতে মন! বাড়ীর লোকে ভৎর্সনা এবং পাড়ার লোকে নিন্দা করে, বিন্ধ্যবাসিনী লোকের উপর অভিমান কবিয়া বোনঝিকে শাসন করিতে গিয়া আদরই কবিয়া বসেন, নিরুপায়!

আজ পলায়ন কালেই বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। অাঁকিয়া বাঁকিয়া নানা কৌশলেও সে মাসিমার হাত ছাড়াইতে পাবে নাই, বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে ধরিয়া পুণ্যি পুকুরের নিকট আনিয়া বসাইলেন; নিজেই গোময়-মৃত্তিকার গোলা কবিয়া চারিধার নিকাইয়া পুষ্করিণীর জীর্ণ সংস্কার করিলেন। তারপর তার হাতে জবা ফুলের অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া কহিলেন, "সূর্য্যের দিকে চেয়ে বল্, 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং—বলচিস্ নে?"

গৌরী গোঁ হইয়া বসিয়াছিল, সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, সুয্যির দিকে না কি চাওয়া যায়? তুমি চাও না দেখি!"

"এত বেলা করিস কেন? আচ্ছা ঐ পূবদিকে চেয়েই বল, শীগ্‌গিব সেরে নে' উনোন জ্বলে যাচ্চে।—এত বড় মেয়ে, নিজে একটা বত্ত কবতে শিখলি নে! তোর জন্যে কি যে আমি করি! আয়, হাত দিয়ে ঘটিটা ধর্—, শিবের মাথায় জল দিতে দিতে বল্—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা, কে পূজোয় দুপুর বেলা?

আমি সতী লীলাবতী, ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।
শিল, শিলেটন, শিলে বাটন, শিলা আছেন ঘরে ?
স্বর্গ থেকে মহাদেব বলেন, গৌরী কি বত্ত করে ?
আকন্দ ফুল বিল্বপত্র তোলা গঙ্গাজল,
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।”

প্রণাম করে চলে যা। তুই ও বাঁচ্ আমিও বাঁচি।”

প্রণামান্তে ব্রতকারিণী প্রশ্ন করিল, “কই মহাদেব ত জিজ্ঞেস করলেন না, মাসিমা ?”

মাসিমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি জিজ্ঞাসা করবেন ?”

“জিজ্ঞেস করলেন না ত—‘গৌরী কি বত্ত করে ?’ আমি কিন্তু আর ওঁকে পূজো করব না।”

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বড় বধূ কচি ছেলের পিঁড়িখানি কখনও ছায়ায় কখনও রৌদ্রের তাপে ঠেলিয়া দিতে দিতে তার জার্ণ বক্ষ-পঞ্জরে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা গৃহিণী কাপড় কাচিয়া আরতির জন্য তুলার সলিতা পাকাইতেছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী হাঁড়ি-হেঁন্‌সেল তুলিয়া আহারে বসিয়াছেন, কাছে বসিয়া গৌরী একটা চঞ্চল বিড়াল-শিশুকে আদর করিতেছিল। অদূরে ‘মেনুর’ মা ‘পুষুমণি’ মল্লিকার গোড়ের মত মোটা লেজ ফুলাইয়া এধারে ওধারে দুলাইতে দুলাইতে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ছেলের কীর্ত্তি দেখিতেছে। মানুষের মত সেও নিজ সন্তানের আদরপ্রাপ্তি সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতেছে।

গঙ্গামণি ডাকিয়া কহিলেন, “বিন্দু, দুটী ভাত রেখো মা, এক চাকলা আম আছে দুধ দিয়ে খাবে।” শুনিয়া গৌরী বিড়াল ছানাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, “বসো মাসিমা, আমি দুধ এনে দিচ্চি।”

প্রতিবেশীরা দু’একজন করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নাতি বা ভাইপো কোলে লইয়া “কি করছ গো ঠান্‌দি,—খুড়ি বা—মামি” বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহরের সভা প্রতিদিনই এই বাড়ীর অন্তঃপুরে জমিয়া থাকে। তবে আজকাল পূর্ব্বের মত ততখানি আর জমকায় না।

কারণ, বৈশাখ মাসে অনেকের বাড়ীতেই 'বৈকালিক' সাজাইবার হাঙ্গামা আছে সেজন্য গৃহকর্ত্রীগণ বড় একটা বাড়ী ছাড়া হইতে পারেন না।

দক্ষিণপাড়ার সেজ গিন্নি আসিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আর শুনেছ খুড়ি! দয়াল বাঁড়ুয্যের ছোট বউ, তুক্ করে ছেলেটাকে ভেড়া বানিয়েচে। দিনে দুপুরে বউ সোয়ামীর সঙ্গে কথা কয়। দেশে রোগ আকাল হবে না?'

এমন সময় বাহিরের দিক্ হইতে জুতার শব্দ হইল। গঙ্গামণি ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। এ বাড়ীতে এ রকম ভারী জুতা পায়ে দিয়া কে চলিবে? সহসা ডাক আসিল "—মা!'

"কে রে? শচীন্ এলি?" বলিয়া গঙ্গামণি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, কহিলেন "এর মধ্যে ফিরে এলি যে? ভাল আছিস্ ত?"

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী মা শিহরিয়া উঠিলেন। কি হয়েছে! এই সেদিন সুস্থ ছেলেকে তিনি সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন, আর আজ এ কি মূর্ত্তি লইয়া সে ফিরিল? কশাঘাত লাঞ্ছিত কয়েদী যেমন ক্লিষ্ট-ভাবে চলা-বলা করে, তাহাকেও তেমনই অবসাদ গ্রস্ত দেখাইতেছিল।

শচীকান্ত মায়ের বিস্মিত দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "হঠাৎ বড় অসুখ করেছিল মা, তাই ফিরে এলুম। বাবা কোথায়? বাইরের ঘরে দেখলুম না ত!"

গঙ্গামণি আঁচল দিয়া পুত্রের ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিতে দিতে উত্তর করিলেন, "তিনি বাড়ী নেই, শ্রীরামপুরে রয়েছেন। কি অসুখ হয়েছিল রে? পথ্যি করেচিস্?"

"হ্যাঁ, সে এখন ভাল হয়ে গেছে। বাবা কবে ফিরবেন মা?"

"শুন্‌চি ত আরও দিন আষ্টেক লাগবে। আয়, তবে চান্ করে নে, ততক্ষণে দুটি ভাত ফুটিয়ে দি!"

পিতা গৃহে উপস্থিত নাই শুনিয়া এক দিকে শচীকান্তের বক্ষের উদ্বেগ-আলোড়ন যতখানি কমিয়া গেল, অন্যদিকে আবার ঠিক সেই পরিমাণেই সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। যে জন্য সে আসিয়াছে, তাহা সাধন করা যে কত কঠিন তাহা তার অজানিত নয়। ছেলেবেলা হইতে পিতাকে বেত্র হস্ত গুরুমহাশয়ের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে সে ভয় করিয়া আসিয়াছে। আড়ালে

যতই তাঁহাকে ছোট করিতে চেষ্টা করুক, সম্মুখে দাঁড়াইলে ঠিক ততই সঙ্কুচিত করে। তাই অন্তরের মধ্যে সন্তানের দাবী সে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সেই পিতাকেই তার একান্ত প্রয়োজন।

যে দিন কন্যা দেখিতে গিয়া আকস্মিক লজ্জা-বজ্র দীর্ণ মস্তক লইয়া শচীকান্ত ঘরে ফিরিয়াছিল, সেদিন তার অপমান-ক্ষুব্ধ চিত্ত ক্ষণকালের জন্য নিজের প্রতি তীব্র ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আত্মধিক্কারের মধ্যে সে স্থির করিয়া ছিল, এই লজ্জাজনক ব্যাপারের পর ইহাদের সহিত আব কোন সম্বন্ধ সে রাখিবে না। এখান হইতে দূরে সরিয়া গিয়া এমুহূর্ত্তে এই লজ্জাকে চাপা দিবে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পাবিল না। সে দিনকাব আলোকোজ্জ্বল প্রভাত চিত্তে তার বিগত বসন্তেব সমুদয় মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে, এবং তাব মধ্যে সেই পক্ষী-সহচারিণী মেয়েটি তাব মুগ্ধ নেত্রে দৈত্যপুরীব বাজকন্যাব মতই সোণার কাঠির স্পর্শে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত কবিয়া তুলিযাছিল। শচাকান্ত সে মুখের ছবিটাকে মনের মধ্যে চাপিযা ধরিয়া সমস্ত লজ্জা জয় করিয়া ফেলিল। সে মুখেব কাছে আকাশ আপনাকে নত করিয়া আনে, বাতাস নিবেদন কবিয়া দেয়, আর এহ আত্মনিবেদনকারী চিত্ত লইয়া তাব মানুষেব মন কেমন কবিয়া প্রত্যাবৃত্ত হহবে? সে তাকে নিজের 'কনে' ভাবিযাই সেই অম্লান সূর্য্যকরে শুভক্ষণে শুভদৃষ্টিতে দেখিযা ফেলিযাছে, —এখন এ সম্বন্ধ ছাড়াইতে যাওয়া চলে না।

পিতা বাড়ী নাহ শুনিয়া মনটা একটু সুস্থ হইল, দুহ দিন তবু জিবাইয়া লওয়া যাইবে! আবার বিলম্ব হইয়া গেলে হযত তাঁরা ব্যস্ত হহয়া অন্য পাত্র দেখিতেও পারেন ইহা ভাবিয়াও উদ্বিগ্ন হইল।

সাত

বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোধূলির রক্তরাগে অস্তাচল-শায়িত তপনের শাসন তাম্রলিপি পশ্চিম আকাশে জ্বলন্ত সোণার অক্ষরে ফুটিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার ছায়া তখনও পূর্ব্বের নদীপার ছাড়িয়া পশ্চিমে বিস্তীর্ণ হয় নাই। গ্রামের মেয়েরা ঘাটে আসিল, গা ধুইয়া জল লইয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল। যারা দল বাঁধিয়া আসিবার অবসর পায় নাই, একে একে আসিতেছে। কাজ সারিয়া সুন্দরীর কালো চুলের সরু সাদা সিঁথির মত সবুজ ঘাসের মধ্যে রেখাঙ্কিত পথ ধরিয়া আম গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ বকুল ফুলের গন্ধে আমোদিত পত্র-খচিত পুষ্প-ভূষিত কানন পথে ফিরিতেছিল।

মণীশ ফুল বাগানে বসিয়াছিল। নানা জাতীয় ক্রোটনের বিচিত্র বর্ণ খচিত পত্রাবলী, আর দেশী বিদেশী ফুল গাছের মধ্যে বর্ণ ও গন্ধ অপর্য্যাপ্ত পুঞ্জিত হইয়াছিল। সাদা রাঙ্গা করবী, জবা, চাঁপা ও জুঁই গাছের আপ্রান্ত ফুটন্ত ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতি ও মৌমাছিরা ইতঃস্তত ঘুরিয়া ফিরিতেছে। কোকিলটা কিন্তু নেহাৎ সেকেলে। সে এই সাজান বাগান ছাড়িয়া পুরাতন আমগাছের ডালে বসিয়াই পাতার আড়ে কালো শরীর লুকাইয়া গাহিতেছিল, "কু-উ" !

মণীশ একটা বই পড়িতেছিল। প্রথমটা লর্ড লিটনের একখানি বিখ্যাত রচনা লইয়া বসিয়াছিল, অত্যন্ত ক্লান্তিকর বোধ হওয়ায় উপন্যাস ছাড়িয়া একখানা 'লজিক' লইয়া আসিয়াছে।

এমন সময় কে ডাকিল, "মণীশ ?"

মণীশ মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতেছিল। লেখকের নাস্তিকতার তর্কে তার ললাটের প্রচ্ছন্ন শিরা ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিলেও অধরে দশন চাপিয়া সে অধিকতর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছিল। মাতৃ-অঙ্কে শয়ন করিয়া যে অভাগা মাকে চিনে না, সে যেমন কৃপার পাত্র, ভগবানের এত বড় দয়ার রাজ্যে স্থান পাইয়াও যে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না—সেও তেমনই কৃপার।

বন্ধুর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া ফিরিল, "ফিরে এলে যে?"

শচীকান্ত বেদীটার উপর বসিয়া পড়িয়া মণীশের পরিত্যক্ত পুস্তক তুলিয়া লইয়া নামের উপর চোখ বুলাইয়া কহিল, "পড়, পড়, একটু জ্ঞান পাবে,—হঠাৎ এ সখ যে?"

মণীশ বন্ধুর পাশে আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "জ্ঞান পাবার জন্যে। কি আছে,—তাই দেখছিলাম।"

"কি দেখলে?"

"যারা জড়ের দাসত্ব করতে জন্মেচে, তারা তা ছাড়া আর কি করবে? যে যাতে তৃপ্ত সে তাই নিয়েই থাকুক। নিজের বিশ্বাস পরের মাথায় চাপাবার ব্যবস্থা করে এই যা দুঃখ।"

"অর্থাৎ ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও সৃষ্টির দায়ে পাছে কোমল স্কন্ধে আঘাত লাগে, সেই ভয়ে দুঃখ হচ্চে! তোমার পুরানো মতগুলো যদি ছাড়তে, মণীশ!"

মণীশের অধর-প্রান্ত বিষণ্ণ হাসিতে ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। সে বিদ্রূপের সহিত কহিল, "আমিও হয়ত তোমার জন্যে অমনি দুঃখের সুরে বল্‌তে পারি,—তোমার ওই আত্মপ্রতারণাকারী মতটা যদি ছাড়ো শচীন্!"

শচীকান্ত ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়া কহিল "কোন্‌টা আত্মপ্রতারণা সেটা ভেবে দেখ, এই উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর মানে, এমন মূর্খ ক'জন আছে? বৃথা মনের ভাব বাড়ানো, সময়ের অপব্যয়, আর কতকগুলো কুসংস্কারের আশ্রয় নেওয়া বৈ ত নয়। আমাদের মতে ঈশ্বর না মেনে নিজের কাজ শুধু নিজের শক্তির দ্বারা সম্পন্ন করে যাওয়াই ভাল।"

"তোমার 'মত', আমার 'মত', এখন জনে জনের এক একটা মত হয়ে দাঁড়িয়েছে না? দেখ শচীন! অন্যে এ সব কথা বল্লে তত কষ্ট হয় না, কিন্তু তুমি যখন এই রকম বল তখন যেন আমায় মুগুর দিয়ে মার। তোমার বাবা অত বড় জ্ঞানী, কত লোক তাঁর সংসর্গে উন্নত হয়ে গেল, তাঁর চেয়ে শতাংশে কম বুদ্ধি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতকে পূজা করা তোমার পক্ষে কিছুতেই সাজে না।"

এ তিরস্কারের বিরুদ্ধে শচীকান্ত কোন খণ্ডন যুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা

করিল না, সে মণীশকে চিনিত। এ তর্ক বাড়াইয়া তুলিলে দুই চারি দিন তাহাকে অন্য কোন কথা বলিতেই পারিবে না, ইহা জানিয়া সে চুপ করিয়া গেল। হাসিয়া উঠিয়া বইখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ব্যস্‌! ব্যস্‌! পণ্ডিত-মশাই ইতি কর। এখন দুটো কাজের কথা কওয়া যাক এস,—তোমার সে বইটা শেষ হয়ে গেছে? 'নিডিয়া'কে কেমন লাগল?"

"বড় মায়া হয়।"

"তুমি স্কটের কি কি পড়েছ? মোটে ঐ চারখানি! নাঃ, তুমি সংসারে জমিয়ে উঠতে পারবে না। আচ্ছা, ডিকেন্সের কোন কিছুই পড়নি?"

মণীশ সঙ্কুচিত স্বরে কহিল, "ডিকেন্সের 'পিকুইক্‌ পেপার' আর 'ডেভিড্‌ কপারফিল্‌ড্‌' পড়েছি।"

শচীকান্ত এবার নিজের বক্তব্যটা মনে মনে গুছাইয়া লইতেছিল। চোখে চোখে চাহিয়া বলিয়া যাওয়ার চেয়ে পাশাপাশি থাকিয়া সঙ্কোচের কথা কহিতে বাধা কম বোধ হয়। ত্বরিতে সে উঠিয়া কহিল, "আঃ, এমন সন্ধ্যাটা আল্‌সে হয়ে বসে নষ্ট করো না। এস, একটু বেড়ান যাক্‌"—বলিয়া মণীশের হস্ত আকর্ষণ করিল; কহিল, "তোমাকে আমার কিছু বলবার ছিল মণীশ!"

শচীকান্তর স্বর কাঁপিয়া উঠিল। বিস্মিত মণীশ চলা বন্ধ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বিবর্ণ মুখে দুই চোখের উৎসুক দৃষ্টি নীল আকাশের মধ্যে দুইটি দীপ্ত নক্ষত্রের মতই জ্বলিতেছে।

মণীশ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"এস, বল্‌চি" বলিয়া আবার সে চলা আরম্ভ করিল; কিন্তু অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। মণীশের বিস্ময়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা ফুল বাগানের সীমা অতিক্রম করিয়া আম্র কাননের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। শুক্লা পঞ্চমীর অপরিণত শিশু চন্দ্র গভীর নীলিমার এক প্রান্তকে দিব্য কিরণ-রঞ্জিত করিয়া দেখা দিয়াছেন। সারি বাঁধা মল্লিকাগুলার কাছ দিয়া যাইবার সময় সেগুলা তাদের খানিকটা সুমিষ্ট গন্ধ দিয়া আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করিল। একটা ফুল তুলিয়া তাহার

ঘ্রাণ লইতে লইতে মণীশ ঈষৎ কৌতূহলের সহিত ফিরিয়া নিস্তব্ধ শচীকান্তের মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "কৈ,—কি, বল্লে না ?"

"বলি—" বলিযা শচীকান্ত একটা ফুলেভরা ডাল বাম হাতে উঁচু করিয়া তুলিযা তাহা হইতে আধ-ফোটা মল্লিকা ছিঁড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। সেদিনকার সেই কথাবার্ত্তার পর বহু চেষ্টাতেও সে এই কথাটা খুলিযা বলিযা আপনাকে খাটো কবিযা ফেলিতে পারিতেছিল না। সে জানে মণীশ দুই একটা বিষয় ছাড়া নিজেকে তাহা হইতে আর সকল বিষয়েই ছোট মনে করে। কিন্তু না বলিলেও ত নয় ;—সঙ্কোচ না মানিয়াই তাই বলিযা ফেলিল, "সেদিন তোমায় যে সম্বন্ধটার কথা বলেছিলাম, মনে আছে ?"

মণীশের সে কথা মিথ্যা বলিবাই ধারণা জন্মিযাছিল, তাই সে সেদিকে না গিযা একটু ভাবিযা লইবার চেষ্টা কবিল, কিছুই মনে পড়িল না, উত্তর দিল, "কৈ, না।"

শচীকান্ত অকারণে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "মনে নেই, সেই নিখিল বাবুর বোনের কথা ?"

মণীশ চমকিযা উঠিল, "সে তবে মিথ্যা নয় ?"

যদিও এই সামান্য প্রশ্নে রাগ হইবার কথা নয়, তথাপি প্রশ্নের ধরণে তার ক্রোধোদ্রেক হইল। গম্ভীর ভাবে কহিল, "মিথ্যা না হওয়ায় ক্ষতিটা কি ? নিখিল বাবু এ বিয়ের জন্য বাবার মত চান,—আমি তাঁর মত নিতে এসেচি।"

মণীশের মুখের উপর হইতে উদ্বেগের ছাযাটা সরিযা গেল। অনুতপ্তভাবে সে বন্ধুর বাহুর উপর হাত রাখিল, —"তা যদি হয় ত, খুবই সুখের বিষয়—তাঁকে বলেছ ?"

শচীকান্ত কহিল, "তিনি বাড়ী নেই, তা-ছাড়া আমি নিজে কেমন করেই বা এ সব কথা তাঁকে বল্‌বো ? তোমাকেই এ কাজটি করতে হবে,—তুমিই বলবে যে রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিবাহ সম্মিলনে তিনি তাঁর মত চেয়েছেন,—তিনি যদি মত দেন, তবে বাধা দেবে কে ? বেশ করে একটু গুছিয়ে বলো। দেখো ভাই এখন আমার জীবন মরণ তোমার হাতেই নির্ভর করচে।"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "আমার যথাসাধ্য আমি করবো। সে জন্তে অত করে বল্‌তে হবে না,—কিন্তু ঐ যে কথাটা বল্লে শচান্‌ ওটা যেন বইয়ের কথা! সেই মেয়েটিকে একটি বার বুঝি দেখেছ? তাতেই তার উপর জীবন মরণ নির্ভর—বল কি?"

শচীকান্ত মনে মনে চটিল কিন্তু হাসিয়াই কহিল, "যদি কখনও দিন আসে, তবেই দেখা যাবে। তুমি এত অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে চাইছ, কিন্তু তাকে যদি দেখতে তা হলে বুঝতে, চাঁদ না দেখে ছবির চাঁদ থেকে কি চাঁদের সৌন্দর্য্য বোঝা যায়?"

মণীশ হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, "তাব গায়ের চামড়াখানা তোমার আমার চেয়ে না হয় কিছু সাফ,—কিন্তু তাই বলে কি সেখানা তোমার আমার চেয়ে বেশী মজবুত? মানুষ ত আর ছবি নয়—চেহারা ভালমন্দ নিয়ে কি আসে যায়?"

"সুন্দর বস্তু চির আনন্দের, A thing of beauty is a joy for ever—একথা কবি বলেছেন, দার্শনিক বলেছেন, প্রকৃতি নিজে বল্‌চে, তুমিই শুধু 'না' বল্লে চল্‌বে কেন! তুমি কি সৃষ্টি ছাড়া?"

মণীশ হস্তস্থিত ফুলটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিযা হাসিয়া কহিল, "বোধ হয়,—আমি তাই। জগৎকে আমি সাদা কালো দিয়ে বিচার কবতে পারিনে, তার ভিতরে এক চির নবীন চিবসুন্দর আছেন, তাঁকে দিয়েই জগৎকে দেখি। তাঁর কোন রং নেই,—রূপ নেই।"

মণীশের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উদাস হাসিটুকুর মধ্যেও তার সহানুভূতির অচপল প্রতিজ্ঞার সুর ধ্বনিয়া উঠিল। শচীকান্ত আশ্বস্ত হইয়া নিজেব মধ্যে একটা বল পাইল। সে যখন চেষ্টা করিবে বলিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই করিবে।'

মণীশের সঙ্গে তার মতের মিল নাই, চরিত্রের মিল নাই, অথচ এই দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি স্বচ্ছ প্রবাহ কেমন করিয়া বহিতেছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিত, বন্ধু বলিয়া মনে করিত, বিশ্বাস করিত। আজও মণীশ বিশ্বাস করিয়া লইল, শচীকান্ত নিখিলবাবুর নিকট যেটুকু গোপন রাখিয়াছিল, তাহা জানাইতেই সহসা কলিকাতায় চলিয়া গিয়া সে আপনার ভুল সংশোধন করিয়া আসিয়াছে।

ভুল করা মাহুষের ধর্ম্ম,—সে ভুল যে স্বীকার করিতে পারে এবং স্বীকারান্তে তাহার হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে, সেই ত মানুষ।

সে তার এমন বন্ধুর জন্য নিশ্চিন্ত রহিল না। প্রথমে শিবনারায়ণের নিকট গেল। যাহা বলিবার ছিল তাঁহাকে জানাইয়া কহিল, "রাঢ়ী বারেন্দ্রর মধ্যে বিবাহ চলা কি উচিত নয় ?"

শিবনারায়ণ কহিলেন, "অনুচিত নয় অন্ততঃ।"

মণীশ একটু ইতস্ততঃ করিল ;—"কেউ ত চালাবার চেষ্টা করেন না—হিন্দু সমাজের এজন্যে যত্ন নেওয়া ত দরকার।"

শিবনারায়ণ কহিলেন, "যখন দরকার হবে তখন চেষ্টাও জাগবে।"

মণীশ এ কথা মানিত। কিন্তু এইটুকু সে মনে মনে ভাবিল, "এখনই হয়ত এসেছে।"

শিবনারায়ণ কহিলেন, "নিখিলবাবু খুড়া মহাশয়ের অনুমতি চেয়েচেন, তা বেশ আমিই তাঁকে সে কথা বলতে পারি। কি বল ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ফিরিবার পরে মণীশের কাকা উৎকণ্ঠিত মণীশকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানা কাগজ দিয়া কহিলেন, "নিখিলবাবু—না—কে, তাঁকে পাঠিয়ে দিও। তাঁর এতে সম্মতি আছে।"

মণীশের অত্যন্ত আনন্দ হইল। বন্ধু হইয়া বন্ধুর জন্য তবে কিছু সে করিতে পারিয়াছে ! কাগজখানা সে খুলিয়া দেখিল, শচীকান্তর পিতা লিখিয়াছেন,—

"রাঢ়ী-বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি আদান প্রদান শাস্ত্রসম্মত এবং সামাজিক ক্ষতিকর নহে। একদা যাতায়াতের পথ সঙ্কটের জন্য ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বর্ণ নির্ব্বিশেষে বিবাহ চলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহা শাস্ত্র-সম্মত, কালানুসারে লোকাচার-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেও তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় প্রত্যবায় হয় না। আমি এইরূপ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ সম্পন্ন করাইতে প্রস্তুত আছি।—শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।"

এই পত্র যখন শচীকান্ত পাঠ করিল তার চোখে আকাশের রং সোণা মাখা ও পৃথিবী নন্দনকাননের শোভা ধারণ করিল।

মণীশ কহিল, "এবার সব কথা খুলে বলা যাক্ না।"

শচীকান্ত কহিল, "কন্যাপক্ষেরই এটা বলা উচিত।"

মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন, দাদার ছেলের উপনয়ন এবং মণীশের গৃহে প্রীতি-ভোজ উপলক্ষ্যে কয়েকদিন শচীকান্তের কলিকাতা যাত্রায় বিলম্ব ঘটিয়া গেল। বিদায়কালে মনটা বড়ই উদার ছিল, প্রণাম করিয়া পিতার পদধূলি লইল। উমাকান্ত প্রসন্ন মুখে তার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেন আসিলে? কেনই বা যাইতেছ, কিছুই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ট্রেণে একটি নিভৃত কামরা সে লাভ করিয়াছিল। ইহাও সে সৌভাগ্য মনে না করিয়া পারিল না। একেলা বসিয়া সেই একবার-দেখা মুখখানি,—যাহা সেদিন নীল আকাশের তলায় প্রভাত-রৌদ্রে মণ্ডিত হইয়া মেঘের মধ্যে তড়িৎবৎ তার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি আলোকের তীব্র রেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছে,—তাহারই কথা ভাবিতে লাগিল।

দুধারে চলন্ত গাছ মাঠ ও বাতাস যেন স্বপ্ন-পুরীর শোভায় মণ্ডিত হইয়া তার চক্ষুকে সার্থক ও চিত্তকে শান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমে সে নিজের বাসায় গেল না। গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বারে সমুপস্থিত বামুন ঠাকুরের হাতে জিনিষপত্র নামানোর ভার দিয়া দ্রুত পদে নিখিলনাথের বাসায় গেল। কাগজখানা মুঠা করিয়া হাতের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়াছিল,—বিলম্ব সহিতেছিল না।

স্পন্দিত বক্ষে দূর হইতে দেখিল বাড়ীর সমস্ত দ্বার, জানালা বন্ধ,—মনুষ্য-বাসের চিহ্ন নাই।

শচীকান্তর বক্ষে যেন কিসেব আঘাত পড়িল। সমস্ত চিত্ত বিকল করিয়া কানে কানে কে যেন বলিয়া উঠিল, উহারা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে! তার পা টলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরুপায় ক্রোধ আগুনের মত দপ্‌ দপ্‌ করিয়া মাথার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল।

বাড়ীর পাশেই রামধন সেকরার দোকান। স্বর্ণকার তাঁহাকে চিনিত। রাস্তার আলোকে জনহীন বাড়ীটার সম্মুখে ঊর্দ্ধ নেত্রে ভূতের মত তাহাকে ঘুরিতে দেখিয়া সে কাছে ডাকিল। অন্যদিন হয়ত শচীকান্ত সামান্য মুদির আহ্বানটাকে অপমানজনক ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিত না; কিন্তু আজ নিজের

গরজ,—হয়ত সে ইহাদের নূতন বাসার সন্ধান দিতে পারে। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবুরা কোথায় গেছেন, জানিস্?"

রামধন একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "আপনি কোথায় ছিলেন? কিছুই জানেন না?"

আরও কিছু জানিবার আছে না কি? অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি কোন যোগ্য পাত্র হঠাৎ খুঁজিয়া মিলিয়াছে? বৈশাখের সন্ধ্যায় শুভলগ্নের ত অভাব ছিল না! সে নিস্পন্দ থাকিয়াই উচ্চারণ করিল, "কি জান্‌বো?"

রামধন আক্ষেপের স্বরে কহিয়া উঠিল, "সে আর কি বলব! আজ সাতদিন হয়ে গেল মায়ের দয়া হয়ে ডাক্তারবাবুটি মারা পড়লেন,—বড় ভাল লোক ছিলেন, ভারী ভদ্দর—আমার তেনার অমন হাঁপিং কপ্‌টা সারিয়ে দিলে,—একটি পয়সা নিলে না।"

শচীকান্ত নীরবে দাঁড়াইয়া পরিত্যক্ত গৃহের পানে তাকাইয়া রহিল। কার্ণিসের ছায়া দীর্ঘ হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, রেলিংগুলার বক্র ছায়া বারান্দার দেওয়ালে আঁকা চিত্রের মত দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েরা কোথায়?"

রামধন উত্তর দিল, "তা'ত জানিনে বাবু,—ডাক্তারবাবুর ব্যারাম হতেই একটি বুড়োগোছ ভদ্দরলোক এসেছিলেন, সব চুকে যেতে তিনি বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গাড়ী ডাকিয়ে ওদেরকে নে' গেলেন। আহা, বুড়ী ঠাকুমা আর ছোট বোনটি কি কান্নাটাই যে কেঁদে গেল!—মনে করলে প্রাণটা যেন ফেটে যায়! তা' এখন কলিকাল,—এই রকমই হবে। সে রাম-রাজ্যি ত আর নেই যে অকাল মিত্যু হবে না।"

চিমটা দিয়া মাটির গামলা হইতে জ্বলন্ত টিকা উত্তোলনে মনঃসংযোগ করিল সে। শচীকান্ত ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিল। দৈবকে সে কোনদিন বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে আজ স্বীকার করিতেই হইল। অকরুণ ভাগ্যই সেই বিদ্যুৎ-প্রভা তরুণীকে তার জীবন হইতে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃশ্য করিয়া লইল।—কবিজীবন সত্যই চির অভিশপ্ত!

কবিতার খাতা খুলিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে কবিতা লিখিতে বসিল,—

"কেন হেরিলাম!

পতঙ্গ বহ্নির মুখে, পুড়িবারে ধায় সুখে,

তেমনিঃসে রূপানলে পুড়ে মরিলাম!

জ্বলন্ত পাবক শিখা কেন হেরিলাম!"

আট

রজনীর যে স্তব্ধ মুহূর্ত্তে সমস্ত নিশীথ-কুসুমেরা নিজ নিজ প্রেমাপ্লুত হৃদয়ের সুরভিরাশি সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যে উর্দ্ধপানে প্রেরণ করে সেই সময় তেমনি পুষ্পসুরভিময় চিত্ত আত্মবিস্মৃতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে আবদ্ধ উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর ক্ষুদ্র গৃহোদ্যানে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছিলেন। প্রায় প্রতি রাত্রেই এমনটা ঘটিয়া থাকে।

নীচের জমিতে মাটির আলের ভাগ করা ক্ষেত্রে কলাই-সুটির গাছ সাদা ও বেগুনি ফুলে ভরিয়া উঠে, ফুলের মধ্যে মৌমাছিরা গুঞ্জন করে, উর্দ্ধে বিশাল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নক্ষত্র খচিত হইয়া থাকে, পৃথিবীতে ফল-পুষ্প এবং আকাশের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের অপ্রতিহত অধিকার গ্রহণ করিয়া পূজাপরায়ণ এই তপস্বীর চিত্ত বিরাট্ বিশ্বের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। সেই ধ্যান-স্তিমিত চিত্ত কখনও নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে উর্দ্ধে চাহিয়া স্রষ্টার অসীম রহস্যের লেখা পাঠ করিতে থাকে, কখনও জ্যোতির্ম্ময় দুইটি নেত্র-তারকা আপনার ভারে আপনি নত হইয়া মঙ্গল-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়ে, কোন্ সময় চারিপাশে পুষ্পমুকুলগুলি বিকশিত হইয়া উঠে, ফোটা ফুলের দল ঝরিয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার ভোরের আলোকে মরিয়া আসে, কিছুই তাঁর চোখে ধরা পড়ে না! রাত্রির শেষ অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দূরস্থিত পথের আলোর মত সূর্য্যের প্রথম উদয়ালোকের আভাস যখন পূর্ব্বাকাশকে গোলাপী আভায় রাঙ্গাইয়া তুলে, তখন তিনি স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতে ভিতরে চলিয়া যান।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি। বাহিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। অন্ধকারে নক্ষত্রপুঞ্জের পরিদৃশ্যমান এবং জগদতীত অজ্ঞাত আনন্দের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহান চিত্ত বিশ্বাতীত লোকে নিজের আনন্দ পরিপ্লুত আত্মাকে প্রেরণ করিয়াছিল। দেহ পৃথিবীর মাটীতে স্থির আছে কিন্তু দেহাধিষ্ঠাতা তাঁর নিজ স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাগানের প্রান্তে গোশালা, দুগ্ধবতী গাভী দুটি ও সেবাপুষ্ট গোবৎস বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছে। গো-গৃহের বামে বিচালির গাদা এবং একটি ধানের মরাই, রাত্রের অন্ধকারে তাদের দুইটি স্তব্ধ প্রহরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছন্ন, সতর্ক দৃষ্টি, আত্ম সজাগ যেন দুইটি বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য প্রভুর চরণ ক্ষেপ ধ্বনি গণনা করিয়া তাঁহার আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছে।

খসিয়া পড়া তারাখণ্ডের মত গোটা কয়েক জোনাকি গাছগুলার চারিপাশে ঝিক্‌মিক্ করিয়া কাঁপিয়া বেড়াইতেছিল। আলেয়ার আলোকবিন্দুর মত নিবিয়াই জ্বলিয়া উঠিতেছে। চারিদিক্ নিঃঝুম। বাহুর উপর কালো চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া নিদ্রা-কাতরা বালিকার মত সমস্ত প্রকৃতি ঘুমে অচেতন। তাহারই ঘুমন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত অতি ধীরে বায়ু বহিতেছে, ঝিঁঝিঁর দল ঐক্যতান সুরে মৃদু ঘুম পাড়ানী গান গাহিতেছে, বিশ্ব চরাচর যেন কিসের একটা সাড়া পাইবার জন্য স্তব্ধ হইয়া আছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বপ্ন বিচরণ বন্ধ করিলেন। বাহ্যশক্তি শরীরের উপর আধিপত্য ত্যাগ করিয়া অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। মনের মধ্যে তখন কি ভাবের উদয় হইতেছিল, বোধ করি তিনি নিজেও জানেন না; কিন্তু কি যে একটা অবক্তব্য অপরিজ্ঞাত ভাবের তড়িৎ আনন্দময় কোষকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি-রসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হইতে পারিত।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পাণ্ডু মুখে বিদায় লইল। নক্ষত্রপুঞ্জ একে একে নিবিয়া যাইতে লাগিল। জীবন্মৃত রোগীর মুখে আরোগ্যের নবীন আভার মত পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। পথের কুকুরটা নিদ্রা-ক্লান্ত শরীর একপাশে মেলিয়া দিতে দিতে একবার ডাকিয়া উঠিয়া নীরব হইল। উমাকান্ত সসংজ্ঞ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

স্নানপূজা সারিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিতে ছাত্র কয়জনা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভক্তিনাথ গীতা হাতে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম আসন গ্রহণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "জানবাই আছে ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"—সম্ভ্রমের সহিত নিকটে আসিয়া ভক্তিনাথ পুস্তকখানি পিতার সম্মুখে ধরিলেন; দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম কয়টি শ্লোক নীল পেন্সিল

দ্বারা চিহ্নিত; কহিলেন, "ময্যাবেশ্য মনো যো মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে, শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ,—এই শ্লোকে সগুণ উপাসককে যুক্ততম করেছেন, তবে আবার এই সকল শ্লোকে নির্গুণ উপাসনাকেই বড় করছেন কেন? এটা পরস্পর বিরোধী ঠেকে না কি?"

উমাকান্তের চক্ষের জ্যোতি এখনও তরুণদের চাইতেও উজ্জ্বল, পরিণত বয়সেও খোলা চোখে স্বচ্ছন্দে পড়া শুনা করেন, পুঁথির পত্রে দৃষ্টি রাখিয়া স্মিত গম্ভীর মুখে কহিলেন, "ভগবানের বাণী পরস্পর বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়। যে সারূপ্য লাভ করেছে, তার ভালমন্দে প্রভেদ কি? উপাসকদের মধ্যেই 'তর' 'তম' থাকে।"

একটি ছাত্র আবেদন জানাইল, "আজ আমাদের এ-বিষয়ে সুবিধা থাকে ত একটু বুঝিয়ে দিন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাভাবিক স্নিগ্ধ হাসি হাসিলেন, "আমার সুবিধার অভাব নেই, তোমাদের যদি থাকে, তবে এস।"

গীতা পাঠ চলিল। গীতার রত্নধার দ্বাদশ অধ্যায়। ভগবানের প্রীতিপাত্র মুক্ত পুরুষের কণ্ঠে সে বর্ণনা পবিত্রতর শুনাইতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই একজন শুভ্র বসনা বিধবা আসিয়া প্রণাম করিল। উমাকান্ত কহিলেন, "গিরিজা! ভাল তো সব?"

গিরিজাসুন্দরী অঞ্চল প্রান্তের চাবিগুলো নাড়িতে নাড়িতে কুণ্ঠিত হাস্যের সহিত সজল কণ্ঠে কহিলেন, "আমি এসেছি, ভট্‌চায্যি মশাই! বলি সবারই ত একটা না একটা ব্যবস্থা দিচ্ছো, আমার জন্যে কি করলে বল দেখি। সবাই মিলে ভুলে থাকলে ত চলে না।"

সার্ব্বভৌম হাসিলেন,—"কি চাই দেবী? ইন্দ্রত্ব না অমরত্ব?"

"বল্‌বেন না, নাম কর্ব্বেন না, মরতে গেলে বেঁচে যাই বলে অমরত্ব! আর ইন্দ্রত্ব নিয়েই ত ওই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পড়ে আছি। বলচি কিশোরীর তো—পড়া শেষ হলো এবার ওখানে গিয়ে বিষয়কর্ম্ম দেখুক না। বাসন্তীও তো বড় হয়েছে। বিয়ের পর সবই ত ওকেই দেখতে হবে। আর? কেন আমারও বোঝা নামুক না, পরকালের চিন্তা করি।"

নয়

শচীকান্তের মাসিমা গিরিজাসুন্দরী অনেক টাকার মালিক। গ্রামের তাঁহারা জমিদার। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। মামলা তদারকের জন্য একজন উকিল আছেন। দেউড়িতে দ্বারবান ও বাহির মহলে গোমস্তা, নায়েব, সরকারের অভাব নাই।

নদীর চরে সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে মা কমলা আঁচল পাতিয়া বসেন। সেই সোনা-ফলা জমিগুলির উপর চারিদিককার লোকেরই শ্যেনদৃষ্টি। কিন্তু গিরিজাসুন্দরীর কড়া তদারকে এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার মধ্যে অঙ্গুলীও গলাইতে সক্ষম হয় নাই। একবার নায়েব কিস্তির টাকা লইয়া কি একটা ফেঁসাদ বাধাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কর্ত্রী ঠাকুরাণী পিঠের আঁচল মাথায় তুলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখীন হইয়া অবিচলিত কণ্ঠে আদেশ করিলেন, "খাজনার বাকি টাকা কোথায় আছে,—এনে দাও।" যাদু মুগ্ধের মত ধূর্ত্ত নায়েব বাক্‌শক্তিহীন শিশুর ন্যায় নিঃশব্দে তহবিল ভাঙা টাকা গুপ্ত ক্যাস বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল। গিরিজা তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন না, কাহাকেও কোন কথা জানাইলেন না। ভীত নায়েব প্রতি মুহূর্ত্ত সংশয়ের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিল। না তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, না পুলিস-সোপর্দ্দ করা হইল।

এই যে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হইল, ইহা তার জীবনে মাহেন্দ্রযোগে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘটনা হইতে মানুষটা অসম্ভব বদলাইয়া গিয়াছে। সে নিজের মহাপাতক আজীবনের অনুতপ্ত প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারই সযত্ন চেষ্টায় নদীর সঙ্গে একটা খালের পুরাতন সংযোগকে পুনরুদ্ধার করিবার পর রত্নপুকুরে রত্ন ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন কর্ত্তা মৃত কিন্তু প্রকৃত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহায়তায় বুদ্ধিমতী বিধবাকে বৈষয়িক হাঙ্গামা পোহাইতে হয়না।

গিরিজাসুন্দরীর পুত্র নাই, এক মাত্র কন্যা কল্যাণী,—বড় লোকের ঘরেই

পড়িয়াছে। তার বাপের ঘরে সে যেমন এক মেয়ে, সে ঘরেও সে একটি বউ। মায়ের কাছে থাকা তার বড় ঘটিয়া উঠে না।

গিরিজাসুন্দরী দিনকতক ফুলের রাশি ও চন্দনের ভার দেবতার উপর চাপাইয়া, আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত পূজায় মগ্ন রহিলেন। বলিলেন, "আমার কি? আমি কাকে চাই? তুমিত আর কোথাও যাবেনা, ঠাকুর, তোমাকে পেলেই হ'ল।" পদ্মবীজের মালাগাছি জপের ঘটায় কালো চক্‌চকে হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের ঝোঁক মানুষ বেশী দিন রাখিতে পারে না। চক্র ঘুরিয়া আসিলে, তখন দেখা গেল মন দৈবী মায়াপেক্ষা মানুষের মায়াতেই জড়াইয়া আছে। তেতালা বাড়ীটা বর্ষার বাতাসে হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া নালিশ রুজু করিয়া বলে, একজনকে—অন্ততঃ একজনকে চাই! ঘর সংসার ঠাকুর পূজাও নহিলে ব্যাহত হয়।

ছেলেরা তাদের মাসিমার কাছে যাওয়া আসা করে। শচীকান্তর উপরই তাঁর বিশেষ টান। শচীও পিতৃগৃহের দৈন্যের চেয়ে মাসিমার ঘরের প্রাচুর্য্য পছন্দ করিত। তার পড়ার খরচ তিনিই যোগান।

বড়বধূর কিন্তু এটা বিসদৃশ ঠেকিল। ইহাকে এক চোখোমী ভিন্ন কি বলা যায়? ছোট ছেলেই সব, বড় কেউ-ই নয়! ইংরাজী শিখিল ছোট, কলিকাতায় থাকিবে সে, ভাল চাকরী করিবে সে, আবার মাসির অতটা বিষয় তাও সে ভোগ করিবে। তারা কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? স্বামীকে কহিল, "মাসিমার সঙ্গে দিন কতক তুমিই কেন যাও না? তাঁর শরীর খারাপ, ছোটবাবুর দ্বারা ত আর সেবা যত্ন ঘটবে না, ওঁকেও ত দেখা উচিত।"

পত্নীকে পরের জন্য ভাবিতে দেখিয়া ভক্তিনাথ খুসী হইলেন, কহিলেন, "আমার চেয়ে ও মাসিমাকে বেশী যত্ন করতে পারবে, ওঁর কাছে ওই তো বেশী থাকে!"

বড় বৌ ঝাঁঝিয়া কহিলেন, "গেলে নিজেরই আখেরে ভাল হ'ত। গলায় এই সংসার করে দু-দশটা বিদায়ের টাকায় কি চিরকাল চলবে? বলে, মানুষের কুটুম এলে গেলে,—ও সব দিকেই জিতে গেল!"

বড়বধূর মনের খবর ভক্তিনাথ জানিতেন, এ লইয়া মধ্যে মধ্যে স্বামী

স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষিও চলিত, স্ত্রীর স্বভাব বদল করিতে পারিবেন, এ আশা তাঁর ছিল না। জানিতেন, মানুষের প্রকৃতি জন্মান্তরীণ কর্ম্মসূত্রে পাওয়া। নিজের প্রবল চেষ্টা ভিন্ন অপরে সংশোধন করিতে গেলে বিরোধ বাধাই অনিবার্য্য! কহিলেন, "সে ত সুখের বিষয়! শচী আমার ছোট ভাই, তার উন্নতির জন্যে আমার চেষ্টা করবারই কথা।"

বড়বধূ কহিলেন, "বলি, আর কেউ ত পোয়াতে আসবে না, সেই আমাকেই ত চার চালের ভার মাথায় করতে হবে। না না? ওই যে আইবুড়ো একটা মেয়ে খেয়ে খেয়ে হাতী হচ্চে, ওটাকেও ত পার করা চাই? দু'পয়সার সংস্থান না হলে কেমন করে কি হবে? তুমি মনে কর, আমি কেবল নিজের জন্যেই ভাবি!"

"ও সব পরের কথা পরে—কেন মিথ্যে অত ভেবে মাথা খারাপ করচ?"

ভক্তিনাথ উঠিয়া গেলেন।

দশ

মণীশ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে জনস্রোত-চঞ্চল রাজপথে বাহির হইল, তখন হাতে তার সদ্যোপ্রাপ্ত স্বুবর্ণ পদক এবং অঙ্গে কনভোকেশনের "গাউন"। সেই বেশে দেশের দশের নিকট আদৃত হইয়া আসিয়া সার্থকতার সুখ ও বিজয়-গৌরবের মধ্যে মনে হইল, এই যে বইয়ের বোঝাগুলা সে বহিয়া বেড়াইল, যার জ্ঞান তার সমস্ত জীবন ব্যাপী কালে কোন কাজেই হয়ত লাগিবে না, মনের সঙ্গে এবং মতের সহিতও যাদের সর্ব্বত্র মিল নাই, তাদের চির সঙ্গী করিয়া কাটাইয়া দিতেই কি দুর্ল্লভতর এই জন্ম ঘটিয়াছে?

বাড়ী ফিরিয়া শিবনারায়ণকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। আনন্দাশ্রু চাপিয়া বলিলেন, "সুপুত্রের দ্বারাই কুল ধন্য হয়! মণীশ, দুঃখ দাদা নেই।"

করুণাময়ী কহিলেন, "বাবা মণি! তুমি এলে, বাঁচলুম বাবা, সত্যকে নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছি। কি করবে, কর।"

মণীশ খুড়িমার পদধূলি লইয়া হাসিয়া কহিল, "তাই হবে, খুড়িমা! তোমার এবার ছুটি।"

শিবনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, "এবার তুমি কি করবে স্থির করেছ?"

মণীশ কথাটা তুলিবে মনে করিতেছিল। উত্তর দিল, "যা আদেশ করবেন।"

"তুমি কি ভাল মনে করছো?"

মণীশ কহিল, "সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করলে হয় না?"

ঠিক এই কথাটা শিবনারায়ণের মনেও উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ জানিতেন তাঁর ইচ্ছা মণীশের নিকট প্রকাশ হইলে সে নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অবলীলায় ত্যাগ করিবে। মণীশের কথায় মনটা প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "এর চেয়ে কোন সদিচ্ছা আর হয় না।

কিন্তু মণীশের খুড়িমা এ প্রস্তাব মনের মত না হইলেও স্বামী পুত্রের

ইচ্ছায় নিজের বাসনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হইল না। কহিলেন, "তোদেব যাতে ভাল হয তাতেই আমি সুখী, আমার আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিসের।"

এগার

অপরাহ্ণে ভট্টাচার্য্য মগাশযের চণ্ডীমণ্ডপে সভা বসিযাছিল। টোলের ছাত্রগুলি ত ছিলই, প্রতিবেশী দুই চারিজন প্রবীণও উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি নবদ্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিযা উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশযেব আতিথ্য গ্রহণ করিযাছেন। তিনিও কয়দিন অপবাহ্ণে শাস্ত্রালোচনা কবেন। কথাপ্রসঙ্গে দুই পণ্ডিতের মধ্যে একটু তর্কও উঠে, শ্রোতার দল বিস্ময় কৌতুকে সাগ্রহে বিচার বিতর্ক শুনিয়া যায়।

সেদিন শ্রীপতিবাবু সাকার ও নিবাকার উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় কহিলেন, "নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞান পাইয়াছে, তার সাকাব উপাসনার প্রয়োজন নাই সত্য, তবে ব্রহ্মসম্বন্ধে শুধু গোটাকতক কথা ভাযা ভাষা শুনে বা পড়ে প্রতিমাদিব পূজা ত্যাগ কবিলে দুকূল হারিয়ে কিছু লাভ হবে না। নির্গুণ নিবাকারকে ধাবণা কর্ব্বার জন্য কঠোর তপস্যাব প্রয়োজন। চিত্ত শুদ্ধিব জন্য শম, দম ইত্যাদির অভ্যাস এবং স্বতঃ-চঞ্চল মনকে অবলম্বন দিতে দেব প্রতিমায় চিত্ত স্থাপনের একান্ত প্রয়োজন। বনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে অট্টালিকা দৃঢ় হতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান পাবার পর পূজাদি সাকার-উপাসনা কেবল অজ্ঞানদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যই অত্যাজ্য। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন; যদ্যদা চবতি প্রাজ্ঞঃ তত্তোদেবেতরে জনা।"

শ্রীপতি কহিলেন, "মনে করুন, কোন উপাসক সাকার উপাসনায় বেশ ফল লাভ করলেন, কিন্তু সেই বিশেষ মূর্ত্তি তাঁর চিত্তে এমনি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত

হ'ল যে তাঁকে সেখান হ'তে সরিয়ে নিরাকার নিগুর্ণের ভাবনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না, চিরদিনই সেই মূর্ত্তির উপাসক তিনি রয়ে গেলেন।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "ক্ষতি কি? যিনি তাঁর উপাস্য মূর্ত্তি, তিনিই তো চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। যার চিত্ত যে রূপে যে নামে তাঁর যে বিভূতিতে আকৃষ্ট হয়, তার পক্ষে সেই সাধনাই ত শ্রেয়। ভগবান বলেছেন, 'পরধর্ম্ম ভয়াবহ'—সে পর-ধর্ম্ম। নির্গুণ উপাসক এ জগতে ক'জন আছেন? কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তি বিশ্বাসে বিশ্বাসীভক্ত সাধকের অভাব জগতে নেই। ভক্তি প্রেমের পথ সহজ তাই এই পথেরই যাত্রী সকলে। এ পথ ত তুচ্ছ নয়।"

শ্রীপতি বৎসর দুই ধরিয়া গীতাপাঠ ও পূজার্চ্চনা করিতেছেন, সর্ব্বদাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আসেন, ভাইয়ের সহিত যে মকর্দ্দমা চলিতেছিল তাহা উঠাইয়া লইয়াছেন; পাঁচজনে বলাবলি করে,—'লোকটা বাঁচলে হয়!"

কহিলেন, "নির্গুণ উপাসনায় ব্রহ্মকে পাওয়ার কথা আছে, সাকার পূজায় ত মুক্তির গ্যারান্টি নেই।"

উমাকান্ত হাসিয়া ডিবা হইতে নস্য গ্রহণ করিলেন, কহিলেন, "সাকার পূজায় মুক্তি নাই থাকুক, উপাস্যের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তির বার্ত্তাত আছে? শাস্ত্রকাররা বলেছেন,—উপাস্যের ভাবে ভাবিত না হলে উপাসনা করা যায় না। 'শিবো ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ' শিব হয়ে শিবার্চ্চনা করতে হয়। উপাসক যদি শিবত্ব প্রাপ্ত হন, তবে তাঁর ব্রহ্মকে না পেলেই বা ক্ষতি কোথায়? কথা এই, যা করবে, তা' কায়মন বাক্যের দ্বারা পূর্ণরূপে করা চাই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দুরূহ। জ্ঞান যতক্ষণ পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। যখন জ্ঞান বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায়,—সমস্ত জাগতিক জ্ঞানের সমষ্টি, অর্থাৎ বিশ্বের যত কিছু ব্যাপারের সমষ্টিভূত জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয় যাঁকে ভাবনা করা যায়, তাঁর ভাবে ভাবিত না হতে পারলে তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়া—ও পাওয়া একই। ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে সাধককে ব্রহ্ম হতে হবে। 'স যো বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হয়েছেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বহু জন্মের তপস্যায় প্রাপ্তব্য কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়া এর চেয়ে ঢের সহজ। অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালী সৃষ্টি-কর্ত্তা পিতৃপ্রতীম

মহিমাময় ঈশ্বরের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয়; তা বৃহৎ,—কিন্তু বৃহত্তম নয়। ভগবান বলেছেন, ক্লেশোঽধিক তরস্তেষাম-ব্যক্তাশক্তচেতসাম্‌।'

শিবনারায়ণ ও মণীশ আলোচনা শুনিতেছিলেন।

শিবনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি ব্রহ্মোপাসনার চেষ্টা সঙ্গত নয়?"

"নয় কেন? অধিকারী ভেদে উপাসনা ভেদ। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান পাবার যোগ্য হয়ে জন্মেছেন, তিনি সেই দিকে নিজ হতে অগ্রসর হবেন। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, এদের সকলকার আবির্ভাবেই দেখবে, যে কর্ম্মের জন্য যিনি সৃষ্ট, সহস্র বাধার মধ্য দিয়ে সেই দিকেই তাঁর গতি। নদীর স্রোত পাথর ঠেলে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে, সমুদ্র-বাষ্পের গতি ঊর্দ্ধে।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইল, সন্ধ্যার্চ্চনার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মণীশ ও শিবনারায়ণ প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া মণীশের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, "খুব ত বাহাদুর হয়ে উঠেছ! এখন থেকে আমাদেরই হয় ত ডবল-অনার পাশ গোল্ড মেডেলিষ্ট মণীশবাবুর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করবে, অ্যাঁ!"

মণীশ সঙ্কোচে জড় সড় হইল। শিবনারায়ণ বিনম্রভাবে কহিলেন, "আপনারই আশীর্ব্বাদে—"

উমাকান্ত কহিলেন, "আহা না, ওর কীর্ত্তিটুকু তুমি অমন করে নষ্ট করে দিও না, শিব! বেচারা দু'দু' বৎসর ধরে খাটলে আর এখন তোমরা আমাকে এর ফলভাগী করে তুললে ত ঠিক হবে না! কি বল, মণীশ? এ সব তোমার নিজগুণে এবং পিতৃ পিতৃব্যের পুণ্য কি বলে। দীর্ঘজীবী হয়ে দেশের আর দশের কল্যাণ সাধন করো।"

শিবনারায়ণ মণীশের সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা জানাইলে প্রবীণ অধ্যাপক সানন্দে সম্মতি দান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া উভয়কে বিদায় দিলেন। মণীশ যে সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিল উমাকান্তের নিকট হইতে তাহা সে দৃঢ় করিয়া ফিরিল। তাঁর প্রশান্ত মুখের গম্ভীর ছবি ও জ্ঞানগর্ভ বাণী, তার সমস্ত হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। নক্ষত্র দীপ্ত আকাশের

তলে সমস্ত জগৎ যেন তার অন্তরের মতই প্রশান্ত হইয়া উঠিয়া নেত্রপটে নবীন ভাবের তুলিকা বুলাইয়া দিল।

শুভ তিথিতে স্নানান্তে শুচি বস্ত্রে খুড়া খুড়িমাকে প্রণামপূর্ব্বক এক সাজি ফুল লইয়া উমাকান্তের পদপ্রান্তে রাখিযা সে প্রণাম করিল।

ভট্টাচার্য্য স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্ত স্থির করে ফেলেছ? আরও ভেবে দেখলে হ'ত না? অর্থকরী বিদ্যার সেবা ভিন্ন ত অর্থ লাভ হবে না বাবু? দেব-ভাষা দেব-সামীপ্য দিতে পারে, কিন্তু অর্থ বস্তুটাও ত ত্যজ্য নয়।"

নত মুখে মণীশ কহিল, "ভেবে দেখলাম, যে বিদ্যা ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মাতে সচেষ্ট, চিরজীবন তার উপাসনা করার চেযে ঈশ্বরের কাছে যে পৌঁছে দেয, তারই সাধনা শ্রেয়ঃ।"

উমাকান্ত কহিলেন, "তোমার মত মন আমার দেশের সকল ছেলের হোক্।"

প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিযা পট্টবস্ত্রে পূজা-গৃহে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার সময় মণীশ সত্যকেও বসাইতে আরম্ভ করিল, পুজার পর গীতাপাঠ কালে খুড়িমাকে ভাবার্থ বুঝাইত, সার্ব্বভৌম মহাশযের বাড়ী লঘুকৌমুদী ও ন্যায় বৈশেষিক সূত্র পড়িতে যাইত, সত্যর পড়া সে ঠিক করিযা দিযা যাইত। ফিরিযা পড়া দেখিত। এইরূপে সমস্ত দিনটাই বিধিবদ্ধ কর্ম্মের মধ্য দিয়া কাটিযা যায। দ্বিপ্রহরে শিবনারায়ণ তাহাকে লইযা কাণ্ট, হার্ব্বার্ট, স্পেন্‌সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনিষীগণের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঘরে ছোট খাট লাইব্রেরী। অপরাহ্নে উভযে গৃহোদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে অধীত বিষয়গুলির আলোচনা করিতেন। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের কোথায কতটুকু সামঞ্জস্য আছে, উভযে খুঁজিযা বাহির করিতেন। সেই সময় বহু আলোচনা চলিত। একদিন কথা প্রসঙ্গে মণীশ কহিল, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধগুলি যে কেবলমাত্র অর্দ্ধসভ্যজাতির কুসংস্কার মাত্র নয় বরং সম্পূর্ণ উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত, এ বিষয়ে বই লিখতে ইচ্ছা করে।"

শিবনারায়ণ আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "সার্ব্বভৌম মশায় এতে তোমায়

যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। ঋষিরা যে কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, দু' একটা সামান্য বিষয় থেকে তা সভ্যজগত এখন কিছু কিছু জান্‌তে পারচেন। তবে এখনও এদের বিজ্ঞান অত উন্নত হয়নি, তাই তাদের ক্ষমতা বুঝতে বিলম্ব হবে। প্রাতঃস্নান, দধিভোজন, তৈলমর্দ্দন, গোময় ধূপধুনার ব্যবহার এমনি গোটাকতক সাধারণ জিনিষমাত্র এরা ভাল বলেছে বলেই না লোকে সেগুলোর আদর করতে আরম্ভ করেছে। যে যুগের যে ধর্ম্ম।"

মণীশ দিনে দিনে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, ততই তাঁহাকে অনুসরণ করিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে নিজের গণ্ডী হইতে ঠেলিতে লাগিল। প্রতিদিন তাঁর আশীর্ব্বাদটুকু দেব নির্ম্মাল্যের মত মনের উপর নিঃশব্দে বুলাইয়া অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া লইত। প্রতিদিনই মুখের উপর উত্তরোত্তর পরিতৃপ্তির দীপ্তি লইয়া স্নিগ্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসে। অনাবিষ্ট উদ্ধত সত্যকে লইয়া অস্বস্তির কারণ উপস্থিত হইলেও সে ধীর ভাবেই সহ্য করত। সে যে দেখে শিষ্যকে কতখানি সহ্য করিতে পারিলে গৌরবান্বিত গুরু হওয়া যায়! পুনঃ পুনঃ ভুল করিয়া চাষাভুষাদের মূর্খ ছেলেগুলা যখনই তাদের ছিন্ন মলিন প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ-পরিচয় সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি হবে, ভট্‌চায্যি-মশাই আবার কও তো।" স্নিগ্ধহাস্যে বিরক্তি-হীন শিক্ষক আবারও পাঠ বলিয়া দেন। যতবারই ভুল হোক, অসন্তোষ নাই। কেহ বলিলে বলেন, "ওরা পুরুষানুক্রমে মাথা খাটায়নি, ধৃতি শক্তিতে মরচে পড়ে আছে, ঘসতে হবে না!"

মণীশ স্থির করিল পড়াশুনা কাজকর্ম্মের অবসরে নিরক্ষর গরাবদের জন্য একটি পাঠশালা খুলিবে। দেশের সকল লোকেরই একটু বিদ্যাশিক্ষা প্রয়োজন। নিজের নামটা সহি করিতে জানিলেও কত উপকার। সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিল, "আপনাকে এখানকার সকলেই দেবতার মত সম্মান করে, আপনি আদেশ করলে সবাই মানবে।"

উমাকান্ত কহিলেন, "দেবাদেশ যদি সবাই শোনে তবে ত সংসার স্বর্গ হয়েই ওঠে। বলতো দেবতা আদেশ করেই দেখতে পারেন। কলির দেবতা বলেই ভয়।"

বার

মণীশ এই সকল জনহিতৈষণা কার্য্য লইয়া গ্রামে রসিতে দশজনে খুবই সন্তুষ্ট হইল। এই উন্নত চরিত্র সুবিনয় যুবকটিকে সকলেই স্নেহ করে। সে যখন পাঠশালা খুলিয়া যত রাজ্যের অকেজো ছেলেগুলাকে জড় করিয়া তাদের অনাসৃষ্টি অত্যাচার হইতে বাড়ী পাড়া এবং রাস্তাটাকে শুদ্ধ ঘণ্টা দুইয়ের জন্যও নিরুপদ্রব করিতে লাগিল, তখন সম্মানের দায়ে মণীশ বা তার খুড়া খুড়ির পথচলা ভার হইয়া উঠিল। বাগ্‌দি বউয়ের চাল হইতে ছাচি কুমড়া, দুলে গিন্নির লাউ-ডগা প্রভৃতি বিচিত্র সওগাতও ক্রমে তাঁদের ভাণ্ডারে উঠিতে লাগিল। বারণ করিলেও শুনেনা, হাতযোড় করিয়া বলে, "তেনার নাম লিয়ে এনেচি, ও কি আর খদকুড়ে ফেলতে পারি, দেবতার দৃষ্টি করিয়ে দিয়ো।"

খুড়িমা হাসিয়া মণীশকে ডাকিয়া বলেন, "ও মণি, তুই যে দেখতে দেখতে দেবতা হয়ে উঠলিরে! দেখিস্ বাছা দেবতার মা হতে আমার সাহস নেই,—তাদের মায়া দয়া থাকে না।"

মণীশ হাসিয়া চলিয়া যায়। রাস্তা ঘাটে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের ধূমে কর্ণমূল লাল করিয়া মধ্যে মধ্যে সে ভাবে এ রকম করিলে পাঠশালা চালান দায় হইবে!

সত্যই কেবল বিপদে পড়িয়াছে। ছিপ-বঁড়সি সব মজুত অথচ দাদার জন্য মাছ ধরা বন্ধ বোতল-চুরের মাঞ্জা দেওয়া লাটাই ভরা সূতা ঘরের কোণে পড়িয়া,—রাখাল, বিষ্ণু, পা টিপিয়া টিপিয়া দিনের মধ্যে সাতবার জানালায় জানালায় উঁকি দিয়া দ্বারে টোকা মারিয়া যায়,—দূর হইতে সাঙ্কেতিক শৃগাল কুকুরের ডাকও ডাকে, স্বয়ং গৌরী আসিয়া মলের চঞ্চল রবে কক্ষমুখর ও কক্ষাধিকারীর বক্ষে চঞ্চলতার নিক্কন প্রতিধ্বনিত করিয়া দেয় তথাপি ছুটি নাই! দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় বইগুলা সে আছড়াইয়া কলমটা ছুঁড়িয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে। মণীশ নীরবে বসিয়া হাসে। সে রাগ করিলে বা লে ব্যাপারটা কতক সহজ হইত কিন্তু তার এই নির্লিপ্ত দৃঢ়তায় সত্যর

মনে বিন্দুমাত্র আশা জা্গে না। কাগজের উপর পেন্সিল বুলাইয়া নিঃশব্দে জ্বলিতে জ্বলিতে ইংরাজি তরজমা করিয়া যায় বা অঙ্ক কষে।

সন্ধ্যার পর সায়াহ্ন-কৃত্য সমাধা করিয়া কিছুক্ষণ সত্যকে পড়াইবার পর দুই ভাই শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া বসিত। আলো অন্ধকার পাশা-পাশি দাঁড়াইলে যেমন পরস্পরের অনৈক্য প্রকাশ পায়, এই দুই ভাইয়ের মধ্যেও সেই রকম একটা প্রকাণ্ড অমিল ছিল। মণীশ যেমন শান্ত সংযত সত্য তার উল্টা। তাঁদের তখন আলোচনায় সত্যকে শিক্ষা দিবার চেষ্টাই সমধিক, কাজেই সেগুলার রস সত্যর নিকট তিক্ততর। শিবনারায়ণ যখন তাহাকে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অথবা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ প্রভৃতি সৌর জগতের মানবাবিষ্কৃত জ্ঞান সমূহ গিলাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন, সে তখন কেমন করিয়া দাদাকে ফাঁকি দিয়া গৌরী প্রভৃতি সঙ্গীদের সহিত হল্লা করিতে যাইবে, তাহারই বিবিধ ও বিচিত্র কৌশল উদ্ভাবনে ব্যাপ্ত। আজকাল বাগানের নারিকেল কুল ডাঁসিয়া উঠিয়াছে,—তার ভাবনার অন্ত ছিল না।

মণীশ প্রাচ্য-বিজ্ঞান নাম দিয়া পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন কালের বহুদর্শী বৈজ্ঞানিক ঋষিগণের গভীর জ্ঞান বিজ্ঞানের কতটুকু এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহাই সে তুলনায় প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছিল। বাস্তবিকই একজন যেন জ্ঞান সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন এবং অন্যে তীরে বসিয়া উপল কুড়াইতেছে। মনে করিতে চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসে—হায়, কোথা হইতে তাহারা কোথায় নামিয়াছে?

এই সময় সহসা ভট্টাচার্য্য গৃহে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিতে ছিল। গৃহিণী ভগ্নস্বাস্থ্যে শয্যাশ্রিতা হইয়াছেন। বড় বধূই বাড়ীর সর্ব্বময়ী গৃহিণী। 'রাজ-পরিবর্ত্তনের সহিত গৃহিণী পরিবর্ত্তনের বড় একটা প্রভেদ নাই। কখনও কখনও ঘোর অরাজকতাও দেখা দেয়। এবাড়ীর নূতন, গৃহিণীর সহিত পুরাতনের প্রভেদ বিস্তর। একজন নম্র স্নেহশীলা, অন্যে-স্বার্থপর পুরুষ প্রকৃতি। দাসী বা আশ্রিতারা ঠাণ্ডা মেজাজের মুনিবের চেয়ে কড়া হাতে অনেকটা ঠিক থাকে, কিন্তু আড়ালে রাজার মাকেও যখন ডাইন বলা চলে, তখন ভট্টাচার্য্য-বধূর সম্বন্ধে সমালোচনা কেনই বা না চলিবে? জব্দ হইয়াছিল

হইয়াছিল গৌরী। বড় মামী তাহাকে কোনদিনই সুনজরে দেখিতে পারেন না, তবু দিদিমার জন্য এ বাড়ীতে তার কতকটা জোর ছিল, কিন্তু এখন নূতন গৃহিনী গৃহিণী-পণার অধিকার হাতে পাইতেই এই বুড়া-ঢেঁকি মেয়েটাকে শুধরাইয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "খেয়ে খেয়ে মেয়ে দিন দিন হাতী হচ্ছেন,—সংসারের একটি কুটি ভেঙ্গে দু'খান করে না, এ ধিঙ্গি মেয়ে নিয়ে ভুগতে হবে ত আমাকেই। লোকের কি,—লোকে কেন আদর দেবে না?" ননদকে কহিলেন, "তোমাকেও বলি, ঠাকুরঝি অসৈরণ দেখে না বলেও থাকতে পারিনে,—এ কি শিক্ষা তুমি দিচ্চ? অত বড় মাগী যে দিনরাত ছিপ ঘাড়ে করে গাঙ্গুলিদের ধেড়ে ছেলেটার সঙ্গে নেচে বেড়ায় ঘরকরণার একটা কাজে নেই, কর্ম্মে নেই, এ কি ভাল হচ্চে? শ্বশুরবাড়ী গেলে অমন বউকে তারা কুলোর বাতাস দিয়ে যদি না বিদায় করে, ত আমি কি বলেছি!"

বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটি নিতান্তই নিরীহ। তিনি ভ্রাতৃজায়াকে উত্তর দিলেন না, ডাকিলেন, "রাণু!"

গৌরী মুক্ত বেণী দুলাইয়া ছুটিয়া আসিল, কহিল, "কি মাসিমা?"

"পানগুলো সেজে রাখগে না, মা!"

গৌরী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কহিল, "এক্ষুণি! এখন যে আমি সত্যদের বাড়ী যাচ্ছি, মাসিমা!"

বিন্ধ্যবাসিনী একবার রাগিবার চেষ্টা করিয়া ধমক দিলেন, "খবরদার সত্যদের ও দিকে তুমি যাবে না।"

গৌরী ভীত হইয়া মাসিমার মুখের দিকে চাহিল। যাদের সহজে রাগিতে দেখা যায় না, তারা যখন রাগ করে সত্যই ভয় পাইতে হয়।—তার মুখ এতটুকু হইয়া গেল, প্রকৃতি সিদ্ধ আব্দারের ভাব ত্যাগ করিয়া তটস্থভাবে সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস হয় ত তার নিজেরও অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ছোট্ট একটি মাতৃহারা-পিতৃত্যক্তা শিশুর ক্ষুব্ধ চিত্তের একটুখানি ভার মাত্র এই বাতাসে মিশ্রিত ছিল, কিন্তু তার মাসির বুকে উহা তপ্ত শেলের মতই বিঁধিল। এই বনবিহঙ্গিনীকে কেমন করিয়া তিনি খাঁচায় পুরিয়া রাখিবেন। লোহার শিকল দিয়া চঞ্চল হরিণশিশুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু তার সুদূর পলায়িত মনের অনুসরণ কে করিতে

পারে? বিন্ধ্যবাসিনী স্নেহে করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন, ভাবিলেন, এত কি মায়া! সত্যই কি দোষে আমি আদর দিয়ে মেয়েটার স্বভাব বিগড়ে দোব। বড়বধূ রোরুদ্যমান ছেলেকে লইয়া আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারে উঁকি দিয়া কহিলেন, "দুধ জ্বাল্ হল গা? ছেলেটা ত আর না খেয়ে থাকতে পারে না, কেঁদে কেঁদে পাগল করে দিলে।"

বিন্ধ্যবাসিনী থতমত খাইয়া গেলেন, চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "এই যে ভাই, এখনই দিচ্ছি,—এমন পোড়া মনও হয়েছে। ও মা; গয়লাবৌ এখনও দুধ দেয় নি! দেখছ মাগির আক্কেল?"

দেখছি বই কি, আক্কেল সব্বারই সমান! হতভাগা ছেলে চুপ কর। কে' তোকে সাত সকালে খেতে দেবে রে, লক্ষ্মীছাড়া!" ছেলেকে ঝাঁকানি দিয়া মাটিতে বসাইয়া জননী চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালেও ননদকে কাঁটা ফুটাইয়া যাইতে ভুলিলেন না, "গয়লাবৌকে সকাল করে দুধ দিতে বললে কি আর দেয় না, বলে কে?—এ ত আর কারো আদরের ধন নয়,—আমার ছেলে মরলেই বা কার কি!"

ঠাকুরদের রান্না রাঁধিতে রাঁধিতে আ-কাচা জামা পরা ছেলেকে তিনি ছুঁইতে পারেন না, ডাকিলেন "রাণি!"

গৌরী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "খোকাকে একবার নে' ত মা! পান সাজা হয়েচে?"

সব হয়নি বলিয়া গৌরী অঙ্গুলি লিপ্ত খদিরের ছোপ আঁচলে মুছিয়া ক্ষীণ দুইটি হস্তে পরিপুষ্ট শিশুকে কষ্টে উঠাইল। তার মুখে বিষাদের কোন চিহ্নই ছিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিন্ধ্যবাসিনী ডাল সাঁতলাইয়া ঢালিতেছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কিরে?" তাঁর বুকের বোঝা যেন এই সরল হাস্যস্রোতে এতক্ষণে ভাসিয়া গেল।

গৌরী হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "খোকা কি রকম ভারি মাসিমা! দাদুর গন্ধমাদন তোলার গল্পের মতন ওকে আমি তুল্লুম।" বলিতে বলিতে উপমেয় বস্তুটাকে স্মরণ করিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কিন্তু এত বড় একটা কবিত্বপূর্ণ উপমার মধ্যে হাস্য রসের পরিবর্ত্তে এমন একটা রসের আস্বাদ পাইলেন, যে চকিতে চারিদিকে চাহিয়া

দেখিলেন, পরে স্বর খাটো করিয়া কহিলেন, "ও কথা কি বলতে আছে ?"

"কেন থাকবে না ? আমার পাথরের ছেলে শানে আছড়ালেও মরে না—। যিনি যত পারেন খুঁড়ুন না, দুঃখ থাকে কেন ? একেই বলে মিটমিটে ডান—ছেলে খাবার রাক্ষস ! হায় রে আমার কপাল, এই মেয়ে আমি ভাল করব।"

বড়বধূ তৈল ভাণ্ড লইয়া রন্ধনের জন্য তৈল দিতে আসিতেছিলেন, এই কথা বলিয়াই স্তম্ভিত গৌরীর কোল হইতে ছেলেকে ছিনাইয়া লইয়া ননদকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ওগো, বেগুনে অত করে তেল না-ঢেলে একটু দরদ করো, একটা মানুষের ঘাড়ে নৈলে আর কতই সয় !"—বলিয়াই গমনোদ্যত হইলেন। গৌরী দৌড়িয়া গিয়া ক্রন্দন-পরায়ণ শিশুর হাত ধরিল, বিষণ্ণ মুখে কহিল, "মামিমা, আমার দোষ হয়েচে, ওকে আমায় দাও।"

বড়বধূ মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, "রক্ষে কর বাছা,—ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ ! যাও, তুমি খেয়ে দেয়ে সত্যর সঙ্গে খেলতে যাও, নবাবের কন্যে নবাবের বৌ হবে। তবে এই বলে রাখছি—তারা যদি না তোমায় খ্যাংরা মেরে বিদেয় করে ত নাক কান কেটে ফেলবো।"

গৃহিণীপনার সমুদয় অধিকার অসহায় প্রাণী দুইটীর উপর প্রয়োগ করিয়া নূতন গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

সেদিন বড় বেশী রাগ করিয়া মুখখানা যথাসাধ্য ভারী করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "যা, খোকার দুধ নিয়ে আয়।" সে আজ্ঞা পালিত হইলে পুনশ্চ কঠিন স্বরে আদেশ করিলেন, "বাসনগুলো ধুয়ে রাখ্। আর দেখ্ আজ থেকে তুই বাড়ী থেকে এক পা নড়তে পাবিনে, এই বলে দিলুম ?—যদি কথা না শুনিস, তা হলে—"

বিন্ধ্যবাসিনী কথাটা অসমাপ্তই রাখিয়া দিলেন। 'তা হলে' তাঁহার দ্বারা আর যে কিছু হইতে পারিবে, এমন ত বোধ হয় না। এই শাসনের ছলটুকুই তাঁহাকে যথেষ্ট অপরাধী করিয়া তুলিতেছে। গৌরী বাসন ধুইতে ধুইতে হাসিয়া উঠিল, "ও মাসিমা ! ও মাসিমা ! ভারী মজা হয়েচে। মঙ্গলা গাইটা দড়ি ছিঁড়ে এসে সব বড়িগুলো খেয়ে ফেল্‌লে।" বলিতে বলিতে

হাসিয়া সে লুটাইয়া পড়ি "ও মাগো! কি রকম তাড়াতাড়ি কয়ে খেয়ে নিচ্চে, দেখ!"

বিন্ধ্যবাসিনী সবেগে বড়ি আছড়াইয়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, গরু তাড়াইয়া অবশিষ্ট বড়ি উদ্ধার করিয়া আনিয়া সক্রোধে কহিলেন, "হতভাগা মেয়ে—তোমার সবতাতেই হাসি! বউ দেখলে কি বলবে, বল্ দেখি।"

দুপুর বেলা কাজকর্ম্ম সারিয়া বিন্ধ্যবাসিনী রুগ্না মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া একটু বেলা পড়িতেই গৃহ-কার্য্যে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। মা'র কঙ্কাল-সার মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু কি করিবেন ঠাকুর-দেবতা আছেন, বাপ ভাই আছেন,—সমস্তই ত দেখা চাই। গৌরী অন্য কাজে মন লাগাইতে পারে না, কিন্তু দিদিমার সেবা অনন্যচিত্তে সে করিতে পারে। এই খানে তার সুপ্ত নারী মহিমা জাগ্রত হইয়া উঠে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দিদিমাকে সে পাখা করিতেছিল মধ্যে মধ্যে পাখা নামাইয়া কচি হাতখানি তাঁর তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেছিল। গভীর বিষাদের ছায়া তাঁর অকারণ-হাস্যে উৎফুল্ল মুখখানিকে প্রৌঢ়ার মত গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় মধ্যে মধ্যে চোখে কেবলই একটা জলের আভাসও ভাসিয়া উঠে।

বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে ডাকিয়া প্রদীপের সলিতা পাকাইতে বসাইলেন। অমনই জানালার বাহিরে শব্দ উঠিল, "গৌ, গাবৌ, গাবঃ—"

"ঐ সত্যদা!" বলিয়া সদ্য বিকশিত পদ্মের মত উৎফুল্ল মুখে তৎক্ষণাৎ কাজ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "খবরদার যাস্‌নে! সারাদিন কি শেখালুম?"

"না মাসিমা! সে আমি কিছুতেই পারব না,—কেন তুমি আমায় খেলতে দেবে না, খালি খালি কাজ করাবে কেন?"

বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষে এ তিরস্কার বড় বিঁধিল। তথাপি বিরক্তির সহিত কহিলেন, "এখন বড় হচ্ছ, যার তার সঙ্গে কি খেলে? ঘরে বসে পুতুল খেল না।"

মাথা নাড়িয়া বিদ্রোহী গৌরী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এক্ষুনি আমি এত

কি বড় হয়ে গেলুম, বা—রে! আর সত্যদা বুঝি :ব মে হল? ও আমাকে কত ভালবাসে, ভাল ভাল পেয়ারা কুল বেছে বেছে আমায় দেয় না? আমি ওর সঙ্গে একটু খেলা করতেও পাব না বৈ কি! আমিও ওকে খুব ভালবাসি।"

তের

গঙ্গামণির দিন ফুরাইযা আসিয়া অপরাহ্নের শেষ রশ্মিটুকুর মতই জীবন নদীর পশ্চিম কূলে অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় তাঁহাকে লইয়া কাশী আসা হইল।

গিরিজাসুন্দরী বোনকে দেখিতে আসিয়া অবস্থা দেখিযা ফিরিতে পারেন নাই। বুক ফাটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে রুদ্ধ রাখিয়া গঙ্গামণি কহিলেন, "গিরিজা!—আমাব শচী এল না?" তাঁর দুর্ব্বল বক্ষ আলোড়িত করিয়া দুই চোখে জল ভরিয়া উঠিল। জীবনী-শক্তির ক্ষীণ অবস্থায় অল্পেই মনে আঘাত লাগে। গিবিজা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "সে ত তোমার এত অসুখ জানে না, দিদি! আমি তাকে আসতে লিখিয়ে দিচ্ছি এখনই।"

মায়ের সকল দুঃখ মিটিয়া গেল। সে জানে না—তাই! নহিলে কি না আসিয়া থাকিতে পারে।

শচীকান্ত মায়ের অবস্থা শুনিয়া অবিলম্বে আসিল। ভোরের ট্রেণ ছাড়িয়া যখন সে নৌকায় গঙ্গা পার হইতেছিল, তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। সদ্য-প্রকাশিত আদিত্যের সহস্র উজ্জ্বল রশ্মি অতি স্নিগ্ধভাবে পরপারের সৌধকিরীটের শির স্পর্শ করিয়া বিশ্বাধিপতিকে প্রণাম জানাইতেছিল। মুকুলিত জগৎকে ক্রমশই সেই নবীন আলোক তাহার মন্ত্রস্পর্শে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছে। আকাশের গায়ে স্তরে স্তরে বর্ণরেখা ফুটিয়া উঠিয়া

পূজা গৃহাভিমুখী সুর-কন্যাদের কৌষেয় বসনের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সুর-জগতের মঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া প্রভাত পবন সদ্য জাগরিত প্রতি চিত্তকে দিবসের প্রধান কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টায় বারবার আনা গোনা করিতেছে। নৌকায় বসিয়া শচীকান্ত বিস্ময় কৌতুহলে সম্মুখবর্ত্তী প্রসাদ-মন্দির-মেখলা বিচিত্র নগরীর অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য শোভা দেখিতে লাগিল।

জহ্নুতনয়া দুই রজত বাহু বিস্তার করিয়া বিশ্বাস পরায়ণা ভক্তের মত বিশ্বেশ্বরকে ব্যগ্র আবাহন করিতেছেন, তাঁর পরিতৃপ্ত বক্ষ দর্পণে শত মন্দিরের দীর্ঘ ছায়া নবীন রৌদ্রে ঝিলমিল করিতে করিতে বহু শত বৎসরের অতীত গাথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। নদী তীর হইতে প্রশস্ত প্রস্তরসোপান-শ্রেণী জলের মধ্যে নির্ভয়ে অবগাহন করিয়া রহিয়াছে। মণিকর্ণিকায় এবং দশাশ্বমেধে ইতঃমধ্যেই ভিড় জমিযাছে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণই স্নানাদি সমাধা করিতেছেন। নৌকা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, শচীকান্ত দেখিল সকলকার মুখেই যেন কেমন একটু উদ্বিগ্ন ভক্তির ভাব। যেন বেলা বহিয়া যাইতেছে, মন্দিরের পূজা সমাধা হইয়া যাইবে, এমনি একটা উদ্বেগ সকলের মুখভাবেই প্রকটিত হইতেছে। সে বিস্ময়ের সহিত ভাবিল, এরকমটি আর কোনখানে কিন্তু দেখা যায় না। ঘাটের উপরে গাছ তলায় ধুনী জ্বালাইয়া জটাভার চূড়াকারে বাঁধিয়া কৌপীনধারী ভস্মমাখা সন্ন্যাসীর দল স্থানে স্থানে দগ্ধ কাষ্ঠ ঠুকিয়া অগ্নি নির্গত করিয়া গাঁজা সাজিতেছে, কেহ কলিকাটি নামাইয়া রক্ত নেত্র অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া আপনার মনে দুলিতে দুলিতে গুন্ গুন্ শব্দে তুলসীদাসের দোঁহা আবৃত্তি করিতেছে। ইহাদের একজনের নিকট এই প্রত্যুষে অনেক পুরুষ এবং তাহা অপেক্ষাও অধিকাংশ নারী সমাগম হইয়াছিল। সন্ন্যাসীদের ভাঁড়ে ভাঁড়ে দুগ্ধ ও ফল দান করিতে এরা ভুল করে না। অনেকেই মাটিতে পড়িয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া তদ্‌গত চিত্তে পদধূলি গ্রহণ করিতেছিল। বিরক্তি বোধ করিলেও শচীকান্ত, ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া একটা ভিড়ের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল ইনি জ্যোতিষী, হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিয়া দেন। শুনিয়া শচীকান্তের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফিরিতেছিল,

কিন্তু ভবিষ্যৎ-বেত্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সুবেশধারী তরুণ দর্শকের উপর পতিত হইল। ডাকিলেন, "আও বাবুজী! তেরা নসীব বড়ি আচ্ছি হ্যায়।" কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর ছিল। শচীকান্ত একটু কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শুনাই যাক না কি বলে! সহাস্যে মুখে জ্যোতির্ব্বিদের সম্মুখে হাত পাতিয়া দিল।

জ্যোতিষী বহুক্ষণ ধরিয়া সেই হাত ও অঙ্গুলীগুলি বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল,—"যব রেখা আছে, বিদ্যা লাভ ধন মধ্যম, ধর্ম্ম স্থানের গ্রহ নীচস্থ, উচ্চ পদ—বাবু তুমি হাকিম হবে।"

শচীকান্তর পিতা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিদ্যাকে 'অফলা-বিদ্যা' বলিয়া ইহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন না, বলিতেন, 'ঈশ্বর যাহা বিধান করিবেন, তাহা যথাকালেই জানা যাইবে। দণ্ড-পুরস্কারের সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলে তাহার ফল ঠিক উপভোগ হয় না। তথাপি শিক্ষার্থ তাঁহাকে যেটুকু জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলন করিতে হইয়াছে, তাহা হইতে শচীকান্তর এই বিদ্যার উপর আস্থা না জন্মিয়া পারে নাই।

ভবিষ্যৎ-বেত্তার সংবাদটা মন্দ নয়! একটু উৎসাহিত হইয়া কহিল, আয়ু দেখুন ত—"

জ্যোতির্ব্বিদ্‌ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির তল হইতে সম্মুখে বিস্তৃত একটি পরিচিত রেখা বহুবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর মুখে থাকিবার পর কহিলেন, "অরিষ্ট আছে,—আয়ুস্থান অষ্টমে পাপ গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি, শনির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা;—তা এর প্রতিকার হ'তে পারে। সওয়া পাঁচ টাকা খরচ করিয়া লোহার অস্ত্র একটা, কালো কম্বল দুইখানা এবং সওয়া সের কৃষ্ণ তিল উৎসর্গ করিলে দোষ কাটিয়া যাইবে। বাবু তোমার বিবাহ হয়েছে?"

হাত টানিয়া লইয়া শচীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং "না" বলিয়া পকেট হইতে একটি দুয়ানি বাহির করিয়া জ্যোতিষীর সম্মুখে অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া দিল। শেষ সংবাদটি তাহার পূর্ব্ব সংশয়কে নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহা এই,—'ভণ্ড!'

জ্যোতিষী একটু আশাহতভাবে দুয়ানিটি মাটী হইতে তুলিয়া লইলেন,

একবার ক্ষুব্ধ নেত্রে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তুমি বিবাহ করিও না। চলিয়া যাইতেছে,—গ্রহ-শান্তির কি হইবে? অদৃষ্ট বড় ভারি!"

"কিছুই না"—বলিয়া শচীকান্ত ভিড় সরাইয়া বাহির হইয়া আসিল। মনে মনে বলিল "যা আছে আমার আছে, তোর সাধ্যে তার প্রতিকার নেই!" তারপর রাস্তায় পড়িয়া সে গতি দ্রুত করিয়া দিল।

মায়ের অবস্থা দেখিয়া আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া শচীকান্ত মায়ের কাছে সরিয়া বসিল। তার মন স্বভাবতঃই একটু কঠিন বটে, তাই বলিয়া সে নিষ্ঠুর নয়। আজিকালিকার দিনে যে রকম সাধারণতঃ হইয়া থাকে, সেও তাদের মত একজন,—না দেবতা, না পিশাচ,—মানুষমাত্র।

মণীশ কহিল, "এস, বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনি।" দুই বন্ধুতে বাহির হইল।

গঙ্গাতীর হইতে যে নগরীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শককে ভক্তি-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া তুলে সহস্র গলি-ঘুঁজির মধ্যে সেই দীর্ঘ মন্দির চুড়া যথন অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন আবার দর্শকের নেত্রে এমনই ঘৃণাজনক দৃশ্যসকল পতিত হয় যে, চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। যে কাশীর অপূর্ব্ব আনন্দময় শোভা দেখিয়া দেবতার আবাস বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহারই এক প্রান্তে এ কি নরকের মুক্ত দ্বার দেখা যাইতেছে! কিছুদূর আসিয়া হঠাৎ শচীকান্ত কহিল, "মণীশ এই তোমার স্বর্গপুরী কাশী?"

কাশীর মাহাত্ম্য বা মহিমা কি এবং ইহা কাহার পক্ষে স্বর্গপুরী তাহা মণীশ জানে। এই চিরদিনের কাশী অনাথা হিন্দু বিধবার ও সাধু মহাত্মার শেষ সম্বল, শান্তিহীনের সান্ত্বনার স্থল, ইহা ভোগীর স্বর্গ নহে, ত্যাগীর স্বর্গ! কিন্তু সে তর্ক পরিহার করিয়া কহিল, "সোনায় কি খাদ থাকে না?"

"খাদের অংশটা যে বড় বেশী মনে হচ্চে।"

ক্রমে তাহারা দশাশ্বমেধে পৌঁছিয়া বিশ্বনাথের গলির মুখে আসিয়া পড়িল। সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে বিচিত্র সাজে সজ্জিত সুন্দর বিপণিশ্রেণী, পথে লোক ধরিতেছিল না। শচীকান্ত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে মরতে হবে যে।"

মণীশও তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "থিয়েটারে এর চেয়ে কম ভিড় হয় কি? সর্দ্দিগর্ম্মি হয় না ত।"

"তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা! আমি যাব না। ফেরা যাক।"

মণীশ দৃঢ় স্বরে কহিল, "আমি যাব।" দৃষ্টিতে তার তিরস্কার মিশ্রিত ছিল। বিরক্তি নীরস স্বরে কহিল, "চল তবে আমিও যাই, কিন্তু এর কোন মানে হয় না।"

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মণীশ তাহাকে দেখিতে পাইল না, সংগৃহীত পুষ্পাদি দ্বারা স্তূপান্তরালস্থিত বিশ্ব-দেবতাকে অর্চ্চনা করিল। সে দিন সোমবার, মহাদেবের বিশেষ পূজার দিন। ভিড়ের সীমা ছিল না, "হর হর বিশ্বনাথ" ধ্বনি উঠিতেছে, গম্ভীর নিঃস্বনে মন্দির ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বাজিতেছে, রাশি রাশি পুষ্পচন্দন কুণ্ডের মধ্যে অজস্র ধারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোনমতে ভিড় সরাইয়া পূজা-অন্তে মণীশ বাহির হইয়া আসিল। দুই দণ্ড দাড়াইবার সুযোগ ছিল না। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে সে পরিচিত পাণ্ডার দ্বারা কলী-চর্চ্চিত ও মাল্য-ভূষিত হইয়া প্রণামী দিয়া বন্ধুর খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। একটা বৃহদাকার নবীন বৃষ ব্যস্ত-মণীশের গলার মালাগাছির উপর লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। মুখের উপর কাম্য ফুল নিক্ষেপ করিয়া দোকানের সম্মুখে দাড়াইয়া শচীকান্ত কাঠের ঘোড়ার দর করিতেছিল। মণীশ আসিয়া কহিয়া উঠিল, "তুমি মন্দিরে যাওনি?"

"না,—দেখত মণীশ, এইটের দাম চৌদ্দ আনা হবে কি?"

"কা'র জন্য?"

"কল্যাণীর খোকার জন্যে। আচ্ছা এস, উঃ যা' ভিড়।"

মণীশ বন্ধুর অনুসরণ করিল কিন্তু তার ব্যবহারে মনে ক্ষোভের সীমা রহিল না। তার পুণ্যাত্মা পিতা-মাতা জানিলে আঘাতই পাইবেন। কথা বলিবার প্রবৃত্তি হইল না। রাজপথে তখন রৌদ্র নামিয়াছে, পাথরের রাস্তা তাতিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফুলশূন্য ফুলের সাজি দুলাইয়া এখানে ওখানে পঞ্চপাত্রস্থিত জলের ছিটা দিতে দিতে কাশীবাসীগণ ঘরে ফিরিতে-

ছিলেন। একটি বৃদ্ধা যুবকদ্বয়কে দেখিয়া জাতিসুলভ কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা বাছারা কোথা থেকে আসচ গা?"

সম্মুখে বেণী-মাধবের ধ্বজা অতীতের একটা অতি কঠোর স্মৃতির সাক্ষ্য-স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শচীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কিসের মনুমেণ্ট রে?"

মণীশ জিনিষটার প্রকৃত ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া কহিল, দেখতে যাবে?"

শচীকান্ত কহিল, "নিশ্চয়, চল্ না।"

মণীশ ফিরিল কিন্তু এবার সে একটা খোঁচা না দিয়া পারিল না, হাসিয়া কহিল, "আরঙ্গজেবের ভাগ্যটা ভাল, বিশ্বনাথের চেয়ে!"

শচীকান্ত কহিল, "আরঙ্গজেব যে নিশ্চিত ছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্চে, বিশ্বনাথ যে আছেন তার কোন প্রমাণ নেই। অনিশ্চিত বস্তুর দাসত্ব করা আমার পোষায় না।"

বেলা হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের ভোগ-রাগ শেষে দেবসেবকগণ বিশ্রামার্থে যথাস্থানে যাইতেছে। পথে জনসংখ্যা হ্রস্ব। শেষ শীতের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য সহস্র কনকরশ্মি পশ্চিমাঞ্চলের প্রস্তর প্রাসাদ ও রাজবর্ত্মের উপর অজস্র ধারে বর্ষণ করিতেছে, যাজন শেষে নৈবেদ্যের ফলমূলাদি উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া পুরোহিত ঠাকুর নিরুদ্যম চরণে গৃহে ফিরিতেছেন, কিয়দ্দূর আসিয়া স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শচীকান্ত কহিল, "মণি তুমি চটেচ,—না? ভাব্‌চ বেল্লিকটা জাহান্নমে গেছে।"

"যাক্ ও কথা আর কেন?" মণীশ একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বেগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। শচী তাহার অনুসরণ করিয়া কহিল, "রাগ করো না ভাই! তোমাকে কষ্ট দিতে আমি ইচ্ছা করি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতকগুলো অসঙ্গত সৃষ্টিছাড়া বিশ্বাস নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনার চেষ্টা করায় লাভ কি? ঈশ্বর ঈশ্বর বলে চেঁচামেচি করায় কারুকে কি সুবিধা পেতে দেখেচ? তা যখন হয় না, চিরদিন কঠোর সাধনাতেও যখন ঈশ্বরের দয়া বা সাহায্য পেয়ে শ্রম সফল করতে দেখিনে, তখন কি হবে সে রকম অক্ষম শক্তির সাধনায়? থাকতে হয় তিনি তাঁর নিজের ঘরে আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকুন, আমার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?

মানুষের পক্ষে তার ইপ্সিত পথে নিজের শক্তি ও ইচ্ছানুসারে নিজের জীবন গড়ে নেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। আমার মতে দেবতা ও মানুষের কঠোর শাসনশৃঙ্খলে হাত পা বেঁধে তাকে চেপে না রেখে তার নিজ শক্তির উপর নির্ভর করতে দিলে মানুষ এখন যা'আছে তার চেয়ে শতগুণে বড় হবার অবসর পায়, তাকে তাই করতে দাও। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী-গ্রহটুকু তার চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। এর চেয়ে বড় বড় লোকে যাবার তার কিছুমাত্র দরকার নেই। তারা যেখানে আছে, সেইখানেই থাক।"

কথাটা বলিয়া নিতান্ত কৃপালুভাবে বন্ধুর অকস্মাৎ উত্তেজনারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে মৃদু হাসিল। সে হাসি তার বন্ধুর শরীরের স্ফীত শিরাসমূহের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুৎ বহন করিল। তীব্র কণ্ঠে সে কহিল, "ঈশ্বরকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্বকে জাগাতে চাও,—জানো, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব কোন্ শক্তির অংশ? তুমি যে মত প্রকাশ করলে তার নাম স্বেচ্ছাচার,—তার পরিণাম উন্নতি নয়, ধ্বংস!"

শচীকান্ত হাসিয়া কহিল, "কিসে? পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন আকাশ যেমন শূন্য, তার অধীশ্বরও তেমনি শূন্যমাত্র আর এই মত পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ লোকেই গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি, তারা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, না ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করচে?"

মণীশের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কে বল্‌তে পারে, তাদের এই বৃদ্ধি জোয়ারের জলের মত মুহূর্ত্তের স্ফীতিমাত্র নয়? আমার কাছে যা'বল, যা'কর শচা! তোমার বাবা এই সব কথা শুনলে কি রকম দুঃখিত হবেন সেটা মনে রেখো। তিনি ভগবানকে নিত্য প্রত্যক্ষ করেন, আর তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁর সর্ব্ব-প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানকে এমন করে অগ্রাহ্য করতে সাহস কর!"

"তাঁর কাছে আমি কখনও এ সব কথা বলি, দেখেচ? তুমি অবশ্য তাঁকে বলতে যাচ্চ না? ব্যস্ তা হলেই চুকে গেল, তিনি জানবেন কি করে?"

মণীশ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "একজন বিদ্বান লোক ভিতরে ও বাহিরে দু'রকম মত পোষণ করতে পারে, আমি ভাবতেও পারিনে!"

শচী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, "তবে না হয় মনে কর, ঈশ্বর আমায় যেমন গড়েচেন, আমি সেই মতই হয়েচি।"

মণীশ ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া সবেগে কহিল, "তুমি ত ঈশ্বরের অস্তিত্বই মান্‌চ না।"

"ধরে নাও,—মান্‌চি।"

"তবু তাঁর দোষ দিতে পার না। ঈশ্বর ত কর্ম্মফলদাতা, কর্ম্ম নিজেরই কৃত,—সেই তোমার বুদ্ধি বিকৃতির নিমিত্ত কারণ।"

শচীকান্ত মণীশের দিকে বিদ্রূপ হাস্যের সহিত চাহিয়া কহিল, "তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে মণীশ। তুই একেবারে শঙ্করাচার্য্য হয়ে উঠ্‌লি।"

মণীশ ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া চুপ করিল।

বেলা অনেক হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজা শেষে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রশান্ত বক্ষে রজত সর্পের ন্যায় শুভ্র উপবীতগুচ্ছ মহাদেবের বক্ষে ফণিভূষণের ন্যায় ভূষিত রহিয়াছে। কৌষেয় বস্ত্র তখনও ছাড়া হয় নাই, ললাট ব্যাপিয়া চন্দনতিলক বিদ্যমান। শচীকান্ত প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীশ প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণ করিল। উমাকান্ত সস্নেহে পুত্রের পারিপাট্যযুক্ত কেশের উপর হাত রাখিয়া করুণাপূর্ণ হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় ত বেশ ভালই দেখাচ্চে।"

শচীকান্ত পিতার মুখে চকিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বিস্মিত হইল। এই বয়সে দেহ এতটুকু নত হয় নাই। শান্ত সহাস্যমুখ! সবিস্ময়ে উত্তর করিল, "ভালই আছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মণীশের দিকে চাহিলেন, "বেড়াতে গিয়েছিলে? মন্দিরে গিয়েছিলে দেখছি যে—" বলিতে বলিতে পুত্রের ললাটের প্রতিও নেত্রপাত করিলেন। মন্দিরের নাম উঠায় শচীকান্ত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার্থে সে একটা উপায় অবলম্বন করিল; কহিল, "মা এখন কেমন আছেন?" বলিতে বলিতে গঙ্গামণির ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মণীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুসরণ করিল।

চৌদ্দ

রোগীর অবস্থা ভাল হইল না। বাড়ীর লোকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মণীশ ও ভক্তিনাথই রোগীর সেবা বেশীর ভাগ করত। শচীকান্ত যেটুকু পারে পরাঙ্মুখ হয় না। একদিন শচীকান্ত ত্রিতলের ছাদে আসিল। চারিদিকে সমুচ্চ মন্দির-চূড়াসমূহ অস্তমান সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছে। পার্শ্বে মন্দিরের উদ্যানে বিবিধ বর্ণের গোলাপ ফুটিয়া আছে। ঝুমকা লতা কুঞ্জের গেরুয়াধারী দণ্ডী পদ্মাসনে বসিয়া জপ করিতেছে। একপ্রান্তে মণীশ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছে। সে হাসিয়া উঠিল। মণীশ পুস্তক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, "কি ?"

"সুবোধ বালকের মতন এক মনে পড়ে যাচ্চ যে ? ওহে, অত পড়ো না,—মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

"তুমি পড়া ছেড়ে খুব সুখে আছ ত ?"

"তা—নেইই বা বলি কি করে ? অবশ্য বড় বড় বিষয় নিয়ে নাড়া চাড়া করায় একটা আনন্দও যে পাওয়া না যায়, তা নয়, কিন্তু আমার মতে ভবিষ্যতে তা থেকে কি উপকার হবে, তা ভেবে জীবন উৎসর্গ না করে বর্ত্তমানটাকে ভাল করে উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমিও যেমন ! কে কার জন্যে কি করতে পারে ? এই ত কত বড় বড় জাতির অভ্যুদয় হলো—কত জাঁক, কত জমক আজ আর তাদের নাম গন্ধও নেই। যে কদিন আছি, সুখে থাকি, তার পর মরে যাব,—ব্যস্ সব শেষ !"

মণীশ কহিল, "প্রজাপতির মত ?"

"হ্যাঁ,—প্রজাপতির মত। কিন্তু তাও ঠিক নয়, তারাও ঠিক সুখী হতে জানে না, উমেদারী করতেই তাদের দিন কেটে যায়। তবে ও রকম ফিলজফির বই কোলে করে নির্জ্জন ছাদের উপর তাদের জীবনের সুখের দিনগুলা তারা অপব্যয় করে না—তোমার মত মানুষের চেয়ে তারা ঢের সেয়ানা।"

মণীশ বই মুড়িয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি

কি-বা জানি—একটু উল্টেপাল্টে দেখি আর সুদূর অতীতের মহাজ্ঞানীদের অগাধ জ্ঞান অনুভব করে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কত বিশদ করে, কত বড় করে সেই অতীত যুগে তাঁরা ঘোষণা করে গেছেন, এখনও জগতের আর কেউ তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে পারলে না! শুধু নীচের সিঁড়িটা পেরিয়ে উঠ্‌চে মাত্র। আর এই সব থেকে যখন মনকে সংসারে ফিরিয়ে আনি তখন সেখান্‌কার কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকি। কি চমৎকার বন্দোবস্ত! গোড়া থেকে আইনে বাঁধা নিয়মের উপর এত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ডটা চলেচে, কোথাও কোন বে-বন্দোবস্ত নেই। এমন কি, এব একটা ধূলিকণার স্থান পরিবর্ত্তনেরও যেন নির্দ্দিষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে, দেখতে পাই। এই বিরাট কাণ্ড যাঁর চোখের ইঙ্গিতে সম্পন্ন হচ্চে তাঁর কথা কি না ভেবে থাকা যায় শচী? তাঁর পায়ের তলায় মাথা যে আপনি নত হয়ে আসে।" এই বলিয়া মণীশ ভূমিতে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিল।

শচীকান্ত মুখ টিপিয়া হাসিল, করুণার সহিত কহিল, "যাক্, ও সব কথা! আমি কুন্দমালাকে একদিন দেখে এসেছি।" বলিয়া সে নিস্তব্ধ মণীশের মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিল, "কি? একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলে না যে?"

মণীশ আলিসার ধারে ঝুঁকিয়া বাগানের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া উদাসীনভাবে উত্তর দিল, "না।"

"কেন, বৈরাগ্য না লজ্জা?"

"একটাও না। আমি বিয়ে করব না।"

"বিলক্ষণ! এ আবার কি সখ্?—এর অর্থ?'

"কিছুই নেই।"

"বিনা কারণে এত বড় একটা কাণ্ড হতে পারে?"

"বিনা কারণে এত বড় বিশ্বটা যদি আকস্মিক আবির্ভূত হতে পারে, তবে এটা এমন কি ব্যাপার যে হতে পারে না?"

শচী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বন্ধুর পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত করিল, কহিল, "আঃ থাম্। না, সত্যি বল্ না—কেন?"

"বল্লাম ত, এর মধ্যে রহস্য কিছুই নাই এতে আর 'কেন?' কি থাকবে?"

শচীকান্ত কহিল, "আছে বই কি। সৃষ্টি-শুদ্ধ লোকে যা করে তুমি তা না করবে কেন? তুমি কি সৃষ্টি ছাড়া?"

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "বোধ হয় তাই। তুমি আজকাল আর পদ্য লেখো না?"

"লিখি বই কি। ঐটেই হল'গে আমার জীবনের খোরাক। 'বাসন্তী' আর 'ক্ষণিকের দেখা' বলে দুটো বই শীঘ্রই বার করব যে।"

মণীশ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সে বাতাসে ভাসিয়া আসা সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধটুকু নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জপ-পরায়ণ বন্ধুটির প্রতি সভক্তি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া মৃদুভাবে কহিল, "ক্ষণিকে'র সে দেখা এখনও তুমি ভোলনি, তা হলে?"

শচী হাসিয়া কহিল, "কই আর ভুলতে পারলুম! ওর প্রথম কবিতাটা শুনবি?—

ভয় নাই, ভুলিব না। তুই কি রে ভুলিবার?
ও মুরতি সাবধানে, রাখিয়াছি মনে প্রাণে,
তুইরে এ মরু-বক্ষে সুশীতল জলধার।
এ জন্মে বা জন্মান্তরে, তুই কি রে ভুলিবার?"

পনর

অবশেষে একদিন প্রতীক্ষিত ক্ষণ আসিল। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গঙ্গাতীরে পুণ্যবতী পত্নী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া চোখ মুদিলেন। দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ঋষিতুল্য স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "দেবতা জানি না, ধর্ম্ম জানি না, শুধু তোমায় জানি। ও পদসেবার অধিকার যেন আমায় হারাতে না হয়, আশীর্ব্বাদ করো—কত দোষ-অপরাধ করেছি, ভুলে যেয়ো।" অবিচলিত সাধক ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "সতীলোক প্রাপ্ত হও।"

শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ করিয়া ভক্তিনাথ সপরিবারে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। শিবনারায়ণ সপরিবারে কিছুদিন কাশীবাসের ইচ্ছায় তথায় রহিলেন। সকলেই বুঝিল, তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। একথা সকলেই জানিত। গৃহীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শেষ হইয়াছে,—বানপ্রস্থের সুযোগ উপস্থিত।

সে দিন শেষ শীতের সায়াহ্ন অতি শীঘ্রই রাত্রির অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে জ্যোৎস্নার বিকাশ রুগ্ন মুখে মৃদু-হাসির মতই ম্লান দেখাইতেছিল। বাড়ীর ছাদের আলিসা ও চিলের ছাদের ছায়াগুলা দীর্ঘ হইয়া অন্ধকার রাজপথে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় রামনগরের কেল্লা দেখিয়া মণীশ সত্য ও করুণাময়ী অসি-ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

পুরাতন স্থানের অন্য কি মাহাত্ম্য আছে, বলা যায় না, কিন্তু মনটাকে যে একটা ক্লান্ত অবসাদে নিক্ষেপ করে, বেশ বুঝা যায়। মণীশের খুড়িমা ব্যাসদেবের কলহের কথা ভাবিতেছিলেন, মণীশ ভাবিতেছিল, মহারাজ চেৎসিংহের কথা। শিবালয়-ঘাটের উপরকার যে বুরুজ হইতে তিনি গঙ্গার গর্ভে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, অদূরে দেখা যাইতেছিল—পরপারে নিবিড় অন্ধকার বনানীর মধ্যে রাজপ্রাসাদের অস্পষ্ট দীপমালা।

ক্ষীণ কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "মানুষ কি? পথ ছাড় ত বাবা,—চোখে দেখতে পাচ্চিনে, এ মেয়ে গেল কোথায়?"

তিনজনে একধারে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। করুণাময়ী দেখিলেন, বৃদ্ধা দৃষ্টিহীনা, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া অতি কষ্টে পথ চলিতেছেন! ব্যথিত চিত্তে নিকটে গিয়া কহিলেন, "এই অন্ধকারে একা কেন বেরিয়েছ, মা? কোথায় যাবে।

বৃদ্ধা কহিলেন, "আর মা! যম যাকে ভুলে বসে থাকে, তার কি যাবার জায়গা আছে। ঘাটের দিকেই এগিয়ে দেখি মেয়েটা কেন এত দেরী কচ্ছে। হা মা গঙ্গা! তোর গর্ভেও কি একটু জায়গা নেই, মা?"

মানুষের মনে গভীর যন্ত্রণা না থাকিলে এত বড় আত্মধিক্কার শুধু বয়সের অসহিষ্ণুতায় ঘটে না। করুণাময়ীর মনে এই অসহায়ার জন্য করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল। কহিলেন, "দাঁড়াও বাছা! আমরা তোমার মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। কি বলে ডাকব?"

বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "ভাল হবে মা! তোমার মনটী বড় ভাল। আর মা, আমার এ দুঃখের শরীরে সব সহ্য হয়, তবে ভয় করে, রাত-ভিত, যদি পড়ে মরি, নিজেও অপঘাতে যাবো, আর মেয়েটা—মরুকগে, কপালে যার যা আছে, কেউ তা খণ্ডাতে পারে না। হ্যাঁ—ওর নাম কমলা।"

"এই যে আমি এসেচি। আঃ, তুমি আবার অন্ধকারে কেন বেরিয়েছ ঠাকুমা?" পিছন হইতে সুমিষ্ট কণ্ঠে কে এই কথাগুলি বলিল। করুণাময়ী দেখিলেন ভিজা কাপড়পরা একটি মেয়ে প্রকাণ্ড একটা কলসী কাঁখে বহিয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছে। মেঘ-সরা চাঁদের ক্ষণ জ্যোতিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। চাঁদের আলো যেন তার গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

বৃদ্ধার মনে অন্তর্বেদনা প্রকাণ্ড প্রস্তরের মতই ভার হইয়া রহিয়াছিল। একটু সহানুভূতি পাইতেই পাথরখানা সরাইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে তাঁহার এতটুকু দ্বিধা রহিল না। সামান্য পথটুকু চলিবার সময় আপনার সমুদায় ইতিবৃত্ত তিনি এই অপরিচিতা সহানুভূতিকারিণীর নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন।

প্রবীণা কহিলেন, "মা এ পোড়ার মুখে কি আর সে সব কথা আসে,—

সে যেন আগের জন্মের কথা,—সব স্বপন হয়ে গেছে! রাক্ষসী একে একে সবাইকে পেটে পুরে বসে আছি—মরণও ত বিধাতা লেখেনি। এখন আরও যে কি বাকি আছে, তাই ভয়। তা' ভয়ের আর আছেই বা কি, শুধু ঐ একরত্তি মেয়েটা! তা দেখ বাছা, আমি আর যমকে ডর ইনে, সে আমার ঘরের লোক হয়ে উঠেচে—ভয় করে মানুষকে। মানুষের ভয়েই মারা গেলুম। সাপকে ভয় করিনে, দেখ না এই আঁধার রাতে ছেড়ে দিয়েচি। তবু দিনের আলোয় ঘাটে-পথে বেরুতে দিইনে। ঠাকুর, ছাই-পোরা কপাল গড়েচে, ছাই-মাখা রূপ যে কেন গড়েনি তাইত ভাবি। এ কোন্ বিচার?"

গৃহস্থগৃহ হইতে দীপালোক রাস্তার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বালিকার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া করুণাময়ী চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। বিস্ময় প্রশংসায় তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত ও সেই মুখখানির উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। এমন রূপের ডালি মেয়ে, ইহাকে লইয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে?

বৃদ্ধার গৃহ অসিঘাট হইতে দূরে নয়। খোলার চালের মেটে বাড়ী, কুলুঙ্গিতে কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল; কিন্তু আলোক অপেক্ষা ধূমই সে অধিক উদ্গীরণ করিতেছে। জেওল গাছের মধ্যে বিনিদ্র কপিশাবকের বিবাদ কোলাহল থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল।

দাওয়ায় কলসী নামাইয়া মেয়েটি ক্ষিপ্র হস্তে পিতামহীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে অনতি-উচ্চ দাওয়ার উপর টানিয়া তুলিল। করুণাময়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া স্থান-নিরূপণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে আর কেউ নেই?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "কে থাকবে মা? ঠাকুর-পুত্তুর ছিলেন, তিনিই বড় অসময়ে দুঃখীদের আশ্রয় হয়েছিলেন কি না, তাই সর্ব্বগ্রাসী তাঁকেও আজ সাত মাস হল গ্রাস করে বসে আছি। দেখ মা, আর কিছুর ভয় করিনে,—এ কাশী জায়গা—ঘরে মলেও ক্ষতি নেই, পাড়ার লোককে অনেক করে পায়ে ধরে বলে রেখেছি দুজন বামুন ডেকে হাড় ক'খানা গঙ্গায় দেবে, কিন্তু আমার এই যে মহাকাল দেখছ মা, এই আমার সর্ব্বশরীরের

রক্ত হিম করে দিচ্চে! এস মা, তুমি বড় ভাল,—আজ অনেক দিন পরে তোমার কাছে কথা বলে মনটা যেন হাল্কা বোধ হচ্চে। আমার দুঃখ অস্থিরস্তি বাছা,—এর আর শেষ নেই। হিম-শীত,—যাও মা, ঘরে যাও।"

যতক্ষণ করুণাময়ী দাঁড়াইয়াছিলেন, ততক্ষণই সেই স্তিমিত আলোকে বৃদ্ধার পার্শ্ববর্ত্তিনী স্তব্ধ মূর্ত্তিখানির পানেই তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রশংসা-মিশ্রিত বিস্ময়ে আবদ্ধ ছিল। একটা সকরুণ বেদনা ভিতরে ভিতরে কেবলই তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। এমন মেয়ের এই দশা,—বিধাতার এ কেমন বিধান কে জানে! আহা, রাজার ঘরেও যে এমন রূপ দেখা যায় না! কিন্তু মেয়েটি তাঁর অত্যন্ত করুণায় যেন ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল। সে প্রথমে একটু বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরে বৃদ্ধার হস্ত আকর্ষণ করিয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "এস ঠাকুমা, ঘরে এস, ঠাণ্ডা লাগছে।"

বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

মণীশ সত্য অদূরে দাড়াইয়া ছিল, তিনি কাছে আসিতে তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। সত্য কহিল, "হ্যাঁ মা ওরা বাঙ্গালী না?"

"হ্যাঁ" বলিয়া করুণাময়ী মণীশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখলে বুক ফেটে যাযবে। এমন মেয়ে, পয়সার অভাবে বর জুটচে না। তোমাদের বন্ধু-টন্ধু কেউ নেই রে, মণীশ?"

খুড়িমার আকস্মিক করুণা দেখিয়া মণীশ হাসিল। পৃথিবীময় যে দুঃখ দারিদ্র্য ছড়ানো রহিয়াছে, তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখিয়াই ভাবাবেগে এতখানি ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন? যে অভাব সমাজ-গত, তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা করিলে কতটুকুই বা করা হয়। কহিল, "বন্ধু থাকবে না কেন, তবে বিনি পণে বিয়ে করবার মত বন্ধু ত চোখে পড়ে না। তা ছাড়া খুড়িমা, যার বিয়ে দিচ্চ, সে ব্রাহ্মণ কি অন্য কিছু তার কোন খবর নিয়েছ?"

করুণাময়ী জিভ্ কাটিয়া কহিলেন, "ওরে, না, তা'ত জিজ্ঞেসা করিনি।"

ষোল

খাঁচার পাখী ও আকাশের পাখীতে যতটুকু প্রভেদ গৃহবাসিনী ও তীর্থচারিণী বঙ্গনারীতেও তেমনি পার্থক্য। গৃহে যাঁর চিন্তা ও কার্য্য গৃহধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গৃহের বাহিরে চিরজীবনের সেই ধারাবাহিকতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা চলে না।

কমলার পিতামহীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন প্রত্যুষে তিনি যখন দাসীর সঙ্গে ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন অস্পষ্ট অন্ধকারের জাল ছাড়াইয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসিবার পথ খুঁজিতেছে। পাখীরা তখন সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু চঞ্চলমতি বানরের দল জাগিয়া পথে ও প্রাচীরে বাহির হইয়া কাহার কি ক্ষতি করিয়া দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। এদিকে দেব মন্দিরে ভোরের নহবত ভৈরবী সুর ধরিয়াছে। গঙ্গাতীরে যতি-ব্রহ্মচারীগণের স্নানার্চ্চনা শেষ হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোন মূর্ত্তির উচ্চারিত গম্ভীর 'ব্যোম্‌ব্যোম্‌!' ধ্বনি ভক্তি-বিস্ময়ে শ্রোতাকে উচ্চকিত করিয়া তুলিতেছিল।

করুণাময়ী জলের ধারে দাঁড়াইয়া একবার প্রত্যাশিত নেত্রে চারিধারে দেখিলেন, পরে হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। বৃদ্ধার কাহিনী শুনিয়া অবধি প্রতি প্রত্যুষেই নাতিনীটীর সহিত তাঁহাকে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইবেন এমনই আশা করিয়াছিলেন। জলের উপর দিবসের প্রথম প্রাণ-স্পন্দনের মত তরুণ সূর্য্যের জ্যোতির্বিম্ব ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে তুলসী মন্দিরে ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়া উঠিয়া বহু নিদ্রামগ্নের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিল। তীরের ঢেউগুলি নিদ্রোত্থিত হইয়া মৃদু কাকলীতে বিশ্বেশ্বরের বন্দনাগান কলস্বরে গাহিতে আরম্ভ করিল। আকাশের বিরাট স্তব্ধতার গায়ে আঘাত করিয়া ক্ষণে-ক্ষণে "ব্যোম—ব্যোম" ধ্বনি জাগিয়া উঠিল।

স্নান সারিয়া করুণাময়ী জগন্নাথ দর্শনে গিয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট হইতে ফিরবার সময় শুনিতে পাইলেন, "হা জগন্নাথ! কাঙ্গাল দেখে কি তোমারও দোর বন্ধ হ'ল!"

—এ আক্ষেপ কমলার পিতামহীর না? কষ্টে দুঃখে মানুষটা জগৎ ও জগদতীত সবার উপরই বিশ্বাসহীন হইয়া গিয়াছে!

দেখিলেন, রাত্রের সেই বৃদ্ধা ও তাঁর নাতিনী ঘটিতে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি ঠাকুরমার হাত ধরিয়াছিল, বৃদ্ধা প্রায় দৃষ্টিহীন। করুণাময়ী কহিলেন, "আসুন না, আমরা একটু বসি,—এখনই ত দরজা খোলা হবে?"

কথার সাড়া পাইয়া বৃদ্ধাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, শব্দ লক্ষ্যে মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি আমার কালকের সেই মা, বুঝি! ওমা, তুমি এ হতভাগীকে ভোলনি?"

কৃতজ্ঞতার আনন্দে স্বর তাঁহার জড়াইয়া আসিল। করুণাময়ী নিকটে আসিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা?"

"ব্রাহ্মণ—মা!" করুণাময়ী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া মেয়েটিও নত হইয়া করুণাময়ীর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। করুণাময়ী মুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন,—মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, "রাজরাণী হও।"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এই বল মা, যেন ও আমার নোয়া-সিঁদুর পরে মনের সুখে থাকতে পায়,—আর আমার কিছু চাইবার নেই।"

করুণাময়ী সস্নেহে কমলার সদ্যোস্নানসিক্ত কেশের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা। আমি বলচি, তোমার ভাল হবে মা!"

"মাগো তুই তাই বল্‌ মা, তাই বল্‌।"

বৃদ্ধা কম্পিত হস্তে করুণাময়ীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলাও ঠাকুরমার ক্রন্দনে আর্দ্র চক্ষু নত করিল। করুণাময়ী যে অতখানি জোরের সঙ্গে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণা-মথিত সান্ত্বনাবাক্য মাত্র নহে, যেন তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত মানবাত্মার সুগভীর শক্তিপূত একটি কল্যাণমন্ত্রের মতই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। তাই তাহা শ্রোতাকে এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিল। একই বীণা,—একই বাঁশি,—হাতের গুণে যেমন লোকের

চিত্তে আনন্দ বা বিরক্তির উদ্রেক করে, তেমনই একটি অতি ক্ষুদ্র সুরের বিভিন্নতায় সহসা কোন এক সময় যেন জগতের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া লয়, যাদুমন্ত্র-প্রভাবে মনকে সম্মোহিত করে।

নরসিংহ স্থানে বসিয়া বৃদ্ধা নিজের কাহিনী সেই প্রাণখোলা সহানুভূতির বিনিময়ে নিবেদন করিয়া দিলেন। কহিলেন, "আমাকে আজ তুমি যা দেখছ আমার অবস্থা চিরদিন এ রকম ছিল না। আমার সংসার শ্মশান হয়ে গেছে, প্রাণের মধ্যেও জ্বলে পুড়ে খাক্ হচ্ছে কিন্তু এই সর্ব্বনাশী আমিই স্বামী পুত্র নিয়ে সর্ব্বসুখী ছিলুম। সংসারের সুখ যে পদ্মপাতার জলের মত বলে আমার কপালই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

স্বরূপপুরের নাম শুনেছ? স্বরূপপুরে আমার শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুরের পূজোর দালানে মায়ের প্রতিমা আসতেন, কালী পূজোর খুব ঘটা হতো। সে সব এখন স্বপ্ন! দেখ বাছা। দুঃখ সহ্য হয়, কিন্তু দুঃখের মধ্যে সেই সব সুখের কথাই যেন আরও অসহ্য। ভগবান দুঃখ দিলেন, দিলেন— চিরকালই কেন এম্‌নি দুঃখী করে জন্ম দিলেন না। এই ত চার ধারে দেখি কত কত অনাথ আতুর হাসচে কাঁদচে, আমিও না হয় ওদেরি সঙ্গে ঐ রকম করে মিশে যেতুম, বুকে ত এমন শেল বিঁধে থাকত না, লজ্জায় ঘেন্নায় মাটি করত না, তা হলে ত 'রাধে-কৃষ্ণ' বলে দু'দোরে দু'মুঠো মেগে এনেও দিন গুজরান করতে পারতুম। বলছিলুম আমার শ্বশুর বাড়ীর কথা—শ্বশুর দেশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এখন যেমন লোকে এক কথায় আদালত ঘর করে, ঠাকুরের আমলে তা ছিল না। নালিশ-ফরেদ, সব তাঁর কাছে। তিনি পাঁচজন ভদ্র লোক ডেকে যা বিচার করে দিতেন, জজের হুকুমের মত দু'পক্ষ শিরোধার্য্যি করে নিত।

"সত্তর বিঘে জমী নিয়ে বাগান বাগচে, হেন বস্তু নেই যা জন্মায় না। মর্ত্তমান কলা আম কাঁঠাল ইস্তক যত তরি তরকারি একটা পয়সা খরচ করে পাড়া পড়সীতে খায়নি। বড় বড় ধানের মরাই, সম্বচ্ছরের আখের গুড় মটকি ভরে ওলোপ দিয়ে রাখা হত। কত আর বলব মা, তেঁতুল কাটা, হলুদ সেদ্ধ, নারকেল বাছা, ডাল পাছড়ানো—বউ-ঝি কারুর এক নিমেষ অবসর ছিল না। এমন সময় গেছে এক পিঠ রুয়ে এক পিঠ

ভূঁয়ে—দিনি রাত কোথা দিয়ে যে কেটে গেছে, কাজে কর্ম্মে পাঁচটা সমবয়সীতে মিলে হাসতে খেলতে টেরও পাইনি।

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। মন তাঁর বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া সুদূর অতীতে পুরাতন স্মৃতিগুলির ধ্বংসাবশেষে উপনীত হইয়াছিলেন। করুণাময়ী কমলার দিকে চাহিলেন, নতনেত্রে সে ঢিল কুড়াইয়া মন্দির চত্বরে আনমনে কি চিত্র করিতেছে। তিনি চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। ঐ যে চম্পক অঙ্গুলি প্রস্তর খণ্ডে রেখা টানিতেছে, উহার উল্টা পিঠে বিধাতা কি অমনই অর্থহীন রেখা টানিয়া দিয়াছেন? চন্দ্রার্দ্ধবৎ ললাটটুকু অত সুন্দর, ভিতরে না জানি, কি লিখনই বিধাতা পুরুষের অবিচল হস্তে লিখিত রহিয়াছে! হাত কি কাঁপে নাই?

কমলার মুখে অপ্রসন্নতাব ছায়া পড়িয়াছিল। যাহার তাহার নিকট অতীত কথা প্রকাশ করিয়া গোটাকয়েক 'আহা' শুনিবার কি এমন প্রয়োজন আছে? ঠাকুরমার এই কাজটি তার কাছে বিসদৃশ ঠেকে।

সহসা কি একটা শব্দে বৃদ্ধা সহসা চকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এই দেখ—সব ভুলে গেছলুম! তারপর, হাঁা, স্বামী আমার খুব ভালই ছিলেন, কিন্তু বিষয় বুদ্ধি ছিল না। তাঁর আমলেই ভাঙ্গার পথ সুরু হল। তিনি যখন চলে গেলেন, ছেলের মাথায় রাজ্যের দেনা চাপিয়ে রেখে গেছেন বলে জানতে পারলুম। বিষয় পাঁচ সরিকে ঠকিয়ে খাচ্ছিল, আদায় উসুল নেই, ধারের উপর এত-বড় সংসার চলে এসেছে। তার পর বাছাও আমায় বজ্রের শোক দিয়ে চলে গেল।...স্বামী হারা পুত্তুর-হীনা হয়েও শুধু এই গুঁড়ো দুটি নিয়ে জগতে ছিলুম মা। মনে করেছিলুম, আমার নিখিলের বউ বেটা নিয়ে কমলার বর এনে সকল কষ্ট বিস্মরণ হ'ব। বড় আশা করে দুটিকে নিয়ে সর্ব্বস্ব বেচে কিনে কলকাতায় এলুম। পাশ করে দু বছর ডাক্তারি করে অভাগিনীকে আশার স্বগ্যে তুলে অন্ধকূপে আছড়ে ফেলে পাঁচ দিনের রোগে সোণার গোপাল আমার চলে গেলেন, ও কাঁনে সব ফুরিয়ে গেল।"

এর সঙ্গে

বৃদ্ধা এবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"ওরে, এত দুঃখেরল, তারপরে না রে! এমন কঠিন প্রাণ নিয়েও জন্মে ছিলুম!"

কথা ভাবিতেও

দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে করুণাময়ীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। তিনি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলার মামার বাড়ীতে কেউ নেই ?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "মেয়ের বরাত সকল দিকেই টনটনে। এক মামা আছে, কিন্তু কোথায় আছে, তাজানিনে, কখন খোঁজও করে না।"

"মামার নাম কি মা ?"

"করালী চাটুয্যে, ত্রিবেণীতে বাড়ী ছিল—"

"কমলার মার নাম ?—"

"নারায়ণী।"

করুণাময়ীর সমস্ত শরীবে আনন্দের তড়িৎ বহিয়া গেল। বিস্মিতা কমলাকে কোলের কাছে টানিয়া লহয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"সইযেব মেয়ে! নারায়ণী আমার সই ছিলেন,—আমারও বাপের বাড়ী ত্রিবেণীতে।"

এই অভাবনীয় সাক্ষাতের হর্ষ-বিষাদের প্রথম উচ্ছ্বাস থামিলে করুণাময়ী কমলার হাত ধবিয়া কহিলেন, "আর ত তোমাকে ছেড়ে দেবো না, মা। আর মাগো! তোমাকেও এবার মেয়েব বাড়ী যেতে হচ্চে।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "তুমি ওকে নিয়ে যাও,—আমি—"

"তাও কি হয় ?" বলিযা করুণামযী বৃদ্ধার হাত ধরিলেন। "কাশী স্থান বলে আপনি দ্বিধা করচেন ? আপনাব লোকের কাছে কাশীতে দোষ নেই। কেন মা কমল! তুমি অত কুণ্ঠিত হচ্চ কেন ? আমি যে আজ থেকে তোমার মা হলুম, আমার কাছে যাবে না, মা ?" এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছুক-ভাবে-দণ্ডায়মানা কমলাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন।

হায়, মা! কি মধুর এই মা নাম! অভাগিনী কমলা ত মাকে কখনও দেখে নাই। সে এই মাতৃহৃদয়ের উত্তপ্ত স্নেহধারা হইতে কেমন করিয়া তার স্নেহ-বুভুক্ষিত শুষ্ক চিত্তকে বঞ্চিত রাখিবে ? এই আদর-মাখা হাতখানির স্পর্শ হইতে কি নিজেকে দূরে সরাইয়া লওয়া যায় ? মরুভূমির বিশাল শীতল নির্ঝর পিপাসিত কণ্ঠ আর্দ্র করিতে সাগ্রহে উছলিয়া উঠিয়াছে ঠেলিয়া দিতে পারে না। দারিদ্র্যের গর্ব্ব দূরে সরাইয়া স্নেহার্থী রবে বাহিরে আসিয়া সেই স্নেহময়ীর মাতৃ-অঙ্কে ঝাঁপাইয়া

মণ্ড করে গুড় মটকি কাটা, হলুদ সে নিমেষ অবসর ছি

পড়িতে চাহিল। কোনমতে কহিল, "মা! আমি যাব।" বলিতে বলিতে নত নেত্র হইতে বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর অনুকূল মেঘ দেখা দিয়েছে।

সতের

দিন ভালই কাটিতেছে, তার মধ্যে মণীশের দিনগুলি সব চেয়ে সুখের। উপাখ্যানবর্ণিত কাল্পনিক নরনারীদের হর্ষ-বেদনা-বিজড়িত সুখ দুঃখ আশা নিরাশার লহরে আত্মনিমজ্জন না করিয়া সে অতীত বর্ত্তমানে তুল্য বরণীয় মহাতীর্থে মনীষীগণের প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্র অনুশীলনে সচেষ্ট হইয়াছে। যেখানে যে ত্যাগ মূলক ইতিহাস মিলিতেছে, খাতায় টুকিয়া লইয়া সেটিকে বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছে। উমাকান্ত বলিয়াছেন, আমাদেব দেশে এখন লোকের মনকে কর্ম্মের দিকে এবং ত্যাগের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। জগতের সমুদয় প্রাপ্তি শুধু এই দুইটি উপায়ে লভ্য। দেশের জন্য কর্ম্ম এবং দেশবাসীর জন্য ত্যাগ।

মণীশ ক্ষত্রিয়-বীর চৈৎ হইতে পরমহংসরাজ ভাস্করানন্দ স্বামী, তাঁর গুরু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্র মহাশয় ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিল।

উমাকান্ত কহিলেন, "মণীশ! তুমি এবার সংসার-আশ্রম গ্রহণ কর, তোমার খুড়িমা ব্যস্ত হয়েছেন।"

কারাদণ্ডের আদেশ যেরূপ কঠোর শুনায়, এই শব্দটাও মণীশের কানে তেমনি কঠোর শুনাইল। তার মনের তারে যে সুর বাজিতেছে, এর সঙ্গে তার আদৌ মিল নাই। বইগুলি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, তারপরে একখানি গ্রন্থ লইয়া ছাদে চলিয়া গেল, এসম্বন্ধে কোন কথা ভাবিতেও

পারিল না। অস্তগামী সূর্য্য ম্লান হইয়া গেল, রুক্ষ হাওয়া শীতল হইয়া আসিল এবং অস্ফুট নক্ষত্রালোকে জগৎ ভরিয়া উঠিল। সে বই বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। তার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া একটি তীব্র অস্বীকার জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে নীরবেই নিজের অন্তস্তলে নিবদ্ধ রাখিয়া মনে মনে স্বীকার করিল, "আমার পক্ষে যা ভাল, আমার চাইতে যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরাই নির্দ্ধারিত করে দিন।'

পূজাহ্নিক সারিয়া সত্যর পড়া দেখা হইয়া গেলে খাতা পত্র লইয়া উমাকান্তর ঘরে গিয়া দেখিল, শিবনারায়ণ এবং আরও দুই চারিটি ভদ্রলোক সেখানে রহিয়াছেন। সে এক পাশে বসিল। উমাকান্ত তখন কহিতেছিলেন,—"বেদ-কাণ্ড ত্রয়াত্মক,—কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ দেখাবার জন্য কর্ম্মকে আদিতে উপাসনা মধ্যে ও পরে জ্ঞানের স্থান ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ নির্দ্দেশ করেছেন। বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডে কর্ম্মের স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'কর্ম্ম' শব্দের সাধারণ পরিচিত রূপের সঙ্গে তার পর্য্যায় এক হতে পারে না কর্ম্মকাণ্ড বা কর্ম্ম যোগই জ্ঞানমার্গে উত্থিত হবার সোপান। সোপান ত্যাগ করে যেমন উচ্চে আরোহণ করা সম্ভব নয় কর্ম্মযোগ ব্যতীত তেমনি জ্ঞানযোগ প্রাপ্তি অসম্ভব। কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে গৃহস্থাশ্রমে প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ অভ্যাস করতে যত্নবান হতে হবে।"

মণীশ কথাগুলি মন দিয়া শুনিল তার তরুণ জীবনে যে একটি নূতন হিল্লোল আসিয়া তার অস্ফুট চেতনাকে আন্দোলিত করিতেছিল, আজিকার এই বাণী তার মধ্যে একটি স্পন্দন না তুলিয়া মিলাইয়া গেল না। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান,—জ্ঞান, উপাসনা, কর্ম্ম,—এই ধ্বনি ওতঃপ্রোতভাবে গমকে গমকে তার বক্ষ-শোণিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতে লাগিল।

বাহিরের লোকেরা বিদায় লইলে উমাকান্ত কহিলেন, "এস মণীশ, আজ একবার দুর্গা দর্শন করে আসা যাক্। মাতৃ দর্শনের জন্য মন শিশুর মতই উৎসুক হয়েছে।" এমন সময় কমলার পিতামহীকে লইয়া করুণাময়ী প্রবেশ হইলেন! উমাকান্ত প্রণতা নারী দু' জনকে আশীর্ব্বাদ করিতেই তিনি কহিলেন,—"ইনি আমার সইমা হন।" বলিয়া বৃদ্ধার কাহিনী সংক্ষেপে

কহিয়া গেলেন। বৃদ্ধা কাঁদিয়া কহিলেন, "বাবাগো, বড় কষ্ট পেয়েছি বাবা, এখন তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন মেয়েটিকে একটি ভাল পাত্তরের হাতে দিয়ে আমি শীগ্‌গির মরতে পারি। শিব আমি হব না, জানি,—সাত জন্মের মহা-পাতকী আমি,—রাস্তা-ঘাটে একটা নোড়ানুড়ি হয়ে পড়ে থাকি—সেও আমার ভাল বল, যেন মনিষ্যি-জন্ম আর না পাই।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় নত হইয়া বৃদ্ধার মস্তক স্পর্শ করিয়া সুগভীর সহানুভূতির সহিত কহিলেন—"আহা, মা! বড় কষ্ট পেয়েছ! ভয় কি মা? বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হয়েছ দেহান্তে শিবলোকই তো পাবে। জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত ভোগই যে কেটে যাচ্ছে, মা!"

এমন সান্ত্বনা বুঝি জগতে দ্বিতীয় নাই! কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া কি যেন একটা গভীর ভাবাবেশে সংসার-তাপদগ্ধা বৃদ্ধার দুই জ্যোতিঃ-হীন চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পাগলের মত দুই হাতে তাঁহার পদধূলি লইতে লইতে ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাই বল বাবা তাই বল।"

উমাকান্ত পুনশ্চ তাঁহার মাথায় পিঠে সান্ত্বনা হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "ভাল হবে মা! দয়াময়কে ডাক, তিনি তোমার সকল দুঃখ মোচন করবেন।—একটী মেয়ে আছে?"

"না, বাবা! একটি নাতনি আছে। মণীশ, তুই একবার সরে যা'ত।—এস মা, তুমি এস।"—করুণাময়ীর আহ্বানে দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী কমলা আসিয়া প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরে অপর দুইজনকে প্রণাম করিয়া নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উমাকান্ত তাহার সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে করুণাময়ীর প্রতি চাহিলেন—কহিলেন, "দুর্গা-প্রতিমা! মন্দির থেকে তুলে এনেছ না কি মা? আমি যে এখনই মাকে দেখতে যাচ্ছিলাম। এমন লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত মেয়ে ত দেখা যায় না।" গাঢ় রক্তবর্ণে কমলার গণ্ড যুগল রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

কমলাকে পাইয়া করুণাময়ী বড় সুখী হইলেন। নিজের পেটের মেয়ে নাই, এত বয়সে এখনও বধূর মুখ দেখা ভাগ্যে ঘটিল না, এই কুড়ানো মেয়েটি যেন তাঁর দুহিতৃস্নেহের সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লইল। নিজের

হাতের বালা দুই গাছি তার সুগোল দুখানি হাতে পরাইয়া দিয়া একখানি ধোয়া কালাপাড় সাড়ি পরিতে দিয়া অতৃপ্ত নেত্রে অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁর মনে একটি সাধ জাগিয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরে কমলার পিতামহীকে লইয়া করুণাময়ী শয়নকক্ষে মাদুর পাতিয়া তাঁর গল্প শুনিতে ছিলেন। বৃদ্ধা নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী বিলাপের মূর্চ্ছনায় গাহিয়া চলিয়াছেন কমলা নিকটে বসিয়া সুপারি কাটিতেছিল। এমন সময় বাহিবে জুতার শব্দ হইতেই বৃদ্ধা তাঁব অনর্গল বকুনি থামাইয়া কহিলেন, "বাবু আসছেন, বুঝি! মা, তুমি যাও, আমাদের নিয়ে সমস্তক্ষণই যে রইলে।"

করুণা কহিলেন, "না, ও সত্য।"

সত্য বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা! কুঁজোয জল নেই।—"

গৃহিণী কহিলেন, "কুঁজোয় বুঝি জল আজ বাখেনি? কমল! যাও ত মা, সতিকে এক গ্লাস জল দাও গে ত।" কমলার বযসী মেযের পক্ষে পরের ঘরকে এত শীঘ্র আপন করিযা লওয়া সহজ নয় বলিযাই তাহার প্রতি আত্মীয়ভাব বেশী করিযা প্রকাশ কবিবার জন্য তিনি এই আদেশটা করিলেন, কিন্তু কমলা তাঁর আদেশ পালন করিতে আসিয়া বিপন্ন হইল। 'সতী' বলিয়া সহসা যার পরিচয করিলেন, তাহাকে বালক,—কিশোর, অথবা তরুণ যুবক, কোন্ আখ্যা দেওয়া যাইবে, তাহাই বুঝিয়া উঠা যায না। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি এমন অকুণ্ঠিত আগ্রহে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল যে, সেই সমালোচক-দৃষ্টির দ্রষ্টব্য হইয়া লম্বা দালানটা পার হওয়া তার পক্ষে দুসাধ্য। বহুদিন হইতেই সে কারা-বাসিনীর মত তাদের ক্ষুদ্র কুটির-গহ্বরে নিজেকে রুদ্ধ রাখিয়াছে, ছোটবেলা হইতে কলিকাতায় মানুষ। সেখানে পল্লীগ্রামের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে মেলা-মেশা ছিল না। তাই সত্যর কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে কমলা সঙ্কুচিত হইল। তার বর্ত্তমান অবস্থা তার উপর একেই লজ্জার কালো চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে,—বিশেষতঃ ঠাকুরমার ভয় ভাবনা তার নিজের প্রতি এমন একটা প্রবল ধিক্কার আনিয়া দিয়াছিল, মনটাকে এমন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়া ছিল, যে এতটুকু সূর্য্যের তাপও যেন সে তার নিজ অঙ্গে সহিতে পারে না।

কিন্তু যাহাকে দেখিয়া কমলা লজ্জিত হইল, সে তার লজ্জা-বিজড়িতভাবে সঙ্কোচ মাত্র বোধ করিল না, প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তোমায় ত আগে দেখিনি!"

কমলা ঈষৎ বিরক্তির সহিত প্রশ্নকারীর দিকে চাহিল, কিন্তু কটিবেষ্টিত অসংযত বস্ত্র ও কুঞ্চিত কেশতলে সম্পূর্ণ সরল মুখ দেখিয়া সে মনে মনে হাসিয়া কহিল, "আমি কমলা।"

বলিয়া তাহার সম্মুখ দিয়া বারান্দা অতিক্রম করিয়া ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল। এই 'কমলা' নামটি দ্বারা যদিও আর কেহ কোন অপরিচিতকে চিনিতে পারিত না, সত্যেন্দ্রর নিকট কিন্তু এর চেয়ে বেশী পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কমলার নিকট হইতে জলের গ্লাস লইয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিল, কহিল, "তুমি ত খুব সুন্দর! গৌরীর চেয়েও বেশী সুন্দর তুমি।"

এতদিন হয়ত গৌরীই তার চোখে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছিল। এতখানি প্রশংসালাভে কমলা বিরক্ত হইবে কি হাসিবে স্থির করিতে না পারিয়া সরমে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

"সতু, এই তোমার শীগ্‌গির ফেরা? কার সঙ্গে গল্প হচ্ছে?"

এই কথা বলিয়া সত্যর দাদা বাহির হইয়া আসিল। সেখানে বসিয়া এতক্ষণ সে অনাবিষ্ট ভাইটীকে অঙ্ক কষাইতেছিল। সত্য তার নূতন বন্ধুটীর সাক্ষাতে ভর্ৎসিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্র স্বরে উত্তর দিল, "যাচ্ছিলুম তো—"

ইতিমধ্যে কমলা ও মণীশ পরস্পরকে দেখিয়া চকিতে দুদিকে সরিয়া গেল। মণীশ ঘরে আসিয়া সত্যকে অঙ্ক দিলে সে সবেগে পেন্সিল চালাইয়া চলিল। নিগূঢ় অভিমানে দাদার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। যেখানে তার চিত্তাকর্ষক কিছু জুটিবে, দাদা যেন বাধা দিতেই তৈরি হইয়া আছে।

মণীশ তার রাগ বুঝিয়া ঈষৎ হাসিল। তার ঘর্ম্মসিক্ত চুলগুলা ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটী কে রে?"

ক্রুদ্ধ সতু দাদার স্পর্শ হইতে মাথাটা এক হ্যাঁচকায় সরাইয়া লইয়া খাতার উপর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল—"ও কমলা?"

জগতে যত কিছু মনশ্চাঞ্চল্যকর পদার্থ আছে, রূপই তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। দর্শনেন্দ্রিয়ই মানুষের সবচেয়ে বড় বালাই। আবার সে যাহা কিছু দেখে চুপ করিয়া তাহাই ধ্যান করে না, মন ও বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া তাহাকে ভাল করিয়া যতক্ষণ বিশ্লেষণ করিতে না পারে, ততক্ষণ দেখার সুখ অপূর্ণ থাকে। এইরূপ সম্যক দর্শনের চেষ্টা না থাকিলে দর্শন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারও অবশ্য চির-অনাবিষ্কৃতই রহিয়া যাইত, ইহাই মানুষের মানুষত্ব ও মহত্ত্ব।

এতখানি সৌন্দর্য্য কিশোরীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অকস্মাৎ সম্মুখস্থ হইতে পারে, এ সম্ভাবনা যেন মণীশের মনে ছিল না। বিদ্যুতের মত আকস্মিক আবির্ভাবে সে মেয়ে যেন তার মত নির্লিপ্তচিত্তকেও কৌতূহলী করিয়াছিল। তাই সে স্বভাব বহির্ভূত ভাবেই পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কমলা? কে কমলা?"

"আমি কি করে জানবো? জানতে তুমি দিলে?" বলিয়া সত্য অঙ্কর খাতার উপর গভীর অভিমানের সহিত অভিনিবেশ করিল।

আঠার

জলে ভাসমান ব্যক্তি যতক্ষণ ঢেউয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলে, ততক্ষণ প্রাণপণে নিজের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত রাখে। যেমনি তরঙ্গের আঘাত তাহাকে তটশায়ী করে, তখনই আপনাকে সে তটমূলে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। করুণাময়ীর করুণ বাহুর আশ্রয়ে কমলাকে বাঁধিয়া দিয়া কমলার পিতামহী এমনই নিশ্চিন্ততা অনুভব করিলেন।

ভারতবর্ষের অবনতি যতই হোক এ দেশীয় লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব উবিয়া যায় নাই, এই দরিদ্র দেশে বুভুক্ষুর সংখ্যা অসংখ্য কিন্তু অন্নদাতার সংখ্যাও সে অনুপাতে একান্তই কম নয়। শুষ্ককণ্ঠ চাতক পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধমুখ পিপাসিতগণ কখনও বারিবিন্দু কখনও জলধারা প্রাপ্তে মধ্যে মধ্যে বর্ষার জয়ধ্বনি না করিয়া পারে না। কমলার পিতামহীও করুণাময়ীর করুণায় তেমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মণীশের খুড়িমা মণীশের বধূ ঘরে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ঘরে তাঁর মেয়ে নাই সে জন্য এত দিনেও কুটুম্বিতার সাধ তিনি মিটাইতে পারেন নাই, পাড়ার লোকের বধূ আসিলে সন্দেশ বাতাসা ঘরে আসে, গ্রহণ করিবার সময় মনটা স্বতঃই চঞ্চল হয়। তিনি যে কতদিনে বউ আনিয়া এদের প্রতিদান দিবেন ভগবান জানেন। মনে তাঁর চিরদিনের সাধ ধনী কন্যা আনিয়া তত্ত্ব-তাবাস সাধ-আহ্লাদ করিয়া তিনি মনের ক্ষোভ মিটাইবেন, কিন্তু যেদিন হইতে কমলা ঘরে আসিয়াছে, মনের গতি বদল হইয়াছে। বিপরীত যুক্তি বলিতেছিল, 'বড় লোকের মেয়ে হয়ত 'দেমাকে' হবে, না হয় ত বাপ পাঠাতে চাইবে না,—তার চেয়ে যদি এমন বধূ ঘরে আসে, তবে তাকে কাছ-ছাড়া করতে হয় না।' কমলা মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী, এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্য-শ্রী হাজারে একটাও চোখে পড়ে না। আবার শুধু রূপই নয় গুণের অংশও তাহাতে যথেষ্ট! কথাটা কিন্তু উত্থাপন করিতে হইল না, স্বয়ং প্রজাপতিই ঘটকের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন, অর্থাৎ সার্ব্বভৌম নিজেই কথা তুলিলেন।

দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের তেজ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছিল। বাতাস অগ্নিশিখার মত লহরে লহরে অনল উদ্গার করিয়া ছুটিতেছে। পথের তপ্ত ধূলি অসহায় পথিকের গায়ে অবিরল ধারে তীক্ষ্ণ তীরের মতই বর্ষিত হয়। কাশীর রাজপথে মধ্যাহ্নে বাহির হইবার উপায় নাই। করুণাময়ীর ঘরের মেজেয় শীতল পাটি পাতিয়া নিজের অঙ্গে হাতপাখার হাওয়া খাইতেছিলেন, গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মণীশ ডাকিল, "খুড়িমা! জেগে আছ?"

"হ্যাঁ।—এস না বাবা,—কেউ ত নেই।" বলিয়া খুড়িমা গায়ে কাপড় টানিয়া দিলেন। মণীশ আসিয়া পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, "তুমি শোও খুড়িমা, আমি তোমায় একটু বাতাস দিই।—ভারী গরম পড়েচে।"

খুড়িমা দেখিলেন, সে কিছু বলিতে আসিয়াছে কিন্তু মুখে লজ্জার আভাস। সস্নেহে কহিলেন, "কিছু বল্‌বি?"

"আমি যেন তোমায় কিছু বলতেই আসি! মণীশের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। খুড়িমা মনে মনে হাসিলেন, কহিলেন, "বেশ ত তুই না হয় কিছু বলতে আসিস্‌নে, আমিই তোকে একটা কথা বলব, ভাবচি।"

"কি?"

"কমলার ঠাকুমার অসুখ শক্ত; বাঁচবার আশা নেই—"

মণীশের মুখ একটু ম্লান হইল। মৃদু স্বরে কহিল, "শুনেচি।"

খুড়িমা তার মুখে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, "মেয়েটি এখন আমাদেরই উপর পড়ল। বড় মেয়ে বেশী দিন ত এমনি রাখা যায় না, তুমি ওর জন্য একটি পাত্র সন্ধান করে দাও, এর পর হিন্দুর ঘরে বিয়ে হওয়াই দায় হবে।"

মণীশ একটু হাসিয়া কহিল, "এখনই দায় হয়েছে? সেই কথাই বলতে এসেছি। আমার একটি বন্ধুর কথা মনে হওয়ায় ক'দিন পূর্ব্বে আমি তাকে সব কথা লিখেছিলাম, তাতে"—মণীশ একটু ইতস্ততঃ করিল পরে আবার কহিল, "তার বাপ লিখেচেন, 'উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে এনে সমাজে ঠ্যালা হতে পারবো না।"

করুণাময়ী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন, "আমি জানি। গ্রামে

ঘরে আজও কেউ অত বড় মেয়ে ঘরে নিতে চাইবে না। তোমাদের কলকাতায় কিন্তু সবই চলে শুনেছি। তাই দেখ।"

মণীশ উঠিয়া গেল। কমলারা এদিকে থাকে বলিয়া সাধ্যমত সে অন্তঃপুরের সীমানায় পা দেয় না। সে যে এই অনাথা মেয়েটির জন্য কিছু করিতে পারিল না, তাহাতে দুঃখিত হইল।

উমাকান্ত মণীশকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে একদিন যে প্রশ্ন করেছিলে, আজ আমি তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মণীশ, চিরকুমার ব্রত বড় কঠিন ব্রত, সংসারে এর চেয়ে অন্য কোন ব্রত এত কঠিন নয়। চির-কৌমার ব্রত পালন করবার যোগ্য নর-নারী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মে। যে কোন ব্রত গ্রহণ করে কায়মনে তা পালন না করলে ব্রতাবলম্বীর প্রত্যবায় ঘটে। মানুষ সব সময় নিজেকেও ঠিক বুঝতে পারে না। আমার মত যদি জান্‌তে চাও তবে আমি বলি বিবাহই তোমার পক্ষে ভাল। তোমায় আমি দুর্ব্বল-চিত্ত বলছি, এমন কথা মনে করো না। কিন্তু যেমন মূর্ত্তি-উপাসনা দ্বারা সাধক উচ্চ অধিকারে প্রবেশ হবার বল সংগ্রহ করে, গৃহধর্ম্ম পালনেও সাধারণতঃ মানব-চিত্ত ধর্ম্ম-সাধনেরই উপযোগী হয়ে ওঠে। তোমার প্রতিপালকদেরও একান্ত আগ্রহ এই দিকেই সে সম্বন্ধেও তোমার করণীয় আছে।"

মণীশ মুখ নত করিয়া রহিল। উমাকান্ত কহিতে লাগিলেন, "বিবাহ-সংস্কার মানব-জীবনের পক্ষে সামান্য নয়। ব্রহ্ম নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করে ভোক্তা ও ভোগ্য—পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সে জন্য জগতের প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত মিলনাত্মক। তাপসংযোগে বিযুক্ত অণু সকল তাপমুক্ত হবামাত্রই তাদের স্বজাতীয় অণুর সঙ্গে সংমিলিত হবার জন্য চেষ্টা করে। শক্তি অভিন্ন বলে একই নিজ অর্দ্ধের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পুনর্ব্বার একাত্ম হ'বার জন্য বিয়োগ-কাল হতেই ব্যাকুল আগ্রহে পথ খোঁজে। যতদিন না সেই মিলন সাধিত হয় এক মানবাত্মার জন্য অপর মানবাত্মারও আকুলতার পরিসমাপ্তি ঘটে না।"

মণীশ নীরবে সচিন্তিত বিস্ময় ভরে শুনিতে লাগিল। ভাবিতেছিল, অধ্যাপক তাহাকে আজ যেন নূতন লোকের এক অভিনব সমাচার প্রদান

করিলেন। তাঁর এই লীলা মধুর কথাগুলি তার বিস্মৃত-যৌবনের উপবনে সহসা বুঝি বসন্ত পবনের হিল্লোল বহাইয়া তুলিল, ব্রহ্মচারীর গৈরিক বসনের উপর স্বর্ণসূত্রে খচিত নীল উত্তরীয়ের প্রান্ত সেই মিঠা বাতাসে ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। নত নেত্রে জগতের এই আদিরসের কথা সে ভাবিতে লাগিল। ‘একটি মানবাত্মা অপর একটি মানবাত্মার জন্য গোপনে পীড়িত হইতেছে! জন্মের পর জন্ম ধরিয়া একটি ব্যথাভরা চিত্ত নিঃশব্দে নিজেরও অজ্ঞাতে অপর একটি বেদনা-কাতর চিত্তের অনুসরণ করিয়া ঋতধ্বজ ও পুণ্ডরীকের ন্যায় ফিরিতেছে। ভাবটুকু বড়ই সরস ঠেকিল। সে ত কোনদিন নরনারীর মিলনকে এতবড় করিয়া দেখে নাই। সত্যই সুন্দর।

অপরাহ্ণে একখানি বই খুলিয়া অভ্যাস মত বসিল। বইখানি কাব্যগ্রন্থ। মনের যৌবননিকুঞ্জ-মধ্যবর্ত্তী অচেনা পাখীটা মৃদু কূজন চেষ্টা করিতেছে তাহারই প্ররোচনায় সে এই বইখানি খুলিয়াছিল বটে তবে এতদিনের সংস্কার তার মনকে এর মধ্যের ললিত কলা-উপাদান যোগান দিতে ঠিক যেন পারিল না। সে অনুভব করিল, সে যেন এ পথের পথিক নয়। তার পথ বিশ্বনীতির সঙ্গে যেন মেলে না, কোথায় বাধা পায়।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে কি ঘটিয়াছে কে জানে! সকলের ধরণ হইতে কোন একটি বিশেষ ঘটনার আভাস পাওয়া যাইতেছিল। খুড়িমা যেন প্রতি দিনকার চেয়ে হাসিমুখ। শিবনারায়ণ কথাচ্ছলে দয়া-ধর্ম্মসম্বন্ধে কত কথাই বলিলেন। শক্তি থাকিতে প্রকৃত দয়াই অবহেলা করিতে নাই, তাহাতে অধর্ম্ম স্পর্শ করে—ইত্যাদি। এ উপদেশের মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত ছিল না? মণীশের মনে মুহূর্ত্তের জন্য একটা সন্দেহের ভার চাপিল। তাঁহারা তার কাছে কি চাহিতেছেন? স্পষ্ট করিয়া বলেন না কেন? না না, এ তার ভুল। বলিবার কিছু থাকিলে ঘুরাইয়া বলিবেন, কেন? আদেশ করিতেই পারিতেন!

কমলা কহিল, “তোমার চিঠি আমাকে দেখালে না?”

পকেট জামার সম্বন্ধ বহুদিন পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেই হেতু প্রদর্শনীটাকে কোঁচার খুঁটে বাঁধিতে হইয়াছিল। সেটা দেখাইবার জন্য এতক্ষণ সে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, কারণ এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটার বিশাল ডাক বন্দোবস্তের ভিতর এই একখানি মাত্র পত্র সে তার এতদিনকার পরিচিত

জগতের মধ্য হইতে আজ প্রথম লাভ করিয়াছে। বিনা আড়ম্বরে পত্রখানি সে কমলার হস্তে প্রদান করিল। পত্রখানি গৌরীর এবং লেখার সৌন্দর্য্যে ও রচনা গৌরবে সেখানি প্রায় অপাঠ্য। মোটামুটি কথাটা ছিল এই যে, তার মেনির দুইটি বাচ্ছা হইয়াছে, একটি কালোয়-শাদায় ছাপওয়ালা, এবং অপরটির রং দুধের মত শাদা। তাহারা কবে আসিবে? সে যেন শীঘ্র ফিরিয়া যায়, নহিলে গৌরী বড় রাগ করিবে, কাঁদিবে, তাহার সঙ্গে আড়ি করিবে। আর তাঁর দাদুমণিকে যেন সে ফিরাইয়া লইয়া যায়, নহিলে ভারী ঝগড়া হইবে ইত্যাদি।

কমলার সহিত সত্যর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। শাসকমণ্ডলী-পরিবৃত বন্ধুহীন দেশে এমন সমব্যথীটিকে পাইয়া সে যেন বর্ত্তিয়া গিয়াছে। মেয়েটির মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধানকারী মৌন গাম্ভীর্য্যের ভাব থাকিলেও আকর্ষণীয় একটি মধুরতারও কিছু মাত্র অভাব ছিল না। তার দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন মৌন বিষন্নতা ঝরিয়া পড়িত, তেমনি অপরাধ ক্ষম সকরুণ হাসিটুকুরও তেমনই প্রাচুর্য্য ছিল।

পত্র পড়িয়া কমলা হাসিয়া কহিল, "গৌরীকে আমার দেখতে ভারী ইচ্ছে করচে, সে যেন তোমার কনের মতন চিঠি লিখেচে।"

কাহারও 'কনে' কাহাকেও চিঠি লেখে কি না এবং সে চিঠি কি ছাঁদে লিখিত হয়, সত্যরই জানা নাই; সে 'কনে' শব্দটার অর্থ ব্যাপকভাবে ধরিয়া ভ্রূশুদ্ধ দু চোখ টানিয়া কহিল, "তুমি বুঝি দাদাকে অমনি করে চিঠি লেখ? তুমি ত দাদার কনে।"

"আঃ সত্য, ছিঃ—" কমলা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সত্য তার লজ্জা পাওয়ার সুযোগে আনন্দিত হইয়া কহিল, "হ্যাঁগো, মা বলেছেন, তুমি দাদার বউ হবে। আমি আজ থেকে তোমায় বৌদিদি বলে ডাকব কিন্তু, অত দেরি করতে পার্ব্বো না।"

কমলা লজ্জারক্ত মুখে পাশের দ্বারটা ঠেলিয়া খুলিয়া এই অবিশ্বাস্য কল্পনাকারীর দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্য দ্রুত পদে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

আকাশে তখন বর্ণের পর বর্ণ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়া নৃত্যপরা

নর্ত্তকীদের লীলা-চঞ্চল বিচিত্র অঞ্চলের সঙ্কুচন প্রসারণের মত শ্বেত, লোহিত, নীল, পীত, একটার পর আর একটা স্তরে স্তরে গাঢ় নীলের উপর সঞ্চালিত হইতেছিল। কোথাও সুদূর উন্নত বৃক্ষশীর্ষ সূর্য্যাস্তের রক্ত আভায় বহ্নিমান মনে হইতেছিল, কোথাও মরকতমণিপ্রভ বক্ত-পাটলে ও বৈদূর্য্য-মণিনিভ নীলাগ্নিজ্বাল দেখিতে দেখিতে বিশুদ্ধ নীলায় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। অলক্ষ্যে মানব-জীবনেও ঠিক এমনি করিযাই বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল কি না, তাহার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল না। অবশ্য দেখা যাইত দিনান্তকালের বিস্ময সঞ্চারিণী প্রকৃতি দুই হস্তে গোধূলিব রাঙ্গা বাতি জ্বালাইয়া সেই যে বাতায়ন তলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিলেন কমলা গিয়া মুখ লুকাইল সেইখানে। কমলা সত্যের প্রদত্ত লজ্জা এবং অতর্কিত সংবাদের সুগভীর বিস্ময়াশ্চর্য্যের ধাক্কা সামলাইতে যে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সে গৃহ মণীশের। দ্বারের শিকল নড়িতেই মণীশ বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল, তাথ একান্ত নির্জ্জন ঘরের মধ্যে কাব্যের কোন এক অপূর্ব্ব প্রতিমা, লজ্জাশ্রীমণ্ডিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। কে ইনি? মণীশ ত এদের ভালরূপে চেনেনা? কোন কাব্যকলার উপবনের নিবাসিনী! তার অজ্ঞাতে অকস্মাৎ তার দুই চোখের দৃষ্টি কোন সময় প্রীতিকোমল হইয়া আসিল, তাহা সে জানিতে পারিল না। এই আশ্চর্য্য সুন্দরী কিশোরী মূর্ত্তির আকস্মিক আবির্ভাব যেন কুমারী উষার প্রথম উদয়ের মতই জীবনে তার আনন্দ-প্রভাতের সূচনা করিয়া দিযাছে, এমনি অনুভব করিয়া সে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিল।

কমলা প্রথমে অপর ব্যক্তির অবস্থিতি জানিতে পারে নাই, যখন সঙ্কোচ-জড়িত মণীশকে দেখিতে পাইল, তখন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কি নির্লজ্জা তাহাকে ইনি মনে করিলেন? সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পালাইতে গিয়া দ্বারে হোঁচট্ লাগিয়া পতনোন্মুখী হইয়া কোনমতে সামলাইয়া লইল!

মণীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, আকণ্ঠ ললাট রঞ্জিত করিয়া কমলা পালাইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া মণীশ দুই পদ অগ্রসর হইয়া কহিল, "আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমিই যাচ্ছি—"

এই বলিয়া সে চাহিয়া দেখিল, নারীমূর্ত্তি কখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কোন জ্ঞানী দার্শনিক সেখানে উপস্থিত থাকিলে হয় ত বলিতেন, ইহা

মায়ার বিকার মাত্র! ছলনাময়ী নারী-মূর্ত্তিতে তরুণ কুমারের তপোবিঘ্ন করিতে অকস্মাৎ সমুদ্ভূতা হইয়াছিল, আসলে উহা অবিদ্যার মিথ্যা বস্তু ব্যতীত নয়। কিন্তু মণীশ এই আবির্ভাবকে আজ নিতান্ত অবহেলা করিতে পারিল না, উমাকান্তেব উপমাবাক্য মনে পড়িয়া গেল। সুন্দর আমাদের অন্তরের জিনিষ, তাই সৌন্দর্য্যই আমাদের চিত্তকে সব-চেয়ে আকর্ষণ করে ও আনন্দ দেয়। যে অন্ধ এই অসীম আকাশের উদার মহিমা, সমুদ্রের বিশাল সৌন্দর্য্য অথবা সতী নারীর সপ্রেম মুখের আনন্দ-বিকাশ দর্শন করে এদের মধ্যে ভগবানের স্থিতি-গৌরব অনুভব করতে পারে না সে হতভাগ্য বৃথাই এই বিবাট বিশ্ব-সাম্রাজ্যের প্রজা হয়েছিল! তার পূজা ব্যর্থ!

আকস্মিক বিভোর বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করিয়া দ্বারের নিকট গিয়া মণীশ একবার বাহিরেব দিকে চাহিল, তারপর ফিরিয়া নিজের পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ স্থিব হইয়া রহিল। চোখ দুইটা ঈষৎ নিমীলিত হইয়া আসিল, বুকের ভিতরটা একটু আলোড়িত হইয়া উঠিল। কেদারার পৃষ্ঠে হেলিয়া পড়িয়া পরস্পর-নিবদ্ধ হাতের উপর মাথা রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। নিস্পাদপ চিত্তবনে অঙ্কুরিত মুকুল হইতে নব বসন্তাগমের তরুণ কিশলয়রাজি উদ্গত হইয়া প্রফুল্ল উপবনের সূচনা করিয়া দিল, পুষ্পলতা ও পাখীর গানে একদিন কি ইহা সৌরভে ও গৌরবে ভরিয়া উঠিবে?

উনিশ

এক একজন মানুষ এমন একটি অখণ্ডনীয় মন্দ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে অন্য মানুষের শত চেষ্টাতেও তার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগানো সম্ভব হয় না, দৈবকে অভিশপ্ত করিয়াই খেদ মিটাইতে হয়। কমলার পিতামহীর অনুরোধে এবং স্বেচ্ছাতেই উমাকান্ত যেদিন কমলাকে মণীশের বধূরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেন, সেদিনের সেই অসহনীয় আনন্দের পর কমলার ঠাকুরমা আর বাঁচিয়া থাকার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিলেন না। কমলা ঔষধ খাওয়াইতে গেলে তার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর কেন দিদি, এবার আমায় যেতে দে। আর ত কোন অভাব রইল না আমার। তবে এই দুঃখ যে সোনার চাঁদকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে একবার সাধ মিটিয়ে দেখতে পেলুম না।"

রোগ বাড়িতে লাগিল। উমাকান্ত নিজেই কবিরাজী চিকিৎসায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁরই আদেশে অপর একজন বিচক্ষণ কবিরাজ আনাইয়া বটিকা পাচন সেবন করানো হইতে লাগিল। কমলা ও করুণাময়ী রাত জাগিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। যত্নের কোন ত্রুটি হইল না।

অষ্টমী তিথি এবং তাহার সহিত কোন্ একটা বিশেষ গ্রহের যোগ হওয়ায় দেবদেবীর মন্দিরে বিশেষ সমারোহ হইবে। ভোরের আলো জাগিতে না জাগিতেই গ্রামের পথ দিয়া অপর্য্যাপ্ত মল্লিকা যূথির আমদানী হইতেছিল। মন্দিরে নহবতের করুণ সুরে সকাল বেলাকার নবীন রৌদ্র যেন ভক্তিভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। করুণাময়ী স্নান, বিশ্বনাথ ও দুর্গা দর্শন করিয়া ফিরিবেন সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছেন। কমলাকে রোগীর ঔষধ পথ্যাদি বুঝাইয়া দিয়াছেন। কমলা বিছানার পাশে বসিয়া তাঁহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

হস্ত স্পর্শে একবার তিনি তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শীর্ণ হাত উঠাইয়া তার কোমল হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিলেন। মুমূর্ষুর এই আকস্মিক আদরে কমলার দুই

চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা কমলা জগতের মধ্যে একমাত্র স্নেহময়ী অভাগিনী ঠাকুমাকেই জানে। শুষ্ক বংশদণ্ড যেমন করিয়া নিজে বক্ষের উপর ক্ষুদ্র মাধবীলতাটিকে ধারণ করিয়া রাখে, ঠাকুরমাও তাহাকে এতদিন অসীম দুঃখের মধ্যে তেমনি করিয়াই বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সে আশ্রয় আজ মৃত্যুর কঠোর হস্ত ছিন্ন করিতে আসিযাছে, বৃথা আশ্বাসে এতদিন ধরিয়া নিজের মনকে সে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল,—আর যে পারে না, আশার স্থলে নিদারুণ হতাশা ক্রমেই জাগিযা উঠিতেছে।

রোগীর রোগ-যন্ত্রণা কম থাকিলেও চোখ-মুখের অবস্থা ভাল দেখাইতেছিল না, সেই মুখের দিকে চাহিয়া কমলা নিজ মনের ব্যাকুলতা কোন মতে চাপিয়া রাখিল।

জানালা খোলা। আকাশের বিশাল ললাটে উজ্জ্বল সোণার টীপের মত জ্বলন্ত সূর্য্য দেখা দিয়াছেন, গৃহমধ্যেও প্রভাতের আলো সোণালি চাদরের মত ছড়াইয়া পড়িযাছে। রাস্তার ওধারে বৃহৎ একটা ছাতিম ফুলের গাছ। ফুলের গন্ধ সকালের বাতাসের সঙ্গে হাসাগাসি মাতামাতি করিয়া ফিরিতেছে। পাখীর গানে চারিদিক ভরিয়া উঠিযাছে। কমলা সজল চক্ষে জানালার বাহিরে উদার আকাশের দিকে শূন্য মনে চাহিযা রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে তার সাহস হইল না। কে জানে, কতক্ষণই বা জগতের এই একমাত্র আত্মীয়ের গভীর-স্নেহে-ভরা স্তিমিতপ্রায় দুইটি নেত্র সে আর দেখিতে পাইবে! এই বিশ্ব জগতে ঠাকুরমা ভিন্ন তার আর কেহ নাই!

সারা প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিযাছে। বাহিরের বাতাস স্নিগ্ধ-কোমল নিশ্বাসের মতই ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। আকাশের রক্ত তুলিকা-পাতে সোণার জলের ছাপ গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। ঠাকুরমা ডাকিলেন, "কমল!" কমলা ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া কাছে আসিল, বহু চেষ্টাতেও সে চোখ তুলিতে পারিল না। ঠাকুরমা কহিলেন, "দিদি তুমি অত কাতর হয়ো না,—দুঃখ কি? মানুষ ত মরবার জন্যই জন্মে থাকে। তোমায় যে আশ্রয়ে রেখে গেলুম, সেইখানে তোমার স্থান ধ্রুবতারার মত অচল করে নিয়ে সুখে থেকো। তোমায় আর কি বলবো,—বলবার আমার ওর বেশী কিছু নেই।"

কমলা আর সহিতে পারিল না। সহসা সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "ঠাকুমা! ও কথা তুমি বলো না, ওগো আমার যে কেউ নেই!"

বলিতে বলিতে তার চারিধারের আলোক-রেখার উপর কে যেন একটা কালো পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিল। সারা জগৎ যেন অন্ধকারে ঢাকা—সেই অন্ধকারে এত বড় একটা জগতের বক্ষে সে একেবারেই একাকিনী। ভয়ে তাহাকে যেন বজ্র-স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল, সে আর কাঁদিতেও পারিল না। বৃদ্ধার চোখেও দুই বিন্দু জল দেখা দিল। কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিয়াছে, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "দিদিমণি কেঁদ না। যার হাতে তোমায় দিয়ে যাচ্চি, তুমি ত রাজরাণী—এই আশার্ব্বাদ করি—"

বলিতে বলিতে সহসা কথা থামিয়া গেল। কমলা চাহিয়া দেখিল, কষ্টের চিহ্নটা মুখের উপর বৈশাখী মেঘের মত অত্যন্ত দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। তড়িতাহতের মত যন্ত্রণাক্লিষ্ট সেই মুখের উপর ভয়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে সে ডাকিল "ঠাকুমা।"

"দিদি!—কমল!"

কমলার সর্ব্বশরীরের রক্ত মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বহুক্ষণ পরে ঈষৎ সংজ্ঞা পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ডাকিল, "মা।" সাড়া পাইল না। "সত্য!" কেহ সাড়া দিল না, সম্মুখস্থিত বিশীর্ণ মুখ মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, নিশ্বাসের জন্য রোগী যেন জলমগ্নের মতই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। কমলার শক্তিহীন কণ্ঠ কোন মতে উচ্চারণ করিল, "ঠাকুমা!"

রোগী উত্তর দিল না, উত্তর দিবার শক্তি ছিল না। কমলা কাঁদিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল, "কি হয়েছে?"

কমলা মুখ তুলিতেই মণীশের আগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। তাহার সান্নিধ্য আজ আর তাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিল না, আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "দেখুন, ঠাকুমা কি রকম কচ্চেন! কি হবে!"

মণীশ তৎক্ষণাৎ জড়িতভাব ত্যাগ করিল। কমলার পাশে আসিয়া নত হইয়া রোগিণীর ললাট ও নাড়ি স্পর্শ করিয়া মাথা তুলিয়া কহিল, "ভয় কি, নাড়ি ত রয়েছে আমি সার্ব্বভৌম মশায়কে ডেকে আনচি, অত অস্থির হয়ো না।"

মণীশ দ্রুত পদে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরে উমাকান্ত ও শিবনারায়ণ দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় হস্তের নাড়ি পরীক্ষা করিয়া শিবনারায়ণের দিকে চাহিলেন। শিব-নারায়ণ ও মণীশ ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ লোক-সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। উমাকান্ত মাথার নিকটে বসিয়া তাঁহার পিপাসা-শুষ্ক ওষ্ঠে গঙ্গাজল প্রদান করিতে লাগিলেন। কমলা নিঃশব্দে ঠাকুরমার বুকের পাশে লুটাইয়া পড়িল। ভাষাহীন শব্দহীন নীরব হাহাকারে হৃদয় তার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নবীন সূর্য্য সহস্র তুলিকাপাতে জলে স্থলে আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘে শত বর্ণ চিত্রিত করিতেছিলেন, নগর-সংকীর্ত্তন খোল করতালের সঙ্গে বিমান পূর্ণ করিয়া হরিনাম গাহিয়া চলিয়াছে, কম্মপূর্ণ ধরণীর কোলাহল-শ্বাস স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে জুড়াইয়া যাইতেছিল।

কমলার পিতামহী শীতল অবশহস্তে পৌত্রীর উত্তপ্ত কম্পিত হস্ত প্রাণপণে ধরিয়া রাখিয়াছেন,—অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "মা গঙ্গা, বাবা বিশ্বনাথ সাক্ষী, পণ্ডিত তুমিও সাক্ষী রইলে,—আমার কমলাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। দাদা মণীশ! একবার মুখ ফুটে বল, তুমি তাকে গ্রহণ করেচ?"

মণীশ মৃদু অথচ সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিল, "গ্রহণ করলেম।"

কুড়ি

রাত্রির প্রশান্ত বিশ্রাম সুখে আঘাত দিয়া শ্মশানবাসীগণ সমকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "বল হরি—হরি বোল !"

সুমধুর হরিনাম! এই ধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, কিন্তু সময়-বিশেষে আবার এই আকস্মিক উচ্চারিত শব্দ সর্ব্বদেহে প্রচণ্ড শিহরণও আনিয়া দেয়, প্রাণ চমকিয়া উঠে !

মূর্চ্ছিত কমলা এই শব্দে হৃত সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া চারিদিকে চাহিয়াই সভয়ে চোখ মুদিল। বালিকার পক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য !

নৈশ আকাশের তলে চিতাবহ্নি সহস্র রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধমুখে গর্জ্জন করিতেছে। অর্দ্ধ জাহ্নবী-বক্ষ সেই তীব্র অনল-দীপ্তিতে আলোকিত। কমলা একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার সাতঙ্কে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। কেমন করিয়াই বা সে না চাহিয়া থাকে? ঐ অগ্নিরাশি যে আজ তাহার এ পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু সম্বল সকলই ভস্ম করিয়া জ্বলিতেছে—এতদিনে যে সে যথার্থ অনাথা হইল! দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে সে কাঁদিয়া উঠিল, "আমার কি হবে ঠাকুমা? আমায় কোথায় ফেলে গেলে?"

কিন্তু মানুষের জীবনে একটানা স্রোতে কেবল দুঃখের প্রবাহ বহে না। জগতে সুখের ছায়া-রূপে যেমন দুঃখ আছে, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু যেমন নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তেমনি ভিন্ন তালে সুখও জীবনের স্থিতিরূপে চিরপ্রত্যক্ষ। উহারা এক সঙ্গেই থাকে; বাস্তবিক ওদের ভিন্ন সত্তা নাই একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ দুইটি,—সেই এক বস্তুরই জীবন, মৃত্যু, ভাল, মন্দ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পায়। বুঝি কমলারও এই গভীর দুঃখের নিবিড় অন্ধকারে বিধাতা একটা আলোক-রশ্মি প্রেরণ করিলেন?

শ্মশান-বহ্নির যজ্ঞকুণ্ডপার্শ্বে জাহ্নবী সৈকত-বেদিকায় শৃগাল-সারমেয়-নাদ-শব্দিত সন্ধ্যা-যামিনীর মধ্যে যে মিলনের গ্রন্থি বিধাতা বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে বিবাহের বর কতটুকু লজ্জা-সঙ্কোচের অধিকার রাখে?

অঞ্জলি ভরিয়া জল আনিয়া নিস্পন্দ মণীশ পিতৃব্যের আদেশে কমলার চোখে মুখে সিঞ্চন করিল। অদূরে অগ্নিশিখা শোকদীর্ণ হৃৎপিণ্ড শোষণ করিতে করিতে অট্টহাসি হাসিতেছিল, সেই রুদ্র আলোকে মণীশ কমলার বিবর্ণ মুখের দিকে করুণ চোখে চাহিল। কি অসহায় সে মুখচ্ছবি! সহানুভূতিপূর্ণ সমবেদনায় মণীশের চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

কমলার কণ্ঠ যখন সীমার মধ্যে ফিরিল, সে মুখ ফুটিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মণীশ তখন তার জন্য অনেকখানি নিশ্চিন্ততা বোধ করিল। সান্ত্বনাপূর্ণ কোমল কণ্ঠে কহিল, "তিনি তোমাকে আমাদের কাছে দিয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করো না।" এইটুকু বলা শেষে সে একটু লজ্জা অনুভব করিল,—কিন্তু এই কথাকয়টি কমলার কর্ণে দেবতার অভয়-বাণীর মতই অমৃত বর্ষণ করিল না কি? গভীর দুঃখের মধ্যেও পরম আশ্বাসে তার বালিকা চিত্ত ঈষৎ শান্ত হইয়া আসিল। সে যতই বড় হোক্, জগতে নিজের স্ব-ই সব চেয়ে বড়,—মানুষ তাই গভীর শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে বলে, "ওগো, আমার কি হল?"—এবং এর পরে বলে, "তুমি কোথায় গেলে?"

ভোরের বেলা করুণাময়ী আসিয়া অনাথাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "এস আমার ঘরের লক্ষ্মি!—আমার ঘরে এস।"

শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া কমলার অশৌচান্তে শিবনারায়ণ সপরিবারে গ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে আর গৃহে ফিরিবেন না, ইহা জানাই ছিল,—তথাপি যাত্রাকালে আবার নূতন করিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ-ব্যথা সকলের চিত্তেই জাগিয়া উঠিল। করুণাময়ীর স্বস্তি নাই,—ক্রমাগতই তিনি চক্ষু মুছিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে ঢুকিয়া অছিলায় এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করিতে করিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন,—"বাবা! আপনি যাবেন না, আমরা কেমন করে সেখানে থাকব বাবা?"

উমাকান্ত একটু সকরুণ স্নেহের হাস্য দ্বারাই উত্তর সমাধা করিয়া দেন। যাত্রাকালে রোদন-পরায়ণা করুণাময়ীর মাথায় হাত রাখিয়া গভীর করুণার সহিত কহিলেন, "তোমার সব ভাল হবে,—মা আমার!"

ক্ষুদ্র কয়টি কথা মাত্র কিন্তু ইহার মধ্যে কত বল, কত ভরসা নিহিত, তাহা শ্রোতারাই শুধু বুঝে। পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়-গামিনী বালিকার মতই প্রৌঢ়া গৃহিণী কাঁদিয়া বিদায় লইলেন। কমলার দুই চোখের মৌন দৃষ্টি হইতে ভক্তি-কৃতজ্ঞতার দুইটি ধারা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। কোন দিন সে বেশী কথা কহিতে জানে না, মনের যেটুকু স্বাধীন বৃত্তি ছিল সেটুকুও বুঝি, দুঃখের চাপে চাপে মরিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাষা অনেক সময় যে গভীর ভাব প্রকাশে অক্ষম, আমাদের মনোদলন-রূপী নেত্র-তারকারা কিন্তু তার সে ত্রুটি সম্পূর্ণরূপেই সারিয়া লইতে পারে। একা সত্যই আনন্দে আট্‌খানা হইতেছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কমলার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, "গৌরী বাঁদরমুখিটা আমাদের দেখে কি রকম আশ্চর্য্য হয়ে যাবে! তোমারও খুব আহ্লাদ হচ্ছে না কি? ওর সঙ্গে খুব ভাব করো।"

কমলা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিল না। দুঃখে তাহার বুক পুড়িতেছিল। একদিন জগতের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন তাহার স্নেহময় দাদাকে হারাইয়া এই কাশীধামে আশাহীন হৃদয় লইয়া সে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সেই হৃদয়ে কি স্নিগ্ধ মধুর সুখের আশা স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পমুকুলের মত সঙ্কোচে সরমে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি মনে সুখের লেশ নাই। হায়, কোথায় রহিলেন, স্নেহময়ী ঠাকুরমা? কমলার জীবনে হয়ত দুঃখ-তমিস্রা কাটিয়া সৌভাগ্য সূর্য্য উঠিবে,—কিন্তু দুঃখের সাথীরা ত উহা দেখিবেন না, দুঃখ সহিয়াই যে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। এ কষ্ট যে ভুলিবার নয়।

পল্লীগ্রামে এত বড় আই বড় মেয়ে তীব্র আলোচনার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ নয়! করুণাময়ীর সহিত কমলাকে দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা চমকিয়া গালে হাত দিলেন। একজন সহানুভূতিতে গলিয়া বলিলেন, "আহা! এমন রূপের ডালি মেয়ে এই বয়সে কপাল পুড়ে গেছে!" কিন্তু গাঙ্গুলি-গৃহিণী যখন রসনা কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ষাট্! এটি আইবুড় মেয়ে দিদি! এ আমার মনুর বউ হবে।" অমনি সহানুভূতিকাঙ্ক্ষিণীর মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, চোখে মুখে ঘোর অবজ্ঞারও ছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। এই বয়সে যাকে দারুণ বিড়ম্বনাপূর্ণ—বৈধব্যের মধ্যে দেখা সহিতে পায়া যায়—কিন্তু

ওরে বাপ্‌রে! এত বড় ধেড়ে মেয়ে আজও আইবড়? রক্ষে কর মা!—স্বভাব গুণে পাড়ার লোকে তাঁহাকে সুচক্ষেই দেখিত, বাড়ীর কর্ত্তার কাছে অনেক লোকেই বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধে সম্পর্কিত, তাই অন্য বাড়ীতে এই ব্যাপার যতখানি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইত, এখানে ততটা ঘটিল না। বিশেষ সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে এই বাগ্‌দানের কর্ত্তা জানিয়া নিতান্ত সাহসী ভিন্ন বাকি লোকেরা একটু 'গাঁই গুঁই' করিয়াই ক্ষান্ত হইল। দু' একজন মুখ-ফোঁড় বলিল, "পণ্ডিত মশাই সব্ব শাস্তর জেনেও এতবড় একটা অশাস্তর কাণ্ড করতে মত দিয়েছেন, তখন বলবার আর কি আছে? হিন্দুধর্ম্ম দেশ থেকে উঠেই গেল, দেখতে পাচ্ছি, আর কি কিছু থাক্‌বে?"

কোন পুরমহিলা স্নানের ঘাটে সখীর সহিত চোখে চোখে ইঙ্গিতের আদান প্রদান করিয়া বলিলেন, "ওলো, এ হল ভাল!—ছেলেমেয়ের বে' দিতে আর পুরুত বামুন ডাকতে হবে না, বর-কনেকে একত্তরে ঘর-কন্না করতে দিলেই সব চুকে যাবে। শুনেচি, সায়েব-বিবিদের এই রকমই হয়।"

কথাগুলি পাঁচ-কান হইতে হইতে ছয় কানে উঠিতে বড় বিলম্ব ঘটে না। মণীশ শুনিয়া আরক্ত হইয়া উঠিল। তার জন্য কমলাকে কেন দশজনের শ্লেষ সহিতে হবে? তখনই সে খুড়িমাকে গিয়া বলিল, "সতু যা-হক করে এবার যখন ক্লাশটা উঠে গেছে, তখন আর ওকে এখানে রাখব নয়,—আমি ওকে নিয়ে কল্‌কাতা যাই। কি বল খুড়িমা?" করুণাময়ী চকিত হইয়া বলিলেন, "সে কি রে? দুজনে তোরা বাড়ী ছাড়া হবি?"

মণীশ ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "না গেলে সত্যর পড়াশোনার সুবিধা হবে না খুড়িমা! নিজের দলে একবার ভিড়লে আর কি ওকে পাওয়া যাবে? ও কি,—এরই মধ্যে তোমার চোখে জল এল বুঝি? না, না, যাব না নাহয় তবে,—তুমি চুপ কর।" বলিতে বলিতে মণীশের চোখেও অশ্রুর আভাস দেখা দিলেও তাহা সম্বরণ করিয়া সে হাসিয়া বলিল, "এই করেই তোমরা আমাদের মাটি করে দিলে"—বলিয়া আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে খুড়িমার অশ্রু-হাস্য-সম্মিলনে যমুনা জাহ্নবী সঙ্গম সদৃশ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই চুকিল না। অন্য কোন উপায় ঠাওরাইতে না পারিয়া মণীশ যখন একঠা উড্‌ পেনসিলের মুখকে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের

পর কর্ত্তনে অতি সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় একখানা পাতা ছেঁড়া মসীবর্ঞ্জিত খাতা হাতে সত্য আসিয়া বলিল, "দাদা ! অঙ্ক কষাবে না ?"

মণীশ মুখ তুলিয়া হাসিল, "আজ এত চাড় যে ? হ'ল কি ?"

সত্য কহিল, "সত্যি বলচি দাদা, এবার থেকে পড়বো,—যা বলবে শুন্‌বো, দেখো তুমি—"

মণীশ সেই কালিমাখা খাতার মধ্যে ব্যবহার যোগ্য পৃষ্ঠা খুঁজিতে খুঁজিতে ভাইয়ের আকস্মিক সুমতিতে প্রীত হইয়া কহিল, "আমি জানি তুমি খুব ভাল ছেলে, নিজেকে তুমি এতদিন বুঝতে পারনি বৈত নয় ! এস—"

সত্য ঘাড় হেঁট করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে অঙ্ক কষিল। বুদ্ধিতে সে ত খাটো ছিল না, চিত্ত স্থির করিবামাত্র অতি সহজেই সে সফল হয়। মণীশ প্রীত হইয়া কহিল, "এইটা পার !" বিস্মিতও হইল—এই ক্ষমতাটা চাপিয়া রাখিয়া মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতি করে !

সত্য যখন দেখিল দাদা বেশ একটু গলিযাছে তখন সে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টায় বিনীত ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "মিছি মিছি কলকাতা যাবার দরকার কি ? তুমি বাবাকে বল সতি এইখানেই মন দিয়ে পড়বে,—তুমি বল্লেই বাবার মত হবে।"

মণীশ এবার কথাটা বুঝিল। সত্য কহিল, "মা বাবাকে বলেচেন, তুমি মাকে বলেচ, আমায় নিয়ে তুমি কলকাতা যাবে। বাবা তাই শুনে বল্লেন,—খুব ভাল কথা, তাই করুক।' ও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি—"

মণীশ সবেগে বাধা দিয়া কহিল, "পায়ে পড়ি কি ? কাকাবাবু বলেচেন, তার পরও তুমি এই সব বলচ ? তাঁর আদেশ আমাদের পক্ষে যে বেদ-বাক্য।"

আশা ফুরাইতেই সত্যেন্দ্রর সজাগ বুদ্ধি বৃত্তি ক্ষুব্ধ রোষে অচেতন হইয়া পড়িল। দাদা তাহাকে কেমন করিয়া বিদ্বান করে, তাহা সে দেখিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বেলের আটা দিয়া ছেঁড়া ঘুড়িখানা জুড়িয়া লাটাইয়ে বোতল চুরের মাঞ্জা লাগানো সুতা জড়াইতে জড়াইতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। এইরূপেই সে জ্যেষ্ঠের উপর প্রতিশোধ লইতে সক্ষম আর তো কিছু এই নিরুপায় বেচারার করিবার নাই।

একুশ

এত বড় বুড়ো থুবড়ো মেয়েটাকে ঘরে রাখিয়া ভ্রাতা ভগিনীর কণ্ঠনালা দিয়া কিরূপে যে অন্ন-জল গলিতেছে,—এই অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের কোন মীমাংসা ভট্টাচার্য্য-গৃহের বড়বধূ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মেয়ে খাইয়া খাইয়া দিন দিন হাতি হইয়া উঠিতেছে, তিনি হইলে এতদিন কোন্ কালে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মেয়ে পার করিবার ভাবনাই ভাবিতেন। এই দেখ না,—কথায় বলে,—'যার বে' তার মনে নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই, মামা মাসী দিব্যি করিয়া নাসারন্ধ্রে সর্ষপ-তৈল নিষেকপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনিও ত আর চোখে ঠুলি দিয়া থাকিতে পারেন না, বলিলে বোনটী ত দুটী ঠোঁট একটি করেন না, ভাই বলেন, 'সুপাত্র না মিললে কি করবো ?' সুপাত্র কি বিধাতাকে ফরমাস দিলে গড়িয়ে দিবেন ? সুচক্ষে দেখিতে বাহির হইলেই সুপাত্র খুঁজিয়া মিলিবে। সুপাত্রের ভাবনা কি ? তবে হ্যাঁ, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট চাহিলে অবশ্য ওই মেয়ের বর এজন্মে আর জুটিবে না, তাও বলিয়া দিতেছি।

একদিন অসহ্য হইয়া উঠিলে বড়বধূ স্বামীকে গিয়া বলিলেন, "তুই ভাই বোনে মিলে ক্রমাগত যে পাত্তর বিদায় করচ, এদিকে মেয়ের পানে যে চাওয়া যায় না !"

ভক্তিনাথ বৈশেষিক দর্শনের টীকা লিখিতেছিলেন আজকাল তাঁর অবসরের তাই একান্ত অভাব। যথা কার্য্যে রত রহিয়াই মুখ না তুলিযাই কহিলেন, তাহলে ওর দিকে চেয়ো না কিছুদিন যাবৎ।" বলিয়া কীট-দষ্ট পুঁথির অংশ-বিশেষ সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বড়বধূ এইরূপ অবজ্ঞাত হইবেন তাহা না জানিয়াই যে আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন এমন নয়, তাই যথেষ্ট সংযমের সহিত কহিলেন, "আমিই না হয় চোখ বুজে রইলুম, কিন্তু পাড়াশুদ্ধ—সব্বাই কি চোখ বুজে থাকবে ?"

"বড় বউ ! তোমার কি কাজ কিছু নেই ? না থাকে ত আমার বইগুলো একটু ঝেড়ে মুছে রাখ না।"

বড়বধূ এবার চটিলেন, বলিলেন, "কাজ থাকবে না কেন, যথেষ্ট আছে। তোমাদের ঘরে এসে কাজের কখনও তো এতটুকু অভাব দেখলুম না।— কিন্তু যাই বল আর কও,—তোমাদের এ ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না! এর পর ঐ মেয়ে নিয়ে যখন ভুগতে হবে, তখন বলবে হ্যাঁ!—তোমাদের ঘরে যদি এই সব বেচাল কাণ্ড হবে, তবে অন্যলোকে যাখুসী করবে না কেন? বুড়ো করে মেয়ের বে দেওয়াটা খুব ভাল ? সমাজে এই নিয়ে কত কিছু না ঘটে যাচ্ছে শুনতে পাও নাকি?" বলিয়া সশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ীর গৃহিণী যে খোঁচা বিঁধিয়া গেলেন, ইহার মধ্যে যে একটা অখণ্ডনীয় সত্যের আঘাত আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। গৌরীর বয়স বার বৎসর পার হইতে যায়, তাঁদের ঘরে এতটা বড় করিয়া পূর্ব্বে আর কখনও মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় নাই। কাদম্বিনীকে নবমে ও বিন্ধ্যাকে দশমে দান করা হয়। একটু দুর্ব্বলতার বশেই এই মাতৃহীনা পিতৃত্যক্তা মেয়েটাকে এ পর্য্যন্ত তাঁহারা পর-হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু কাজটা যে ঠিক পল্লী-সমাজ সম্মত নয় একথা অনস্বীকার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই! যাহা একদিন হইবে তাহাতে এতই মোহ প্রাপ্ত হইলে চলিবে কেন?

পুঁথি পত্র তুলিয়া দোবজাখানা গায়ে দিয়া ভক্তিনাথ বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল।

ভিতরে আসিলে পা ধুইবার জল লইয়া বড়বধূ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাগ করেচ? তা রাগ কর তো এবার থেকে না হয় তোমার ভাগনীর বিয়ের কথা আর বলব না।"

ভক্তিনাথ পত্নীর হাত হইতে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন, "রাগ করিনি। তুমি যা' বলেচ, ভেবে দেখলাম সেটা ঠিকই, সমাজে থেকে সমাজবিধি মানতেই হবে। তাই হরিশ ঘটকের কাছে গেছলাম। বিন্ধ্য শুনে যাও, তোমার গৌরীর জন্যে একটি পাত্র দেখে এলাম।"

রান্নাঘরের রোয়াকে ছেলেরা খাইতে বসিয়াছিল, বিন্ধ্যবাসিনী তাহাদের পরিবেষণ করিতেছিলেন। পরিবেষণ পাত্র হাতে লইয়াই এদিকে একটুখানি সরিয়া আসিলেন। ভক্তিনাথ কহিতে লাগিলেন, "ক্রোশ তিনেকের ভিতরেই ছেলের বাড়ী, ছেলের বাপের নিজের একটী চতুষ্পাঠী আছে, টোলে নব্য-

ন্যায় পড়ান হয়, ছেলেটি পাঠ শেষ করেচে। পাত্রটী ভাল, বয়স আন্দাজ,—পঁচিশ ছাব্বিশ, দেখতেও শ্রীমান, অবস্থাও বেশ ওদের স্বচ্ছল।—তোমার পছন্দ হয়?”

বিন্ধ্যবাসিনী সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। দাদা বলিতেছেন পাত্র ভাল,—সুপাত্রই—সে কি করিয়া বলিবে—‘না’ কিন্তু ধবক করিয়া মনের মধ্যে অবাধ্য একটা ‘কিন্তু’ দেখা দিয়া নিমেষে বলিয়া উঠে, ‘এই কি তাঁর গৌরীর যোগ্য বর?’

বিন্ধ্যকে নীরব দেখিয়া বড় বধূ প্রমাদ গণিলেন। দেবতার কৃপায় যদি বা তাঁর পণ্ডিত-মূর্খ স্বামীটির একটু সুমতি হইল, অমনি শনিগ্রহ আর একজনকে ভর করিয়া আসিয়া জুটিবে না কি? তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হইয়া কহিয়া উঠিলেন, “ওমা, তা’ আর পছন্দ হবে না? তুমি নিজের চোখে দেখে পছন্দ করেচ, সে জায়গায় আমরা মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানুষে কি বেশি বুঝবো না কি? কি বল ঠাকুরঝি? ও দিব্যি হবে। ঐখানেই তুমি ঠিক করে ফেল। অনর্থক দেরী করো না। আমাদের বামুন পণ্ডিতের ঘরে কি আর টুলো পণ্ডিতের ব্যাটা ছাড়া বিলিতি পাশের ব্যারিষ্টারের হ্যাট-কোট পরা সায়েব বর আসবে! একবার তো ওই করতে গিয়ে কি না ছড়কোট হয়ে গেল। সইলো কি?”

বিন্ধ্যবাসিনী এই ওকালতির পর আর মুখ ফুটিয়া ইচ্ছা অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে সাহস করিলেন না, মৃদু স্বরে ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “খরচ পত্র কি রকম করতে হবে?”

ভক্তিনাথ কহিলেন, “তা’ কিছু ত লাগবেই। সবশুদ্ধ সাত আটশো টাকা খরচ করতে হবে। তা পাত্র যদি তোমার মনে ধরে ভেবে দেখ, যে করে পারি টাকার জোগাড় আমি করে নে’বো’খন।”

বলিয়া তিনি মুখ হাত ধুইবার জন্য বাহিরের দিকে ফিরিলেন। গলাটা ঈষৎ বুজিয়া আসিয়াছিল, চোখ দুইটাও একটু ছল্ ছল্ করিতেছিল। আত্মীয়-বর্জ্জিত প্রবাসে অনাথার মত যে বোন শিশু কন্যা পরের দয়ার উপর ফেলিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে, তাহাকেই আজ আবার বড় বেশী মনে পড়িতেছিল।

কিন্তু টাকার কথাটা বড় বধূর মনে তেমন মোলায়েম ঠেকিল না। ঐ বাপে-খেদান মেয়েটা তার স্বামীকে যে একেবারে গলায় আঁক্‌সি দিয়া টানিবে, ইহা তিনি কোন প্রাণে সহ্য করিবেন? ওরে বাপরে! এমন অলুক্ষণে মেয়েকেও ঘরে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, তাঁর বাছারা এইবার রাস্তার ভিখারী হইতে চলিল আর কি! ঐ টাকা তো ভক্তিনাথকেই চোটা সুদে কর্জ্জ করিতে হইবে, না ত আসিবে কোথা হইতে! অ্যাঁ?

দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া রাগিয়া তিনি বাড়ী মাথায় করিলেন। ভক্তিনাথকে এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, "মেয়ে বড় হয়েছে, সুপাত্র ত্যাগ করব কি জন্যে?" হাজারবার মাথা খুঁড়িলেও আর এ সঙ্কল্প টলিবে না জানিয়া সমুদয়টুকু মনের ঝাল যে সহিতে বাধ্য, তাহারই প্রতি তাহা ঝাড়িতে চিরদিনের মত আজও তিনি দ্বিধা মাত্র করিলেন না। গৌরীর প্রতিই শাসনদণ্ড উদ্যত করিয়া মানসিক ক্ষতিপূরণ তুলিয়া লইতে চাহিলেন। কিন্তু হায়, জগতে যেমন হাসি মুখ তেমনই রাঙ্গা চোখ,—কিছুই তো আর অর্থ প্রসব করিতে পারে না এবং নির্ব্বোধ এক রোখা মেয়ের মনের মধ্যেও দাগ কাটিতে সমর্থ হয় না। নিজের গলাই শুধু চিরিয়া যায়।

সত্য দেশে ফিরিয়া দলের লোকদের কাছে সংবাদ পাইল, গৌরী আজকাল আর তাদের দলে ভিড়িয়া আম বাগানে, জাম বাগানে ঘুরিতে পায় না। মাছ ধরার পাট ত সে বিহনে উঠিয়াই গিয়াছে। শুনিয়া সত্যের মনে আনন্দ হইল। হুঁ,—সে দেশে নাই, গৌরী কি সুখে এদের দলে মিশিবে? এইবার সে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের প্রভুত্বটা দেখাইয়া দিবে। সদম্ভে ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর দিকে চলিল। অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া সঙ্গীরা বলিল, "মাসির চোখে ধূলো দেওয়া যায়, কিন্তু মামীর চোখ উটের চোখ, ধূলো লাগে না।" দেখা যাক্, উট চোখ বোজেন কি না।"

খিড়কির দ্বারে ঘা পড়িল, জানালায় ঢিল পাটকেলের কাঁড়ি জমা হইল, কিন্তু সবই বৃথা! রান্না-ঘরের পাশ দিয়া সশব্দচরণ কোন পঠনশীল সুবোধ বালক গৌ-শব্দের রূপ উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে পঞ্চাশ বার আনাগোনা করিল, কিন্তু গোগৃহে তথাপি গৌ-প্রমুখ নামধারিণীর সাড়া

মিলল না। ভিতর হইতে কর্কশ কণ্ঠের একটা সাড়া আসিল, "খ্যাপ্‌লা! দেখ্‌তে র্যা, কোন্ হতচ্ছাড়া ছোঁড়া পাঁদাড়ে বিত্তে ছড়াতে এয়েচে,—কান ধরে টেনে আন।

বলা বাহুল্য সম্বোধিত খ্যাপ্‌লার বহির্বাগমনের পূর্ব্বেই সত্য পাড়ি গুটাইল। ক্রোধে ক্ষোভে সঙ্গীর দলে ভিড়িল না।

বাড়ীর ভিতরে তখন মধ্যাহ্নের বিশ্রাম অবসরে বড় বধূ কাঁথার উপর বিচিত্র বর্ণের সূতা দিয়া পদ্মফুল তুলিতেছিলেন, আর বিন্ধ্য ঠাকুর আরতির দ্রব্যাদি সাজাইতেছিল। সূর্য্য পাটে বসিবার বড় বেশী দেরী নাই।

বাইশ

গৌরী মামী কর্ত্তৃক সন্ত-ভৎর্সিতা হইয়া তাঁহার দুইটি আব্দারে শিশুকে ঘরে লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় মঙ্গলা গাইটা দড়ি ছিঁড়িয়া উঠানে দাপাদাপি করাতে জানালার নিকট আসিয়া সে হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছে, এমতকালে সহসা বাহিরে সত্যর সাড়া পাওয়া গেল। বড় বধূ বলিলেন, "ওই হল গো ঠাকুরঝি! দস্যি মেয়েকে সামলান এখন দায় হবে!—গৌরী! গৌরী! ও কি হচ্ছে?"

দেখা গেল, গৌরী পদাঙ্গুলে ভর করিয়া চুপি চুপি খিড়কির দিকে চলিয়াছে! বড় বধূ তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "অমন মেয়ের আবার বে দেওয়া কেন? গাঁয়ের চৌকিদার করে দিতে হয়। দেবে শাশুড়ী ঝেঁটিযে বিদায় করে, তখন টেরটি পাবেন মাসি, যেমন নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছেন!"

বিন্ধ্যবাসিনী কঠিন স্বরে ডাকিলেন, "গৌরি!—"

গৌরীর মাথার উপর যে একটা ঘোরতর দুর্দ্দিন বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে বুঝিয়াছে। দিদিমা ও দাদু বিহনে এ বাড়ীতে তার অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। তার উপর আবার বিবাহ। বনের হরিণীকে ধরিয়া শিকলে বাঁধিবার এ চেষ্টা কেন? কনে দেখা দিবার কালে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া প্রথম দিনটা সে ঘোষেদের বাড়ীর গোয়ালে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী ফিরিলে লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। ভক্তিনাথও গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ছি মা! অমন কাজ করতে নেই।" এইটুকু বলিতেই সহসা তার অসহায় মুখচ্ছবি চোখে পড়িয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বড়বধূ কহিলেন, "ভুগবেন্—নিজেরাই ভুগবেন্ আমার কি?" গৌরী যখন বুঝিল নিষ্কৃতি নাই, তখন তার দুই চোখে সেই যে ধারা নামিল, তাহা আর থামিল না। আর একজন শুধু তার এই অসহায় রোদনের সঙ্গিনী ছিলেন, তিনি তার মাসিমা। এ সম্বন্ধ কে জানে কেন কিছুতেই তাঁর মনঃপুত হইতেছিল না, অথচ ইহা

চেয়ে ভাল পাত্র আনিতে মূল্যও ভালরূপ দিতে হইবে এও তো বিন্ধ্য জানেন, এ সংসার হইতে তাহার সংস্থান হওয়া অসম্ভব। এই কয়েক শত মাত্র টাকা সংগ্রহ করিতেই ভাইকে কতখানি বেগ পাইতে হইতেছে দেখিতেছেন ত! অগত্যা নিরুপায়া বিধবা বসনাঞ্চলে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রদ্বয় নিঃশব্দে মুছিয়া ডালের হাঁড়িতে জিরার ফোড়ন ছাড়িয়া দিলেন। সারাদিন কোনরূপে কাজ কর্ম্মের মধ্যে উথলিত অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ রাখা চলে, কিন্তু গভীর নিশীথের কর্ম্মহীন অবকাশের মধ্যে শব্দহীন অন্ধকারে নিদ্রিতা বালিকার নিশ্চিন্ত আলিঙ্গনের নিবিড় বেষ্টনে সে অশ্রু আর কিছুতেই বাধা মানিতে চায় না। গৌরী সেই তপ্ত অশ্রু-স্পর্শে কোন দিন জাগিয়া উঠিয়া বুক ফাটা বেদনায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলে, "ওগো মাসিমা! আমার বিয়ে দিয়ো না, তাহলে আমি মরে যাব।" বিন্ধ্যবাসিনী দুই হাতে তাহাকে বুকে টানিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠেন, "থাম—আবাগি,—থাম্, আমায় অমন করে পোড়াস্‌নে।"

এই আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা উভয়কেই নিদারুণ পীড়া দিতেছিল। গৌরী যে ধনবানের কন্যা হইয়াও অর্থাভাবে যোগ্য পাত্রের হাতে পড়িবে না, এই দুঃখই বেশী করিয়া তার মাসিকে বিঁধিতেছিল। তাহার উপর ইহার গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞতা, নারী-জনোচিত লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের একান্ত অভাব, এ চিন্তাও তো বড় সামান্য চিন্তা নয়, কে তাঁর এই চঞ্চলা মৃগশিশুটিকে করুণার চক্ষে দেখিয়া ক্ষমা করিবে? বড়বধূ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে সর্ব্বস্ব পণ করে ভাগ্নির বে দিচ্ছ, মাসি বোনঝির চোখে ত বান ডেকেচে, কোন্‌দিন বা বাড়ী বাগান ভাসে!"

ভক্তিনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিন্ধ্যর কি এ পাত্র পছন্দ হয়নি?"

বড় বধূ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়া কহিলেন, "হয়েচে কি না হয়েচে সে আমায় বলেচে না কি? আমি ত আর জান্ নই যে জানব।"

"তবে শুধু শুধু মানুষের নামে লাগাতে এসো না। কি গ্রহ। মেয়ের বিয়ে দেবে—চিরদিন মানুষ করলে,—কাঁদবে না, সে? তোমার মত পাষাণী ত নয়।"

ভক্তিনাথ বিরক্তভাবে চলিয়া গেলেন। বড় বধূ রাগ করিয়া ঘরে গিয়া

শুইয়া রহিলেন। ননদ আসিয়া না সাধিলে সে দিন আহার করিতে গেলেন না। এক মার পেটের ভাই বোন ত! একজনকে তিনি আঁটিতে না পারিলে অপর জনের উপর কেনই বা শোধ না তুলিবেন?

যেদিন সত্য গৌরীকে ডাকিতে আসিয়া একা ফিরিয়া গেল, গৌরীর পক্ষে সেদিনের মত কষ্টের দিন আর কখনও আসে নাই। মাসিমার সমুদয় উপদেশ ভর্ৎসনার দিক হইতে নিজের বিদ্রোহী চিত্তকে রুদ্ধ রাখিয়া পাথরের মত নিশ্চলভাবে সে বসিয়া রহিল, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে যখন বিন্ধ্য কাছে আসিয়া "রাণু মা, উঠে এস মা?" বলিয়া ডাকিয়া তাহার গায়ে হাত দিলেন, তখন সে আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। অজ্ঞাতে কেমন করিয়া মনটা গলিয়া গেল। উঠিয়া হঠাৎ মাসিমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "আমি ভারি দুষ্টু, নয় মাসিমা?"

"না, মা, তুমি আমার সোণা মেয়ে" বলিয়া মাতৃস্বসা দুই হাতে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর ত্বরিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বড়বধূ দেখিতে পাইয়াছেন কি না,—দেখিলে এখনই বলিবেন, "ঐ করেই ত তুমি মেয়েটার মাথা খেলে।" কিন্তু কি তিনি করিবেন? মা-হারা সন্তানকে যে মানুষ করিয়াছে, সেই জানে, কেমন করিয়া সে তার পালয়িত্রীকে মার চেয়েও আকুল করে! বিশেষ এই কুহকিনী মেয়েটাকে শাসন করা যে কি দায়, তাহা তিনিই জানেন!

সারাবেলা ধরিয়া গৌরী সেদিন মাসিমার কাছে কাছে রহিল। বৈকালে যখন উঁচু খোঁপার চারি পাশে সোনার পুঁটে সাজাইয়া 'বেলফুল' গা ধুইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তখনও সে মনটাকে দুষ্ট ঘোড়ার মত রাশ টানিয়া ফিরাইয়া রাখিল, মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "না ভাই, এখন যাবনা, মাসিমার সঙ্গে যাব, তুমি যাও।"

"ক্যান্ লা! চল্ না। আজ মন্‌মিছরি শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেচে, সত্য দাদা এসেচে, যাবিনি কেন?"

বড় প্রলোভন! কিন্তু তথাপি মাসিমার সে আদরের শাসনে একটা অলঙ্ঘ্য নিষেধ শক্তি নিহিত ছিল। গৌরী সংক্ষেপে কহিল, "না ভাই, বড় হয়েছি।"

এক দিনের মধ্যে সে এতখানি কি বড় হইয়া গেল, বুঝিতে না পারিয়া বেলফুল রাগিয়া বলিল, "বুঝেছি লো, বুঝেচি, বিয়ে ত আর কারু কখনো হবে না। দেখলুম ভাই, দেখলুম,।" সশব্দে মল বাজাইয়া সে চলিয়া গেল।

এদিকে যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, গৌরীর প্রাণের ভিতরটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিতে লাগিল। একবার পুকুরঘাটে যাইতে পারিলে হয় ত সত্যর দেখা মিলিতে পারে। সে কি মনে করিতেছে? কত রাগ করিতেছে! বাড়ীতে টেঁকা দায় হইল। রান্নাঘরের দালানে বসিয়া মাসিমা তরকারি কুটিতেছিলেন, পিছন হইতে তাঁহার গলাটা সে জড়াইয়া ধরিল। বিন্ধ্য চমকিয়া উঠিয়া বঁটি ছাড়িয়া দিলেন, কহিলেন, "সর্ব্বনাশি! এখনি কেটে খুন হয়েছিলি যে।"

মাসিমার স্বর স্নেহ-বিগলিত। গৌরী তাঁর কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "একবারটি—মাসিমা, আজকের মত একবারটি সত্যদাদের বাড়ী যাই না? যাই না, মাসিমা!"

এ কণ্ঠকে অবহেলা করিতে কি মাসিমার সাধ্য আছে? বিন্ধ্য 'না' বলিতে গিয়া বলিয়া বসিলেন, "তা'যা, শীগ্‌গির আসিস্‌ কিন্তু, রাস্তা ঘাটে বেড়াস্‌নি,—মনে থাকে যেন?"

"খু—উব্‌" বলিয়া একলম্ফে গৌরী গামছা কলসী লইয়া বাড়ীর বাহির হইল। গৃহান্তর হইতে তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বড়বধূ বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "চলন্‌ দেখ্‌চ,—মেয়ে যেন ঘোড়ার নাচ নাচ্‌চেন।"

সত্যদের বাড়ী সত্যর দেখা মিলিল না, কিন্তু গৌরী একটি অপরিচিত সুন্দর মুখ সেখানে দেখিল। এমন মুখ সে আর কখনও বুঝি দেখে নাই! ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিয়া ক্রমে সে তাহার নিকটস্থ হইল, তারপর হঠাৎ চট্‌ করিয়া কলসী নামাইয়া তার হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কে ভাই? কোথা থেকে এলে?"

এই সরল প্রশ্নকারিণী মেয়েটিকে কমলার বড় ভাল লাগিল। সকলেই এখানে তাহাকে পরীক্ষার ছাঁদেই যাহা কিছু জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছে। তার এতখানি বয়স অবধি অবিবাহিতা থাকা অপরাধের কৈফিয়ৎ লইয়া

লজ্জায় তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দিতে চাহিতেছে,—ইহার মধ্যে সহানুভূতির ভাবটা যে আদৌ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সে তাই ইহাকে দেখিয়া যেন একটা নিধি পাইবার মত আশ্বস্তভাবে সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমি কমলা, কাশী থেকে এসেচি, ভাই! তোমার নাম কি?"

"গৌরী গো, গৌরী।—আমার নাম জান না? সত্যদা তোমায় বলেনি? হ্যাঁ গা, সত্যদা কোথা গেল?"

"তুমিই গৌরী! তোমার কথা ঢের শুনেচি বৈ কি! এসো এসো, আমি যে তোমাকেই খুঁজছিলাম।"

কমলাই যখন তাহার পরিত্যক্ত শূন্য কুম্ভ দর্শনে তাহার গা ধুইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন তাহার সহিত গৌরীর বন্ধুত্ব বেশ পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। কমলা খিড়কীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে বিদায় দিল, বলিল, "কাল এসো।"

"আসব" বলিতে গিয়া গৌরীর হঠাৎ স্মরণ হইল, কি করিয়াই বা সে আসিবে? সে ত আসিতে পারিবে না। তাই ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "আমার যে ভাই আসবার যো নেই?—তুমিই যেয়ো না।"

কমলা মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিল, কহিল, "আমি কি এখানে কোথাও যেতে পারি? কেন, তোমার আসবার যো নেই, ভাই?"

গৌরী কহিল, "আমার যে বিয়ে হবে, ভাই,—তুমি শোননি? মাসিমারা তাই কোথাও যেতে দেন না।"

কমলা এ কথায় কৌতুক অনুভব করিল না, বরং সে যেন সহসা একটা ব্যথা বোধ করিল, তাই, ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ের কথা শুনিনি ত! কবে বিয়ে?"

"কে জানে। বলি মাসিমাকে, যে বিয়ে দিয়ো না,—তা ওরা কিছুতেই শুনবে না।" বলিতে বলিতে তার দুঃখটা উথলাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল দেখিয়া ঘড়া টানিয়া লইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

কমলা বিস্ময়ে করুণায় চাহিয়া রহিল। বাস্তবে ও কল্পনায় সংসারে ও পুস্তকে কত প্রভেদ! সে সত্যর নিকট হইতে গৌরীর যে চিত্র পাইয়াছিল এবং আজ নিজে তার যে পরিচয় পাইল, ইহাতে এমন কোন

কঠিন চিত্ত ঔপন্যাসিক নাই, যে এই দুইটি অনভিজ্ঞ শিশু-হিয়াকে একই বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য বৎসর দুই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে না পারে, কিন্তু বাস্তব সংসার এ সব চাহিয়া দেখে না,—কঠিন উপহাসে ভাঙ্গিয়া দলিয়া 'ষ্টিম রোলারের' মতই নিজের পথে চলিয়া যায়।

গৌরী যখন ঘাটে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘাটে নামিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ জলের মধ্যে প্রদীপ শিখার মতই স্পন্দিত হইতেছে। বাতাবি লেবুর গাছগুলা হইতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্পগন্ধ উত্থিত হইয়া নির্জ্জন উদ্যানে সন্ধ্যাচারিণী বনদেবীর মৃদু নিশ্বাসের মতই ঘুরিয়া বহিতেছে। গৌরীর মনে ভয় ডর নাই,—গ্রামের মেয়েরা স্বভাবতঃ সহরের মেয়েদের চেয়ে সাহসী হয়,—তারা ভূত প্রেতের কল্পিত অস্তিত্ব মানিলেও বনে বাদাড়ে ঘুরিতে ভয় পায় না। আর গৌরী ত বন-বিহঙ্গী—গৃহ-কপোতী নহে। তাহার মনে যে একটা ভয় জাগিতেছিল, তাহা ভূতের ভয় নয়, তার চেয়েও বড়। অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, ইহার পর আর কখনও সে মাসিমার নিকট শীঘ্র গ্যারাণ্টি দিয়া মুক্তি আদায় করিতে পারিবে না। অথচ সত্যদার সঙ্গে দেখাও হইল না!—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "গৌরী।"

"তুমি এলে!" উল্লাসে চমকিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। "কি করে জানলে—তুমি? কি করে জান্‌লে আমি এখানে এসেচি? রাগ করনি ত? তুমি ঠিক বলচো? সত্যি বলচো? সত্যি বলচো?"

সত্য শপথ করিয়া বার বার জানাইল সে রাগ করে নাই—বড় মামীকে কি সে চিনে না? তখন আশ্বস্ত হইয়া গৌরী তাহার পুরাতন সাথীর সহিত নূতন করিয়া সুখ দুঃখের কথা কহিতে বসিল। কহিল, "মাছ টাছ ধরা আর হবে না, সত্যদা। এক একদিন লুকিয়ে পালিয়ে আসব'খন। রোজ কিন্তু আসতে পারব না—বড় মুস্কিল!"

সত্যর মুখের ভাবও তাহারই মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "এসেই বা কি করবি? আমি ত দু এক দিনের মধ্যেই দাদার সঙ্গে কল্‌কেতা যাচ্চি।" বলিয়াই সে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গৌরী চমকিয়া উঠিল, কহিল, "সে কি ভাই! কেন?"

"জানি না,—ওঁরাই জানেন। তুই কমলাকে দেখেছিস ?"

"হ্যাঁ, কমলা ত বেশ !"

"ও কে, জানিস্‌ ?"

"কমলা—কে ? জানি না।"

"আমাদের বউ।"

"তোমার বউ ?" বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাস্যস্রোত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিয়া কানন মধ্যে সঙ্গীতস্রোতে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতি যেন এইটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল—সৌন্দর্য্য-সৌরভের সঙ্গে সঙ্গীত মিশ্রিত হইল ! "বড় থাক্‌তে ছোটর বিয়ে, বড় থাকবে গালে হাত দিয়ে ? মণীশদার বিয়ে হল না,—তোমার বিয়ে ?"

সত্য এ পরিহাসে রাগ করিয়া তাহার আঁট সাঁট্‌ বাঁধা খোঁপায় একটা টান দিয়া কহিয়া উঠিল, "হবে ত হবে,—তোর কি তাতে ?"

গৌরী অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া যখন থামিল, তখন হঠাৎ তার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ নীচু করিয়া সে জলের দিকে চাহিল। সত্য তার গালে একটা চড় মারিবার জন্য হাত তুলিয়া কি ভাবিয়া সহসা আপনাকে সম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ওরে হিংসুকে। আমার বিয়ে নয় রে, দাদার বিয়ে। তোর যা বিদ্যে হচ্ছে কেউ তোকে বিয়ে করবে না, দেখিস্‌।—বড় থাকতে ছোটর বিয়ে কখনও দেখেছিস্‌, তুই ? বল্‌ বাঁদরি বল্‌ ?"

এত বড় অপমানের কথাটা সত্যর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র গৌরী হাসিয়া উঠিল, সগর্ব্বে কহিল, "ইঃ, হবে না ত কি ! সব ত ঠিক।"

এবার শ্রোতার মুখে সেই ঈর্ষার ছায়াখানা আসিয়া পড়িল কি না, অন্ধকারে দেখা গেল না।

তেইশ

শচীকান্ত এখন আছে ভাল। পড়াশুনার চাপ নাই, অভাব-অভিযোগের জুলুম নাই, স্বচ্ছন্দ ভোজন, সানন্দ বিচরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ভবিষ্য কাব্যের কল্পনা করা এখন এই তার প্রাত্যহিক কাজ। এ ভিন্ন মাসিমার নিকট হইতে সম্প্রতি সে একটা ক্যামেরা কিনিবার পয়সা আদায় করিয়াছে,—জিনিষটা এ দেশে এখনও তেমন চলতি নাই বিশেষ এই পল্লীগ্রামে। কাঁচের মধ্যে মুখগুলার অধিকাংশই বিস্ময় বিহ্বল ভাব লইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছিল। কিন্তু এমন করিয়া মানুষের বেশী দিন কাটে না। এবার কাশী গিয়া সে যে নূতন স্বাদ পাইয়া আসিয়াছে, সেই প্রলোভন তার চিত্তকে গৃহ-কোটরে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। পূজার পূর্ব্বে একবার দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিবার লোভে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্কল্প শুনিয়া গিরিজাসুন্দরী গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, "না রে বাপু! সে হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে থাক্, কোথায় যাবি, বাড়ীতে পূজো।"

গোপনে পরামর্শ চলিতেছিল। এ খবরটা সহসা একদিন গিরিজা-সুন্দরী নায়েব হরচন্দ্রের মুখ হইতে অবগত হইয়া বহির্বাটীতে আসিয়া বামালশুদ্ধ চোর পাকড়াও করিলেন। শচী বলিল, "কি করি, মাসিমা? জানলে ত তুমি যেতে দেবে না, তাই শিশির আর আমি এই ফন্দি এঁটেছিলুম।"

শিশির কল্যাণীর স্বামী। মাসিমা কহিলেন, "তা যাবিই ত! আমার মুখ চাইবি কেন, বল্? আমি তোর কে! পূজোর সময় যদি বাড়ী ছেড়ে তোরা যাবি, তবে কাকে নিয়ে থাকি বল্ দেখি?"

শচীকান্ত হাসিয়া কহিল, "কেন, কলীকে আন্‌লেই ত হয়। পাঠাবে না বই কি, খুব পাঠাবে, কেউ ত তাকে বেচে খায়নি। সে সব আমাদের ঠিক্ হয়ে গেছে, পঞ্চমীর দিন সে আসবে। তুমি ভেতরে যাও মাসিমা, এখনি কেউ এসে পড়ে নিন্দে করবে।"

"গিরি বাম্‌নির নিন্দে করবে, এমন লোক এখনও এ তল্লাটে জন্মায়নি" —বলিয়া সগর্ব্ব পদ-ক্ষেপে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী নায়েবখানার পিছনে পর্দ্দার অন্তরালে বৈষয়িক কার্য্যের তদারকে চলিয়া গেলেন। কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নাই, অপব্যয় নাই, অবিচার নাই, এই নারী সাম্রাজ্যের অল্প-সংখ্যক প্রাণী এ রাজ্যে সুখেই বাস করে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস পায় না।

শচীকান্তর সঙ্গে কিছুদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া শিশির শেষে কাশী গমনের প্রস্তাব করিল। কাশীতে পিতা আছেন,—শচীকান্ত প্রথমে সেখানে যাইতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু নাছোড়বান্দা শিশির নিতান্ত না ছাড়ায় যাইতে বাধ্য হইল। উমাকান্ত তেমনি স্বল্প নিদ্রার পর মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির বিশ্রাম অবসরে নীরব উপাসনা, শিশির-ঝরা ভোরের আলোয় জাহ্নবী-তরঙ্গের সুপ্তি-ভাঙ্গিয়া দিয়া অলি-গলি ঘুরিয়া আর্ত্তকে সাহায্য ও ব্যথিতকে শান্তিদান, সন্ধ্যার ঝিকমিকে আলো নৈশ অন্ধকারে ডুবিতে আরম্ভ করিলে দিবারাত্রির সন্ধিস্থলের সাম্যভাবে জন্ম মরণের সন্ধিরূপে স্বীয় অন্তরাত্মায় অনুভব করা—এ সকলই তাঁহার যথাযথ চলিতেছে।

শিশির সবিস্ময়ে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। কত বালক, যুবা প্রৌঢ় শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ করিতে আসিতেছে, কত বৃদ্ধ অপরাহ্ণে শ্রান্ত পদে ক্লান্ত চিত্ত বহন করিয়া আনিতেছে। অর্থার্থী, আরোগ্যার্থীরও শেষ নাই। কি সৌম্য দৃষ্টি, অক্লান্ত প্রসন্ন চিত্ত। শিশির কহিল, "তুমি যাও ত যাও,—আমি এখন যাব না।"

উমাকান্ত একদিন শচীকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার মাসি যখন তোমায় নিয়ে যান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বামীর বিষয়ের অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী দেবর কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। মেয়েটি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, বিবাহে তিনি আমার অনুমতি চেয়েছেন, আমারও আপত্তি হবে না লিখেছি।"

শচীকান্ত কিছু বলিল না, কিন্তু মনটা অপ্রসন্ন হইল। এ বিবাহ-প্রস্তাব সেও শুনিয়াছে, কিন্তু ইহা তার প্রেয় নয়। অবশ্য ইহাকে বিবাহ করিলে এক পক্ষে ভালই হইত, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে সে যখন নিজেকে এক জায়গায় মনে মনে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে, তখন অন্যত্র বিবাহ কিরূপে সম্ভব?

কর্ম্ম-চঞ্চল শরতের প্রভাতে সদ্যজাগ্রত পল্লীপথ ধরিয়া শচীকান্ত যখন তাহার মাসিমার গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখনও তাঁহার উদ্যানের শিউলিতলায় ঝুরোফুলের শয্যা পল্লী-বালিকাগণের বলয়-ঝঙ্কৃত হস্তের আলোড়নে বিত্রস্ত হইয়া পড়ে নাই, এবং শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলের শিরগুলি তাহাদের আল্‌তা-মাখা পদস্পর্শে নুইয়া পড়িতে তখনও বিলম্ব ছিল। দ্বারবান ছট্টু সিংয়ের মৃদু-স্বরে উচ্চারিত "হে গোবিন্দ রাখ অধম অবতু জীবন হারে" ইত্যাদি ভজনগান শুনা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া খাটিয়া হইতে শশব্যস্তে উঠিয়া মাথা নত করিয়া সে বলিল, "পরণাম বাবু" শচী ঈষৎ হাসিয়া উদ্যান পথে চলিল।

কল্যাণী আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "এতকালে ফেরা হ'ল? এসে পর্য্যন্ত ছটফট করে মরচি,—তোমার আসবার আর বারই হয় না।"

শচীকান্ত সংসারের মধ্যে বোধ হয় মণীশ ও কল্যাণীকেই সব চেয়ে ভালবাসিত। এই স্নেহময়ী বোনটির হাসিমুখের ছায়া তার জীবনের অনেক দিনের স্মৃতি-সুখে মিশান ছিল। তাহার এই স্নেহ-তিরস্কারে তাই সে অপ্রতিভ হইল। হাসিয়া কহিল, "সেই জন্যই ত এলাম রে! দেখ্‌চিস্ না, শিশির এখন আসবে না বল্লে,—তাই একাই পালিয়ে এসেছি। মাসিমা কোথায়?"

"মা ঘাটে গেছেন। সেই জন্যই এলে,—নইলে আরও দেরি করতে? তাই ত বলি বাপু,—বউ আনো, নৈলে ঘরে মন টিকবে কেন?"

শচীকান্ত কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল, "বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই ছান্‌লাতলায় বিদেয় কর্‌তে চা'স্!"

কল্যাণী তার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "না, না, এসো ভাই! ও সব কথা পরে হবে, কিন্তু এবার আর ভাজের মুখ না দেখে যাচ্চি নে, তা ব'লে রাখলুম। ঝাপ্‌টা গড়িয়ে এনেছি, বউ দেখব ব'লে!"

"বেশ করেছিস! যত্ন ক'রে তুলে রেখে দিস, চুরি না যায়।" শচী হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কল্যাণী ভ্রূকুটি করিয়া হাসিয়া বলিল, "যাও, তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা!"

গিরিজাসুন্দরী আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শচীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "কৈরে,—পশ্চিমে বেড়িয়ে গায়ে সারলি কই?"

"উঃ, সারিনি আবার! এই দেখ না—" বলিয়া শচীকান্ত কামিজের আস্তিন গুটাইয়া বাহু প্রদর্শন করিল। মাসিমা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "এবার ত সখ মিটেছে, বাছা? এইবারে বে-থা ক'রে সংসারী হও। তারাও ব্যস্ত হচ্চে,—আমিও আর দেরি করতে পারিনে।"

দ্বিপ্রহরে ফুটফুটে ছেলে কোলে কল্যাণী আসিয়া দাদার খাটের প্রান্ত দখল করিল। কিন্তু অপরিচিত মামার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল, কল্যাণী কহিল, "তোমাদের বেড়ানোর গল্প কর।"

শচীকান্ত বলিতে লাগিল—আর নাট্যশালার অভিনীত নাটকের এক একটা অঙ্কের মত সেই বিচিত্র দেশের বিচিত্র স্মৃতি কবির নিপুণ তুলিকায় সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চিরগৃহ বদ্ধা মুগ্ধা কল্যাণী শুনিতে শুনিতে পুলক বিস্ময়ে শতবার স্তম্ভিত হইল।

শচীকান্ত এবার কাব্য-কলা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছে। "মঞ্জু-গুঞ্জন", "ক্ষণিকের দেখা" পাতায় পাতায় পূর্ণ, তাহার উপর আবার শরৎকালের স্বর্ণরেণু মাখান রাঙ্গা 'আলোয় "শারদার" পৃষ্ঠাগুলিও ঝল্‌মল্ করিতেছে। সে লিখিতেছিল,—

"আজও কি গাহিছে পাখী তোমারি শিখানো গান?
চাহিয়া তোমার মুখে জগত পেতেছে প্রাণ?
বসন্তের রাণী তুমি, শরতও তোমারি পায়,
নিমেষে সঁপিয়া তনু আপনা বিকাতে চায়।

* * * *

আমি কতদিনে সখি! পাব তব দরশন?" ইত্যাদি

ঠুন্ করিয়া চাবির শব্দ হইল। চমকিয়া কবি মুখ তুলিল। হারে ভ্রান্ত কল্পনা! এক মুখ হাসি লইয়া কল্যাণী প্রবেশ করিয়াছে। শচীকান্ত বলিল, "কি রে? শিশিরের চিঠি এসেচে বুঝি? কখন আস্‌চে?"

"সেই ভাবনায় ত ঘুম হচ্চে না আমার!" বলিয়া সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "মা তোমায় ডাক্‌চেন,—কাকাবাবুর শ্বশুর তোমাকে দেখ্‌তে এসেচেন যে।"

শচীকান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "কেন বল্‌ দেখি—আমি এমন দর্শনীয় হয়ে উঠলুম? পশ্চিম বেড়িয়ে এসে আমায় কি আজকাল হাতি টাতি ব'লে ভ্রম হচ্চে না কি? না ভোজপুরী দরোয়ান?"

কল্যাণী সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, "এমন কথা কখ্‌নো শুনিনি। দাদা, তুমি যেন কি হচ্চ!" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। "কাকাবাবু কাকিমা মারা গেলে তাঁর শ্বশুরই ত বাসন্তীকে নিয়ে যান, তা তিনি বিয়ের আগে তোমায় একবার না দেখে কেমন ক'রে বিয়ে দেবেন?"

"না হয় দয়া করে নাই বা দিলেন?"

"ও কি কথা দাদা? গুরুজনকে কি অমন ক'রে বল্‌তে আছে? এস,—উঠে এস,—কাপড় টাপড় ছেড়ে নাও। তিনি ব্যস্ত হ'চ্চেন, বল্‌চেন—আজই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন।"

শচীকান্তর মুখ এবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। এ বিবাহ লোভনীয় ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মাসিমার বিষয়ের অর্দ্ধাংশ তা ছাড়া মেয়ের মাতামহও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সেখানে আদর আপ্যায়নের আশাও যথেষ্ট। মেয়েটি—বাসন্তী, দিব্য নামটি—সহসা এমন একটি নামও ত কই শুনিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু সেই যে বসন্তের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সে একদিন মাত্র দর্শন করিয়াছে, তার কাছে ধন মান নাম সকলই যে তুচ্ছ—সে মুখ যে ভুলিবার সাধ্য তার নাই। কল্যাণী তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার কহিল, "বাসন্তীকে দেখতেও বেশ,—খুবই সুশ্রী, ছোট্ট বোনটিকে আমার চতুর্দ্দোলে চড়্‌লে এমন মানাবে।"

শুনিয়া শচীকান্ত মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, "বউ বুঝি চতুর্দ্দোলা থেকে নাম্‌বে না? তার চেয়ে এক কাজ কর্‌ না,—একটা মাটির সখীকে সাজিয়ে তাকের উপর তুলে রাখ্‌, মনে কর্‌বি, ওই তোদের বউ,—যা, যা,—বল্‌গে যা, আমি বিয়ে করব না।"

এই সৃষ্টি-ছাড়া কথা শুনিয়া কল্যাণীর মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভদ্রলোক বাড়ীতে—এমন সময় বিবাহের বর বলে বিবাহ করিবে না!

একথা শুনিয়া গিরিজাসুন্দরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে এমন আহাম্মক আজকালের দিনেও কেহ জন্মায়? আসামীকে ডাকাইয়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের কত বিষয় জান?"

উত্তর হইল, "জানি"।"

"তোমারই জন্যে আজ সাত বচ্ছর ধরে নিজে সমস্ত তদ্বির তদারক ক'রে আস্‌ছি। ছোট বউয়ের বাপের হাতে কিছুতে দিইনি,—তা' জানো ?"

অপরাধীকে নীরব দেখিয়া তাঁহার মুখ রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "এমন সুযোগ ত্যাগ কর্‌লে চিরকাল ধরে পস্তাতে হবে, এ জেনে রেখো। বসন্ত এমন কিছু মন্দ মেয়ে নয়, যাতে তাকে তোমার মনে না ধরে। সব্বাই কি আর ডানাকাটা পরী হয়ে জন্মায় ?—কি বল ?"

শচীকান্ত তথাপি কোন উত্তর দিল না। সে নিজের মনের কাছে যে উত্তর পাইয়াছে, তাহা মাসিমার প্রশ্নের অনুকূল নহে। গিরিজা কঠিন নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মানুষের মুখে তার অন্তরের সমাচার সুস্পষ্ট লেখা থাকে, তাহা পাঠ করিতে অভিজ্ঞ পাঠকের বিলম্ব ঘটে না। তীব্র হতাশা দারুণ বিরক্তির আকারে চিত্তকে তাঁর একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। এই বোনপোটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া ইহার জন্য প্রাণান্ত খাটুনি খাটিলেন, আর সে কি না—অবহেলায় এই দারুণ পরিশ্রমলব্ধ ফল ছুঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। কোথাকার আহাম্মক! একটু সামলাইয়া লইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মত হ'ল, সেটা ব'ল্লে হত না ?—ভদ্রলোক অনর্থক ব'সে আছেন।"

শচীকান্ত এবার কথা কহিল, নত মুখে বলিল, "আমি জানি, তুমি আমার জন্য অনেক করেচ, মাসিমা! আর এতে আমারই মঙ্গল, তাও জানি, কিন্তু আমার এ বিয়ে কর্‌বার উপায় নেই। কি কর্‌ব বলো ?"

গিরিজাসুন্দরীর ক্রোধ ঘোর বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হইল। কহিলেন, "উপায় নেই—মানে ?"

"অনেক দিন আগে হতে অন্যত্র বাগ্‌দত্ত হয়ে আছি।"

"কই এমন কথা এতদিন তো শুনিনি!" মাসিমার ক্রোধপাংশু মুখ ঈষৎ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল। শচী নতনেত্রে কহিল, "আমি লজ্জায় কারুকে ব'ল্‌তে পারিনি, মাসিমা, পাছে তুমি রাগ কর সেই ভয়েই বলিনি।"

গিরিজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তুমিও যেমন আমার বাসন্তীও তেমনি। তোমার মত যখন নেই, তখন কি আর বলবো? থাক্

কাজ নেই। জবরদস্তি করে তাকে আমি যদি দুঃখের মধ্যে টেনে আনি তো সে পাপ! আমি তা কর্ব্বো না। মা বাপ হারা মেয়ে সে যেন বরের হাতে সুখ পায়।'

বাসন্তীর মাতামহকে কহিলেন, "ভেবে দেখ্‌চি, শচী ও বসন্তে বয়সের তফাৎটা বড্ডই বেশী হবে, মেয়েও আমার তেমন বাড়নসই নয়, তখন না হয়—থাকগে,—কাজ নেই। আপনি কি বলেন? প্রায় দশ বছরের ছোট বড়।"

মাতামহ ইতঃপূর্ব্বেই নিজের ইচ্ছামত একটি পাত্র স্থির করিয়াছিলেন, গিরিজাসুন্দরীর ভয়েই তাহা ফুটিতে পারেন নাই, খুসি হইয়া বলিলেন, "ছেলেটিকে বারান্দা হতে দেখলাম, আমারও তাই মনে হল বটে! তা মা! তুমি তো এখন ওর মা, ওর পক্ষে যেটা ভাল বুঝবে তাই কর্ব্বে।"

মনে মনে বিস্ময়ের সহিত এই মহীয়সী নারীর নির্ম্মল কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। একি সামান্য ত্যাগ! এ' কে পারে?

চব্বিশ

ব্যাপার চুকিল বটে, কিন্তু অনেকখানি বিপর্যায় ঘটাইয়া গেল। যে মুহূর্তে শচীকান্ত এ বাড়ীর কনিষ্ঠ জামাতৃ পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইল, সেই হইতে তাহার আসন যে এখানের জমি হইতে অনেকখানি নীচে নামিয়া পড়িয়াছে এ কথাটা শচীকান্তর বুঝিতে বাধে নাই। বাসন্তীর বিষয় অল্প নয়, আর বিষয়ও নিখরচা, মাসিমার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্তে তাহা সুরক্ষিত ও অর্থপ্রসূ। মেয়েটিকে গ্রহণ করিলে, লক্ষ্মীকে ঘরে আনা হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনের মধ্যে দ্বিধার একটা প্রবল সংগ্রামও চলিতেছিল। মাসিমা প্রথম হইতেই তাহাকে এ আভাস দিয়া আসিয়াছেন। এ পক্ষে তাঁর কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। সেও অনেকবাব এই ক্ষুদ্র বাসন্তীকে নিজের ভবিষ্যৎ প্রিয়ার পদে অভিষেক কল্পনা করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু হায়,—সমস্ত কবিতা সমুদয় কল্পনা যে সেই একখানা চকিতে-দেখা মুখ অধিকার করিয়া লইয়াছে। কেমন করিয়া সে তার হারাণ চিত্তকে খুঁজিয়া আনিয়া অপরকে দান করিবে?

জগতে যত অদ্ভুত বস্তু আছে তার মধ্যে কবি-চিত্তই বোধ করি, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর! ক্রুদ্ধ সমুদ্র-তরঙ্গের উন্মাদ তাণ্ডব, ভীষণ ঝটিকার সৃষ্টিসংহারিণী মূর্ত্তি যাদের চক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করে, তাদের চিত্তে সহজ সরলের চেয়ে দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্যই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আকাশে ফাঁদ পাতা,—তারকার মালা গাঁথা,—সাগর ছেঁচিয়া রত্ন আহরণ করার মত একটা অসম্ভব উদ্ভট কল্পনার উপর নিজের সমুদয় ভবিষ্যৎটাকে এক কথায় নিঃসার করিয়া নিঙড়াইয়া ফেলিতে একমাত্র স্বপ্নপরায়ণ কবি ভিন্ন জগতের আর কেহই বোধ হয় পারে না। কবি যেখানে মধু মক্ষিকার গুঞ্জন-গানে ভাব-বিভোর, সাংসারিক সেখানে মধুচক্রের মধু আহরণে নিরত। কবি-শচীকান্ত তার নিরুদ্দিষ্টা প্রিয়ার স্মৃতিকে এত যে বড় করিয়া দেখিল, কারণ তাহা না হইলে কল্পনার সহিত বাস্তবের দ্বন্দ্ব বাধে না, জীবনটা নিতান্তই গদ্যময় হইয়া উঠে, সাধারণের সঙ্গে সমান হইয়া যায়।

সন্ধ্যালোক-বিস্তৃত বারান্দায় স্বহস্ত-সজ্জিত ফুলগাছের টবগুলার নিকট একখানা চৌকিতে বসিয়া শচীকান্ত ভাবিতে লাগিল। আকাশ ভরিয়া নক্ষত্র উঠিয়াছে, তাহারা তার চিন্তা-ভারাকুল মস্তকের উপর নীরব উপহাসের হাসি হাসিয়া জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ পবন তার মনের বার্ত্তা বহন করিয়া কচি কিশলয়গুলির কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া হয়ত কি বলিতেছিল। গাছের ডালে "পিউ—কাঁহা" রবে পাপিয়া সুর সাধনা করিতেছে। কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইল। আজিকার ব্যাপারে সে একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নিজের ঘরে আসিয়া যখন খোকার জন্য তুঁ কাটির গলাবন্ধ বুনিতে বসিয়াছে, এমন সময় গিরিজাসুন্দরী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সব ত শুন্‌লে, এখন শচীর মনের কথা জেনে যা হয় একটা বিলি ব্যবস্থা করে ফেলো। এত দিন বল্লেই ত বাপু চুকে যেত। এখনকার ছেলেপিলেরা গুরুজনের কাছ থেকে সব কথা লুকোতেই তো ভালবাসে। সেই না হয়েছে মুস্কিল! এখন দেখ খবর নিয়ে কা'কে আবার উনি কথা দিলেন। বেহ্ম না খিরিস্তান, অজাত না কুজাত, কি আবার তিনি?

কল্যাণী মাকে চিনিত, তিনি যখন যেদিকে ঝোঁক দেন, পুরাপুরি একটা ব্যবস্থা না করিয়া ছাড়েন না। তবু সে সাহস করিয়া বলিল, "দাদাকে ভাল করে বুঝিয়ে মত করালেই ভাল হয় না, মা? বাসন্তীকে বিয়ে করলে ওঁর পক্ষে সব দিকেই ভাল হত।"

মাতা ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন, "সে কথা আমিও জানি, সেও জানে; কিন্তু যখন আগে থেকে অন্য লোককে কথা দিয়েচে, তখন সে কথার কি দাম দেবেনা? মানুষের কথা তো নড়ে না। বেশত, তুমি ওকে জিজ্ঞাসা পড়া করোনা। আর যদি না করে তোমার থেকে কিছু ওকে দিতে হবে আর কি! তা হোক, ঈশ্বরের কৃপায় তোমারও ত আর কিছুরই অভাব নেই।"

কল্যাণী আসিয়া ডাকিল, "দাদা—"

"কে? কল্যাণ, আয়!" একটা চৌকি টানিয়া লইয়া শচীর পাশে সে বসিল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। আজিকার ব্যাপারে এখানকার সকলের নিকটেই শচীকান্ত একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। কল্যাণীও একটা বাধার হাত

ছাড়াইতে পারিতেছে না,—কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে, দাদা তাহাকে ত কিছুই বলে নাই। অনেক ভাবিয়া অবশেষে বলিল, "তবে কি ভাজের মুখ না দেখেই আমায় চলে যেতে হবে,—দাদা? জানো ত গেলে আর সহজে আমার আসা ঘট্‌বে না।"

কল্যাণীর স্বরে শচীকান্ত ব্যথা পাইল। সলজ্জভাবে তার দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "কি করি কল্যাণ? উপায় কৈ?"

কল্যাণী সূত্র পাইয়া কহিল, "বেশ,—তবে সেই মেয়েকেই বিয়ে কর। মার ত আর তাতে অমত নেই। কে সে সব খুলে বল, ব্যবস্থা করি আমরা।"

শচীকান্ত চুপ করিয়া রহিল। তার মনের স্মৃতির তরঙ্গ গভীর আবেগে উচ্ছলিয়া হৃদয়-তটে আঘাত করিতেছিল। ব্যাকুল চিত্ত স্ফীত বক্ষ সমুদ্রের মতই আর্ত্তস্বরে কহিতেছিল ওরে কোথায় সে?—সে কোথায়?

সহসা একটা কথা কল্যাণীর মনে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "তার নাম কি রাণী?"

"কে বল্লে?"—শচী ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল।

"তোমার অনেক কবিতায় দেখছিলুম 'রাণী' নামটা আছে,—

"বজ্রানল লিখে যায় পাষাণে যে রেখা রাণি,
মুছিতে কি পারে তাহা শত বরষার ধারা?"
"আয় রাণি, দে'যা দেখা, ভাঙ্গি স্বপনে ভুল,
ক্ষণিক মিলন হোক্‌ চির অনুকূল।—"

এমনি কতকগুলো কবিতায় পড়েছি।"

শচীকান্ত ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল। চাঁদের আলো সেই অতীত দিনের প্রভাত-রৌদ্রের কথা মনে পড়াইয়া দেয়! অস্ফুট-স্বরে প্রীতি বিহ্বল কণ্ঠে সে কহিল, "নাম তার কমলা" বলিতে সর্ব্বশরীর যেন তড়িৎ স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল।

"কমলা! বেশ নামটি ত! কাদের মেয়ে গো, সে, হ্যাঁ দাদা? দেখতে সে বুঝি খুব সুন্দর? তেমন রূপ বুঝি আর কখনো দেখনি? না?"

"সুন্দর বলে থামলে তাকে অপমান করা হয়! সে রূপ কল্পনার অতীত!"

কল্যাণী চমৎকৃত হইল, কহিল, "তবে আর দেরি কেন কর্‌ছো বাপু!

ও দাদা ? লক্ষ্মী ভাই ! শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়ে করে তাকে ঘরে আনো, লক্ষ্মীটি দাদা ! আমার তাকে বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করচে। নিশ্চয় তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হবে।"

"সে কোথায় কল্যাণী ? তাকে কোথায় খুঁজে পাব ? অভিশপ্তা কমলার মত সে কোন্ অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে, কে আমায় তা' ব'লে ?"

কল্যাণী এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিতে পারিল না, সভয়ে বলিল, "ওমা সে কি বেঁচে নেই নাকি ?"

"না, না, সে বেঁচে আছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে, আমি সে কথা ত বলিনি।"

হাঁফ্ ছাড়িয়া কল্যাণী কহিল, সর্ব্ববক্ষে। তাই বল,—তবে কি হয়েচে ?"

তখন শচীকান্ত সকল কথাই তাহাকে খুলিয়া বলিল—কেবল মাত্র তারা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সেইটুকুই সে ভাঙ্গিতে পারিল না। অজ পাড়াগাঁয় এতটুকু গাঁই গোত্রেরই ত্রুটী কেউ সয় না, তা আবার অন্য শ্রেণী।

শুনিয়া কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, কহিল, "তবে ত তাকে খুঁজে পাবার কোন আশা দেখিনে'—ছোটদা ! কতদিন হয়ে গেল, কোথায় তারা গেছে, কে' জানে। এত দিনে তার বিয়ে হয়েছে কি না, তাই বা কে' বলতে পারে ?"

কল্যাণী সহসা একটু অস্ফুট ধ্বনি শুনিল, "ও কথা বলিস্‌নে, কল্যাণি ! আমি জানি নিশ্চয়ই তাকে পাব আমি। আমার মন বলে সে আমারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কর্‌চে।"

কল্যাণী মুখ তুলিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল, প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় দুই স্নেহপূর্ণ নেত্র সেই মুখে স্থাপিত করিয়া স্নেহ-তিরস্কারের সহিত কহিল, "না ছোটদা ! অমন ক্ষ্যাপামী করো না। কোথায় কমলা তার ঠিক নেই,—তুমি বাসন্তীকে বিয়ে কর। পৃথিবীটা সত্যিকাবের, এটা ত গল্পের কেতাবের তৈরি করা নয়। সে মেয়ের এখন প্রায় কুড়ি বছরের উপর বয়স হয়ে গেল, সে কক্ষণো এতদিন আইবুড় নেই, নেই, নেই !"

শচীকান্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল। কল্যাণীর কথাগুলায় অখণ্ডনীয় সত্যের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল; ইহাকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায় না, তাই সে ঔদাস্যের দ্বারা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা

করিল। কিন্তু কল্যাণী তার মৌনকে সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উঠিয়া গেল।

গিরিজাসুন্দরীর প্রকৃতি সাধারণের চেয়ে কতকটা বিভিন্ন। কল্যাণী যখন আসিয়া জানাইল শচীকান্ত বাসন্তীকে বিবাহ করিতে সম্মত, তখন তাঁর ত্ত হইতে এই ঈপ্সিত বিবাহ সম্বন্ধে সমুদয় আকর্ষণ সরিয়া গিয়াছে, দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "আর হয় না!—সবিস্ময়ে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

"ভদ্রলোককে 'না' বলে যখন ফিরিয়ে দিয়েছি, আবার কোন্ মুখ নিয়ে তাঁকে আমি ডাক্‌তে যাব? ওর পছন্দ মেয়ে না পাওয়া যায়, অন্যত্র বিয়ে হোক গে,—কথা আমি গুরুজনের কাছে বারে বারে বদলাব না।

গিরিজাসুন্দরীর দেবর কন্যাকে প্রত্যাখ্যান কবার দিন হইতেই শচীকান্ত নিজের জন্য কতকটা চিন্তিত হইয়া পড়িল। বসিয়া থাকিলেও চিরদিন চলিতে পারে, এমন উপায় যখন সে ত্যাগ করিল, তখন কিছু ত একটা উপায় করা চাই। 'ক্ষণিকের দেখা' যন্ত্রস্থ—বিপুল উদ্যমে সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপনের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু এদেশে এমন সময় আসে নাই যে, লোকে কাব্যকে চিনিবে, আদর করিবে, অর্থ ঢালিয়া দিবে। তবে কি উপায়? চাকরি? অধীনতা? এই শান্ত পল্লীভবনের বাধাহীন বিশ্রামের সুখ ধ্বংস করিয়া কর্ম্মকোলাহল ক্লান্ত সহরের বদ্ধ গৃহে অভাব-অনটনের মধ্যে আত্ম-নির্ব্বাসন! বড় কঠিন ত্যাগ—তবু দিনের পর দিন তাদের বিদায়-কালে বলিয়া যাইতেছিল,—পথ খুঁজিয়া লও, আর কতদিন বসিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবে?

মাসিমার কাছে কোন অছিলায় বিদায় লইয়া সে কলিকাতা যাত্রা করিল। কলেজে থাকিতে যেসব ছেলের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, দুই একজনের সঙ্গে চিঠি পত্রও চলিত, তাদেরই মধ্যে একটি যুবক সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, বন্ধুকে সাদরে সে গ্রহণ করিল। এই ঘটনা সহসা শচীকান্তকে যেন জাগ্রত করিয়া দিল। মনে পড়িল, কাশীর সেই জ্যোতিষী তাহাকে বলিয়াছিল, "তুমি হাকিম হইবে।"—কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। মনের সহিত যখন মিলিয়া যায় তখন অতি

ক্ষুদ্রতমের উপদেশ বা আদেশ আমরা গ্রহণ করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু মন যখন নিষেধ করে দেবাদেশও তখন পরিত্যজ্য বোধ হয়।

শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনে সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিল। নারী হস্তের মত কোমল স্পর্শে শচীকান্ত চকিত হইয়া চাহিতেই একখানা অত্যন্ত পরিচিত সানন্দ মুখ তার বিস্মিত দৃষ্টিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, এ যে মণীশ!

মণীশকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। তার হাস্যময় চক্ষু প্রীতি-বিকশিত,—পূর্ব্বাপেক্ষা মুখের ভাবটী যেন উদারতর হইয়াছে, যৌবনের পূর্ণ তেজ একটি সলজ্জ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া তার উপর একটা স্নিগ্ধ আলোর রেখাপাত করিয়াছিল। শচীকান্ত আজ তাহার চিরদিনের বন্ধুকে যেন নূতন করিয়া দেখিল।

মণীশ কহিল, "বাড়ী চল,—আজ আর ছাড়চিনে। কতদিন পরে দেখা হল।"

শচীকান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসম্মত হইতে পারিল না। মায়ের মৃত্যুর পর যখন কাশীর ফেরত সে বাড়ী আসিল, বড় বধূর ব্যবহার ভাল লাগে নাই। মা হারাইয়া সে বুঝিয়াছে, সেই দরিদ্র গৃহে মা তার জন্য কতখানি যোগাইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে, বড়বধূরও বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না, গরীবের ঘরে মা তাঁর ছেলেটির সুখের জন্য যাহা পারেন, সাধারণে পরিবারের একজনকে সেটুকু যোগাইবে কিরূপে?

গাড়ীতে উঠিয়া শচীকান্ত কহিল, "তোমার 'হিন্দু-বিজ্ঞান' বইটার ত খুব নাম হয়েছে হে—দেখলুম, মস্ত বড় সব পণ্ডিতের দল প্রশংসা-পত্র দিয়েচেন। ও কিন্তু বৃথাই সময় নষ্ট করেছ, মণীশ! সাধারণের কাছে নাম নিতে চাও ত কবিতা লেখ, গল্প লেখ, পার,—নাটক লিখে অভিনয় করতে দাও,—দু দশটা পণ্ডিত-ভট্‌চায্যির সীমায় যে যশ বদ্ধ রহিল, পেঁটরায় পোরা জহরতের মতই শুধু সে নিজস্ব।"

মণীশ অন্তরে ব্যথা পাইল। সে এই পুস্তকখানির জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছে। সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বয়ং ও তার খুল্লতাত এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শচীকান্ত এতখানি কঠোর অবজ্ঞার সহিত এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিল! সে কহিল, "সাধারণের কাছে যশ পাওয়াই কি লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য?"

"তা বই আর কি? একমাত্র আত্ম-বিনোদন,—আর যদি ভাগ্যে থাকে ত ঐ খ্যাতি। তা সে কথা এখন থাক্—তারপর মনীষার খবর কি? না, না, বড় অন্যায় হচ্ছে, আর দেরি না।"

মণীশ কোন মতে নিজের লজ্জাটা ঠেলিয়া রাখিয়া কহিল, "আমিও ত সেই কথাই বল্‌চি, আর দেরী করা মানায় না, কবিকুঞ্জ কি শূন্য থাকা সাজে?"

"কবিকুঞ্জ শূন্য নেই মণীশ তা ঠিক পরিপূর্ণই রয়েছে। এ অসম্পূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণ,—বিচ্ছেদেও সে মিলিত হারাণ রতনের স্মৃতির মন্দির,—এ কমলার কমলাসন!"

"কার?"

"কমলার।"

"কমলার?"—মণীশ চমকিয়া উঠিল। কে?—কে? কমলা কে?" তাহার স্বর ঘোর সন্দিগ্ধ।

শচীকান্ত কহিল, "কেন? তোমায় কি তার নাম বলিনি আমি? কমলাতো তার নাম। কমলবাসিনীই আসল নাম।"

মণীশ মুক্তশ্বাসে মৃদু মৃদু কহিল,—"তাই বুঝি?"

পঁচিশ

বাড়ী ফিরিয়া মণীশ দেখিল, সমস্ত গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে,—খুড়িমা বাড়ী নাই। ত্রিবেণীতে করুণাময়ীর পিত্রালয়। বহুদিন সেখানে বড় একটা যাতায়াত ছিল না, মা বাপ কেহই বর্ত্তমান নাই। একদিন সংবাদ আসিল, তাঁর বড় ভাই কর্ম্মস্থল হইতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন, ভগিনীকে দেখিতে চাহেন। শিবনারায়ণ তৎক্ষণাৎ স্ত্রী পুত্র সঙ্গে শ্বশুর গৃহে যাত্রা করিলেন, কিন্তু কমলাকে লইয়া যাওয়া চলে না, যদিও সেখানে কমলারও মাতুলালয়, কিন্তু কেহ সেখানে আছে কি না জানা তো নাই, অগত্যা বিন্ধ্যবাসিনীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মণীশ তাঁদের অবর্ত্তমানে শূন্য গৃহে বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন বোধে শীঘ্র ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া স্ব-প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিতে বাহির হইল। তাহার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীপতি বাবু ইহার তদারকভার গ্রহণ করিয়াছেন, শিবনারায়ণ ও ভক্তিনাথ এরাও ইহার কার্য্যভার অংশতঃ বহন করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

দ্বিপ্রহরে শচীকান্ত মধ্যাহ্ন-নিদ্রা ব্যতীত দিন কাটাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রালস দৃষ্টি সম্মুখের মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে প্রসারিত করিল। হেমন্ত প্রকৃতি ইতঃমধ্যেই জড়ভাব ধারণ করিয়াছেন, দ্বিপ্রহরের হাওয়া ঈষৎ রুক্ষ কিন্তু তপ্ত নহে, অলস চিত্তে ঈষৎ জড়তা বহাইয়া দিয়া মন্দ গতিতে সে বহিতেছিল। পাশের অঙ্গনে পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে শয়ন পূর্ব্বক মুদ্রিত নেত্রে রোমন্থন করিতেছে, কোথায় একটা অদৃশ্য চক্রের স্থিতি-বারতা মধুমক্ষিকাদলের ভাসিয়া-আসা গুন্ গুনানিতে বহিয়া আনিতেছিল, শচীকান্ত জানালার ধারে আসিয়া পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে চাহিল। বীচি-বিক্ষেপ হীন স্থির সমুদ্রের মত অনন্ত নীল স্বর্ণাভ রৌদ্রে বৃহৎ নীলকান্ত মণিখণ্ডের মতই জ্বলিতেছে, একটি পিপাসাতুর পক্ষী দূর হইতে সরোবর লক্ষ্যে উড়িয়া আসিতেছে, দুই

একটি বন্য কপোত বৃক্ষশাখায় ক্লান্ত পক্ষ ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছে,—পশ্চাতে ঈষৎ কি যেন একটা মৃদু শব্দ পাইয়া শচীকান্ত মুখ ফিরাইল,—কিন্তু এ কি! পৃষ্ঠবিলম্বী কৃষ্ণকেশভার মধ্যবর্ত্তিনী এ মূর্ত্তি কার?

তাহার ধমনীর শোণিত প্রবাহ নিশ্চল হইয়া গেল। পরিপুষ্ট মুকুল প্রস্ফুট কুসুমে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহাকে চিনিতে তার বাধিল না। সেই স্থির বিদ্যুদ্দামতুল্য যুগল নেত্রতারকা, দীর্ঘ দিনের অদর্শনেও অবিস্মৃত সেই মধুরতম মুখভাব। এ যে তার সেই হারান-রতনেরই জীবন্ত প্রতিকৃতি! সর্ব্ব শরীরের স্নায়ুগুলা এমনই স্তম্ভিত হইয়া গেল, যে, ভাল করিয়া তার দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তিনীর চির-ঈপ্সিত মুখের উপর ধরিয়া রাখিতেও পারিল না। গভীর স্বরে কহিতে গেল,—"এতদিনে দেখা দিলে কি? এলে কি তুমি?" কিন্তু একটা অর্দ্ধস্ফুট স্বর মাত্র তার কম্পিত ওষ্ঠাধরের গণ্ডী অতিক্রম করিল। পরক্ষণে সে যখন জোর করিয়া স্বতঃ নত যুগল নেত্র উত্তোলন করিল, তখন কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইল না! সম্মুখের মুক্ত দ্বার পথে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খর করজালে চোখ ধাঁধিয়া উঠিল মাত্র। শচীকান্ত মূঢ়ের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তনেত্রে মেলিয়া ভাবিল,—মরুভূমে মরীচিকার মত সে এ'কি দেখিল? জাগিয়াও কি স্বপ্ন দেখা যায়?

কিন্তু নিজের দৃষ্টিকে সহজে অবিশ্বাস করাও চলে না। এক সময় সে গৌরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কে এখানে বেড়াতে এসেছিল রে?" গৌরী মাথা নাড়িল, কহিল, "না ত, কেউই ত না।"

"তুই ঠিক জানিস্, কে-উ আসে নি?"

"খুব জানি,—কেউ না।" শচীকান্ত নীরব রহিল। কল্পনা কি প্রভাতকে মধ্যাহ্নে পরিবর্ত্তিত করিতেও সক্ষম! এ সেই—কিন্তু সে বালিকা ত নয়!

সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে দুই বন্ধুতে স্ব স্ব স্থানে যাত্রা করিল। শচীকান্ত আজ অত্যন্ত চুপ্‌চাপ্। মণীশ বহুক্ষণ পরে এক সময় চেষ্টা করিয়া কথা কহিল, বলিল—"তোমায় আমার একটা কথা বলা হয় নি, শচী।"

শচীকান্ত নিরুৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা?"

স্বরে কৌতুহলের লেশমাত্র ছিল না। মণীশের কথা এমন কি হইতে পারে?

মণীশের চোখে মুখে অতি কোমল মৃদু হাসি সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে নতনেত্রে কহিল, "মনে করেছিলাম, খুড়িমার কাছেই শুন্‌বে, তাই আর কিছু বলিনি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে কাশীর ঘটনাটা যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে বলিয়া গেল। নিজের কথা সে কিছুই বলিল না। কতকটা লজ্জায়, আর কতকটা বন্ধুর তামাসার ভয়ে নিস্পন্দ থাকিয়া শচীকান্ত সকল কথা শুনিল, তার পর শুধু প্রশ্ন করিল, "মেয়েটির নাম?"

মণীশ মৃদু হাসিল, কহিল, "এরও নাম কমলা।"

অকস্মাৎ শচীকান্তর বক্ষে মস্তকে সর্ব্ব শরীরে যেন সহস্র সহস্র জ্বালাময় বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। রুদ্ধ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে এখন কোথায়?"

"তোমাদের বাড়ী খুড়িমা তাকে রেখে গেছেন, শুনলুম। তোমার হারানো কমলাকে যদি খুঁজে পেতে ত' বেশ মজা হত, শচি—"

গাড়ীর কম্পিত আলোক অকস্মাৎ যেন জ্যোতিঃহারা হইয়া গেল। মন্দগতি লৌহযান সদর্পে প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। কুলি হাঁকিল, "শেয়ালদা, শেয়ালদা—"

মণীশ নামিয়া গেল। একটা বিদায় সম্ভাষণও সে বন্ধুর নিকট হইতে পাইল না। ক্ষুব্ধচিত্তে ধীর পদে সে চলিয়া গেল। তখন নির্জ্জন কক্ষের অনাবৃত ভূমে বিদ্ধ বন্যজন্তুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িয়া শচীকান্ত আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "কমলা! কমলা।" সেই মর্ম্মভেদী হতাশার আকুল ক্রন্দন জনহীন দারু কক্ষে পুনঃ পুনঃ আহত হইল মাত্র।

ছাব্বিশ

হেমন্তের শুভ্র জ্যোৎস্না ফুরাইয়া আসিয়াছে। আসন্ন শীতের আশঙ্কা জীব-জগতের নিম্নোচ্চ সর্ব্বস্তরেই অল্প বিস্তর প্রকটিত। গৃহস্থ রমণীরা সম্বৎসরের সঞ্চিত ছিন্ন বস্ত্র বিছাইয়া রঙ্গীন পাড়ের সূত্রদ্বারা তাহার উপর বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তখনও পল্লীগ্রামে জর্ম্মণির সস্তা র‍্যাপারের প্রচুর আমদানি হয় নাই।

শুক্ল পক্ষ চলিয়া যায়। নূতন চালে নূতন গুড়ে নবান্ন ক্রিয়া সাঙ্গ হইবার পর ঘরে ঘরে তখন বড়ি দিবার শঙ্খ-ধ্বনি উঠিতেছিল। প্রতি ছাদে শুভ্র বস্ত্রে দূর্ব্বা-সিন্দুরে সজ্জিত কুমড়া কোরার "বুড়া-বুড়ি" দোদুল্যমান। পল্লীবালকগণ এখানে সেখানে জড় হইয়া তালের 'কল' কাটিয়া খাইতেছে, কালীপূজার অবশিষ্ট দুই একটা আছাড়ে-পট্‌কার শব্দে সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের আমল চকিতে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

গৌরীর বিবাহ আসন্ন। ভট্টাচার্য্য-গৃহে আয়োজন চলিতেছে। পাড়া পড়সীরা অবসরমত জুটিয়া বাড়ীর লোকের সহিত ডাল বাচিতেছে, সুপারি কাটা, সলিতা পাকান, মসলা-ঝাড়া প্রভৃতি সমুদায় খুঁটিনাটি কাজগুলা সারিতে সারিতে গল্পের মজলিস জাঁকিয়া উঠিয়াছে। যে যেমন লোক, সাধ্যমত সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত ছিল না। পুরোহিতগৃহের কর্ম্মে সকলেরই হাত পড়া চাই।

বিন্ধ্যবাসিনীর আজকাল অবসর বড় কম। তথাপি তাঁর মৌন হৃদয়ে কি যে একটা শত মণ ভারি চাপিয়া আছে, সে পাষাণখানা কোন মতেই যেন নড়িতে চাহে না। চোখের জলে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্ত চুল্লী হাঁড়ি কুড়ি সমেত ঝাপ্‌সা হইয়া উঠে।

গৌরী নিজের বিবাহের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিদ্রোহ করিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎসবের আয়োজনটা তাহাকে হয়ত বিবাহ সম্বন্ধে একটু কৌতূহলীও করিয়া থাকিবে।

যেদিন পাত্র আশীর্ব্বাদ করা হইবে, সেইদিন হইতে চতুর্থ দিবসের

প্রথম প্রহরে বিবাহ-লগ্ন। গৌরীকে সে দিন কোন শাসনই আটক করিতে পারিল না, এক সময় সে কাঁখের ছেলেটাকে ভূমে নামাইয়া কর্ম্মে ব্যস্ত অভিভাবিকাদের মাঝখান হইতে সরিয়া পড়িল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চারিদিক তখন ঝাঁঝাঁ করিতেছে, রাজপথ প্রায় জনহীন, কেবল একটা গৃহস্থ গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিন্ন গ্রামের একজন ভিক্ষার্থী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"কোথায় ছিলি ও নীলমণি,
আয়রে বুকে আয় !
নয়নমণি হারিয়ে আমার নয়ন জলে বুক ভেসে যায়,
ওরে, নয়ন জলে বুক ভেসে যায়।

গৌরী সহসা শুনিল, তাব পিছনে, খুব নিকটে কে বলিল, "উমাকান্ত সার্ব্বভৌম মশায়েব বাড়ী কোন দিকটায় বল্‌তে পার মা ?" সে এই মাতৃসম্বোধনে নিজেকেই সম্বোধিত বোধে ফিরিল কিন্তু পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় একটু ভীতও হইল। এখনই কেহ দেখিলে বাড়ীতে খবর দিয়া দিবে। কয়েদ-খালাসী দাগী চোরের উপর পুলিশ যেরূপ সন্দেহ-সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাড়াশুদ্ধ লোক আজকাল এই বিবাহ-পণবদ্ধা মেয়েটির উপর তেমনই কঠোর পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি রাখিযাছে, কি না ! গ্রামের নিকটবর্ত্তী বর, পাড়ার মেযের নিন্দা উঠিযা বিবাহ ভাঙ্গিলে সকলেরই তাহাতে অপমান। তাই স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত নরনারীগণ বড়বধূর গুপ্তচরের কাজ লইয়াছেন। একজনেব নিকট হইতে খবর গিযা পৌছিতেছে, অমনই তাহার উপর লাঞ্ছনাব ঝড় বহিতেছে। যাহারা সর্ব্বদা তিরস্কার সহে তাহাদের ইহাতে অপমান বোধও কমিয়া যায়, গৌরীর পক্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। গঞ্জনা যত বৃদ্ধি পাইতেছিল, ততই তাহার রোখও চড়িয়া উঠিতেছে।

যে ব্যক্তি পিছন হইতে তাহাকে সম্বোধন করিলেন, তিনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বেশভূষার তেমন পারিপাট্য না থাকিলেও প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ললাটে চিন্তার ছায়া রেখাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উচ্চ হৃদয় বৃত্তির চিহ্ন পরিব্যাপ্ত উজ্জ্বল

নেত্রতারকার মধ্যেও সেই সুগভীর চিন্তা বিষণ্ণতার আকারে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। সে মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের চিত্ত মুহূর্ত্তে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। গৌরী দেখিল, এ ব্যক্তি তাহার অপরিচিত! বোধ হয় ভিন্ন গাঁয়ের লোক হইবে, নহিলে তাহার অচেনা হইত না। নূতন লোক কে আবার তার দাদামশায়ের বাড়ী খুঁজিতেছে? তারা নয়। একবার ইচ্ছা হইল, ভুল পথ দেখাইয়া দেয়! কিন্তু তখনই লজ্জা বোধ হইল। দাদা-মহাশয় মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন যে। সে দক্ষিণে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া কহিল, "এই দিকে।"

আগন্তুক প্রথমে মেয়েটির দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই, এখন মাথা তুলিয়া কহিলেন, "অনেকদিন আসি নি কি না, তাই পথ ঠাহর করতে পারছিলাম না। তাঁরা এখানে আছেন ত?"

গৌরী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বিরক্ত হইল। এখনই কে আসিয়া পড়িবে—আজ তাহার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ! তথাপি মনে কি একটা কৌতূহল জাগিল এবং ভাবী শ্বশুরবাড়ীর কেহ নয় বুঝিয়া প্রসন্ন চিত্তে কহিল, "আপনি তাহলে অনেক দিন আগে এখানে আস্‌তেন? দাদু ত এখন এখানে থাকেন না, শুধু বড় মামা থাকেন। তিনিও আজ বাড়ী নেই।"

আগন্তুক এই কথা শুনিয়া স্থিরনেত্রে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। গৌরী চোখ তুলিতেই তাঁহার দুই নেত্র তারকা ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি নত করিয়া একটু দুঃখিতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি—ভক্তিনাথ, কোথা গেছেন?"

"তিনি—" বলিয়া গৌরী একটু থামিল, "সে একটা কাজে গেছেন।" বলিয়াই সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। "শীগ্‌গিরই আসবেন। আসুন না। আমি বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি—" বলিতে বলিতে সে গলির মধ্যে অগ্রসর হইল।

আগন্তুক আর কিছু বলিলেন না, নীরবে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া কি যেন একটা বহুদিনের হারান স্মৃতিকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেন কি একটা মনে পড়িতেছিল, অথচ সেটা সম্পূর্ণ স্মরণও হয় না।

সহসা গৌরী তার কাঁধের উপর কাহার মৃদু স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিল।

আগন্তুক উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিলেন। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই বাড়ীর মেয়ে? কি বল্লে মা,—সার্ব্বভৌম মশায় তোমার কে হন?"

"দাদু? আমার দাদামশাই হন।"

"ভক্তিনাথ তোমার মামা বল্লে বুঝি?"

"হ্যাঁ।" বলিয়া গৌরী একটু দ্রুতপদে চলিল। দূর হইতে বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। আগন্তুকও তাহার দেখাদেখি নিজের মৃদু গতি একটু বর্দ্ধিত করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে দুই চারিবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার তিনি কহিলেন, "তাহলে তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্রী?"

দৌহিত্রী বলিতে কি বুঝায়, সে কথা গৌরী অত জানিত না। সে নীরব রহিল। গতি একটু হ্রাস করিয়া ঈষৎ ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্নকর্ত্তার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল। তাঁহার ব্যগ্র দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ব্যাকুল স্নেহের ক্ষুধা অভিব্যক্ত হইতেছিল। তিনি তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া হঠাৎ গতি বন্ধ করিয়া তাহার একখানা ক্ষুদ্র হাত নিজের হস্তে ধারণ করিলেন, কহিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

অপরিচিতের এ ব্যবহার গৌরীর মত মেয়েকেও বিস্মিত করিয়াছিল। সে দুই চোখ তাঁর উদ্বেগ-চঞ্চল মুখের উপর স্থাপন করিয়া কুণ্ঠাসহ উত্তর দিল, "গৌরী।"

আগন্তুক তার সেই হাতটা চাপিয়া ধরিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "বিন্ধ্যার মেয়ে!"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রচুর কম্পনে উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অপর কোন মেয়ে হইলে হয় ত অপরিচিতের এরূপ ব্যবহারে একটু ভীতও হইত, কিন্তু গৌরীর মনে ভয়ের লেশ ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "না' ত, আমি ত বিন্ধ্যার মেয়ে নই,—তিনি যে আমার মাসিমা।"

আগন্তুক যেন একটা তাড়িতাঘাত প্রাপ্ত হইলেন এমনই ভাবে চমকিয়া বালিকার হাত ছাড়িয়া তাহার মুখের দিকে তিনি ব্যাকুল নেত্রে চাহিলেন, কহিলেন, "তবে তোমার মা' কে?"

"মা! আমার তো মা নেই?" এই কথা অতি অগ্রাহ্যভাবে বলিয়াই গৌরী অপরিচিতের পুনঃ প্রশ্নের পূর্ব্বেই আবার কহিল, "সকলেই বলে,—আমি জন্মেই আমার মাকে খেয়ে ফেলেচি। দাদু বলেন, মানুষ কি মানুষকে কখনও খেতে পারে? মা—স্বর্গে গেছেন।"

আগন্তুকের সর্ব্বশরীর কি এক অনির্দ্দেশ্য আবেগে থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিজের উভয় হস্ত মর্দ্দন করিয়া যেন একটা দুরাশাপূর্ণ সুগভীর মানসিক আলোড়নকে সুস্থির রাখিবার চেষ্টা করিলেন। একটু পরে একবার গৌরীর রৌদ্রতপ্ত রক্তিম মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তোমার মা নেই—বাবা আছেন?"

"উহুঁ"—বলিয়া গৌরী সবেগে ঘাড় নাড়িল, "আমার বাবা কখ্‌খনোই ছিলেন না। বড় মামী বলেন, "বাপ যে থেকেও নেই। তা নৈলে পরের আপদ আমরা কেন পোয়াই?' কে জানে বাপু, আমি ত জানি না, বাবা কোথায় আছেন। থাক্‌লে বোধ হয় ভালই হত। ঐ দেখুন, বেল্‌তলার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, ওরই ঠিক সাম্‌নে ওই বাড়ীটা।"—এই বলিয়া যেমনই সে গমনোদ্যত হইয়া পিছন ফিরিতে গেল, অমনি দুই ব্যাকুল বাহুপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়া একটি অশ্রুমথিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ তার বিস্মিত কর্ণকুহর ধ্বনিত করিয়া কহিল, "মা, মা, মা আমার। আমিই তোর অভাগা বাপ।"

সাতাশ

নন্দকিশোর লাহিড়ী উমাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রথম জামাতা সুদূর পশ্চিমে সরকারী ডাক্তার হইয়া প্রথম যাথাকালে বালিকা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই বটে, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আত্মীয় বন্ধুদের অনেক নিন্দা তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়াই স্ত্রীকে নিজের সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। পত্নী তখন সবে মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসরের কিশোরী।

একে বালিকা, তাহাতে পল্লীগ্রামের মেয়ে কাদম্বিনী নিজের নিঃসঙ্গ বাসা-ঘরে সর্ব্বদা শঙ্কিত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। স্বামী সর্ব্বদাই বাহিরে থাকেন, রাত্রেও হয়ত ধনাঢ্য রোগীর আত্মীয়জন চতুর্গুণ ফী হাঁকিয়া তাঁহাকে আটক করে। কিশোরী তার একমাত্র সঙ্গিনী দাসীর বিছানার দিকে ক্রমেই সরিয়া আসে। ইহাতেও কি সুখ আছে? যে সকল দাসী-চাকর লইয়া সারাদিন ও অধিকাংশ রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হয়, তাহাদের একটি কথাও সে বুঝিতে পারে না, 'চিরুণি' আনিতে বলিলে ইহারা 'চেটাই' বুঝিয়া মাদুর লইয়া আসে, 'নাউ' কিনিতে আদেশ দিলে 'নাপিত' ডাকিয়া আনে, সে হাসিবে কি কাঁদিবে, ঠিক পায় না।

তখন সে সকল স্থানে বাঙ্গালী পরিবারের সংখ্যা নিতান্ত অল্পই ছিল। সঙ্গহীনতায় কাদম্বিনী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একটা বাঙ্‌লা শব্দ পরিচিত একটা মুখ চাহিয়া তাহার প্রাণটা যেন হা-হা করিয়া উঠিতেছিল, এমন সময় তার একটি সঙ্গী জুটিল। নবপ্রসূতা কন্যা লইয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে তাদের প্রতিবেশী হইয়া আসিলেন। মেয়েটি সবে এক মাসের। এই সময় আবার একটা অভাবনীয় ঘটনায় অকস্মাৎ অনেকখানি উলট পালট হইয়া গেল! কাবুলে তখন ইংরাজদের সহিত আফ্‌গানদের যুদ্ধ বাধিয়াছে, মিরাটেও সে যুদ্ধের অল্প বিস্তর ঢেউ আসিয়া পৌছিতেছিল; হঠাৎ সংবাদ আসিল অবিলম্বে একজন অস্ত্র-চিকিৎসা নিপুণ চিকিৎসক চাই। নন্দকিশোর এ দেশীয় লোক হইলেও তাঁহার অস্ত্রবিদ্যার যশ ইতঃমধ্যে ও অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি যুদ্ধ-যাত্রী সৈন্যদলে যোগ দিবার

আদেশ হইল। এ নিয়োগ সমস্ত বাঙ্গালীর দিক হইতে গৌরবের সন্দেহ নাই,—কিন্তু মানুষের অবস্থাই তার সব চেয়ে বড় শত্রু। উচ্চ পদ, সম্মান, অভিজ্ঞতা, অর্থ, সবই তিনি পাইতে পারেন সত্য, কিন্তু যে আজ তাঁর এই সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, তাহাকে যে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইবেন! আসন্ন সন্তান-সম্ভবা পত্নীকে কাহার নিকটই বা রাখিয়া যান? একটা মানুষের মত মানুষও যে এখানে নাই! প্রতিবেশিনী সেই ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যুতে তাহার স্বামী শিশুটিকে লইয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাদম্বিনী শিশুটিকে গ্রহণ করিলে তিনি ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নন্দকিশোর ভাবিয়া দিশাহারা হইলেন।

কাদম্বিনী সব কথা শুনিল। শুনিয়াই সে স্বামীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। একটি কথাও সে মুখে উচ্চারণ করিল না, শুধু নীরব অশ্রুধারায় দুজনার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল, এই শেষ!

উপায় নাই, উপায় নাই! এই নির্ভর বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া যাইতেই হইবে। জীবন্ত শরীরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত করা যাহার নিত্য কার্য্য, প্রেমপূর্ণ কোমল অন্তঃকরণে ব্যথাদান তার প্রাণে ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ হইয়া বিঁধিল, কিন্তু এখন কর্ম্মত্যাগ বা ছুটী কিছুরই সম্ভাবনা নাই, নন্দকিশোর নিজের দিক হইতে নিরাত্মীয়, শ্বশুরালয়ে তারে সংবাদ পাঠাইয়া বিদীর্ণ বক্ষে আহতের শিবিরোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কাদম্বিনীর তখনকার সে অবস্থা-বর্ণনার চেষ্টা না করাই ভাল!

নন্দকিশোরের প্রেরিত সংবাদ যখন ভট্টাচার্য্য গৃহে পৌছিল, ভক্তিনাথ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন কনিষ্ঠ জামাতার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট। শিবনারায়ণ সে সময় নিজের কর্ম্মস্থানেই থাকিতেন। বিদ্যুৎ নিজ ক্ষিপ্র গতিতে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিলেও সাধারণের তাহা গোচর হইল না—এক পাশে ধূলা মাখা হইয়া কাগজখানা পড়িয়া রহিল।

সব চুকিয়া গেলে সপুত্র সার্ব্বভৌম তেমনি শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভিতরে উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিল। ভক্তিনাথ উভয় জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উমাকান্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া

কহিলেন, "ব্রহ্মময়ি মা!"—তার প্রেরণের মাসাধিক কাল পরে ভক্তিনাথ ডাক্তার বাবুর শূন্য গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন, "কাদু!" কে কোথায়! ভিতর হইতে রোরুদ্যমানা শিশুক্রোড়ে হিন্দুস্থানী দাই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহারাই এই মাতৃত্যক্তা অপোগণ্ডটিকে প্রতিবেশীর সাহায্যে পালন করিতেছিল। দুদিনের মধ্যে সেখানকার পাঠ উঠাইয়া ভক্তিনাথ ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে ধরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন, নন্দকিশোরের এখন ফিরিয়া আসা কোন মতেই সম্ভব নয়। দুই চারিখানা পত্র ও টেলিগ্রামও পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনই প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নাই।

ইহার পর হইতে তাঁদের পক্ষ হইতে সকলেই গৌরীর পিতার আশা ত্যাগ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, ধনী নন্দকিশোর বন্ধন কাটাইয়া নবীন জীবন উপভোগ করিতেছেন, অথবা তিনি মৃত তাঁহার নাগাল আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হায়, বুঝিবার ভুল কত সময়েই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

আফগান যুদ্ধের কামান গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে নন্দকিশোর সে সময় নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এতদিনে হয়ত কাদম্বিনী তাহার নবপ্রসূত সন্তানের মুখ দেখিয়া একটু শান্ত হইয়াছে। পিতা বা ভ্রাতা নিশ্চয় এতদিনে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে আসিয়াছেন।

কার্য্যদক্ষতার জন্য, যশ, মান ও ধন দ্বারা পুরস্কৃত নন্দকিশোর উচ্চ পদাধিকার লইয়া যখন মিরাটে ফিরিলেন, তখন তাঁহার অধিকৃত গৃহে অন্য এক বাসিন্দার বিবাহের বাদ্য বাজিতেছে। প্রতিবাসীগণ সংবাদ দিল, তাঁহার এখান হইতে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়, সে আজ প্রায় পাঁচ মাসের কথা। পত্নীর মৃত্যুর পর একটি মেয়েকে একটি লোক আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, অপরটি কাদম্বিনীর মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খুব সম্ভব সেইটীই তাঁহার সন্তান। নন্দকিশোরের মনে এই কথাটাই সঙ্গত ঠেকিল। যে মেয়েটিকে কাদম্বিনী পালন করিতেছিল, তাহারই পিতা আসিয়া নিশ্চয় তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ছুটীর দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি নিজের কাজে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কেহ কোন দিন আর হাসি দেখিতে পায় নাই,—লোকে বলিত, হাড়ের উপর ইস্পাত চালাইয়া মানুষটাও ঐ দুইটা জিনিষের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে!

অকালবৃদ্ধ নন্দকিশোর পেন্‌সন লইয়া বৎসর দুই কলিকাতায় আসিয়া বসিয়াছেন, ইতঃমধ্যে তাঁগার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার হাত যশের খ্যাতি সুপ্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। আকাঙ্ক্ষাহীন ধনে ঘর আজও নিত্য ভরিয়া উঠিতেছে।

রাণাঘাটে রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় সেই কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিপূর্ণ গৃহখানা আজ তাঁহাকে নিতান্তই এই পথে টানিয়া আনিয়াছিল। কাদম্বিনীকে ত তিনি এই গৃহ হইতেই একদিন তাঁহাব পাশে তুলিয়া লইয়াছিলেন, ইহা তাগারই পুণ্য-স্মৃতির পবিত্র তীর্থ তো বটে!

নন্দকিশোর যখন গভীর আবেগে গৌরীকে বক্ষে ধাবণ করিয়া কহিলেন, "আমিই তোর বাপ"—তখন এই অপরিচিত শব্দটা গৌরীর কানে কঠোর উপহাসের মতই উৎকট ঠেকিল। সে একটু আড়ষ্ট থাকিয়া ঈষৎ বিস্মিত ও বিরক্তভাবে অপরিচিতের বাহু ঠেলিয়া কহিয়া উঠিল, "আমার বাপ নেই। হযত মরেই গেছে। তুমি ও রকম কবচ কেন?—কে' জানে বাবা!—পাগল নও ত?" চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—যদি সত্যই সে উন্মাদ হয়?

নন্দকিশোর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁর মুখে' মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার নিদারুণ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মুখখানা বেত্রাহত অপরাধীর মুখের মতই পাণ্ডু দেখাইল।

এমন সময় গলির মোড়ে দুইজন লোক প্রবেশ করিলেন। তাদের দিকেই তাঁহারা ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছিলেন, নন্দকিশোর সেদিকে লক্ষ্য মাত্র করেন নাই, তিনি যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রসারিত বাহুদ্বয় অবসন্নভাবে দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল. অবসাদে ও গভীর বেদনায় মস্তক নত হইয়া পড়িয়াছিল। পথিকদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইল,—একজন ভক্তিনাথ, অপর ব্যক্তি তাঁহারই একটি ছাত্র। নিকটে আসিলে

গৌরীর উপর ভক্তিনাথের দৃষ্টি পড়িতেই তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "গৌরি, তোর শাপই ফলেছে রে! তোর শ্বশুরের অসুখ করেচে,—কে?—নন্দকিশোর বলেই যেন—"

"চিনতে পারচ, ভক্তিনাথ? অভাগা তার পৃথিবীর একমাত্র আত্মীয়ের কাছেও আজ অপরিচিত,—মেয়ে তার বাপ চেনে না এমন হতভাগা সে।"

আগন্তুকের কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া গৌরী সহসা কোথা হইতে আসা অজানা মনোদ্বেগে কম্পিত স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

আঠাশ

পৃথিবী সচলা তার সুখ-দুঃখও তাই সচল। তালে ছন্দে বাঁধা জগতের নিয়মসমূহ কখনও তাল কাটাইয়া চলে না। গৌরীর ভাগ্যচক্র এক সময় নীচের দিকে নামিয়াছিল, তাই বুঝি এবার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভক্তিনাথ কহিলেন, "নীলমাধব পীড়িত। শুনে এলাম, তার স্ত্রী বলেছেন বিয়ের কথাতেই যখন বাড়ীতে রোগ ঢুকেচে, তখন ও অপয়া মেয়েকে ঘরে আনা হতে পারে না।"

নন্দকিশোর তখনও বেশী কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া পান নাই, কন্যার দিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "ক্ষতি কি।"

ভক্তিনাথ কহিলেন, "এখন মনে হচ্চে, মঙ্গলময় ঈশ্বর কি মঙ্গলই ঘটিয়েছেন! তোমার মেয়ে তুমি যোগ্য পাত্রে দিয়ো ভাই—আমি আর কি করতে পারছিলুম।"

ভক্তিনাথের কণ্ঠ সজল, নেত্রে রুদ্ধ আনন্দাশ্রু। নন্দকিশোর তাঁহার বাহুর উপর হাত রাখিয়া গভীর স্বরে কহিলেন, "তুমিই তো সব করেছ, ভক্তি। তুমি ওকে না আনলে ও কোথায় যেত আজ।" বলিতে বলিতে সেই ভয়াবহ কল্পনায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগিনিপতিকে কঠিন তিরস্কার করিতে আসিয়া তাঁহার অজস্র অশ্রুজলের স্রোতে বান ডাকাইয়া বসিলেন। আহা, এ অবস্থায় মানুষকে কি আর কিছু বলা যায়?

চোখের জল শুকাইলে নন্দকিশোর কহিলেন, "যাহোক, বিন্দু এখন তোমার মেয়েটিকে নিয়ে যে একবার ওদিকে যেতে হচ্চে, বোন! তার কি ঠিক করলে, বল?"

বিন্ধ্যবাসিনী যে এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির না করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাও নয়। বড় বধূ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে একটু টিপ্পনী কাটিয়া রাখিয়াছেন, "তা হ'ল ভাল! ঠাকুরঝি এখন দিন কতক বোনাই-বাড়ীতে গিন্নিপনা করতে যাচ্ছেন বোধ হয়?" এই মন্তব্য ভাই ভগিনী কাহারও ভাল

লাগে নাই। ভক্তিনাথ তথনই উত্তর দিযাছিলেন, "তাই বা ও যেতে গেল কেন?"

বড় বধূ ঠোঁট টিপিয়া কহিলেন, "তা গেলই বা! গরীবের ঘরের চেয়ে বড় মানুষের আঁস্তাকুড়টাও ত ভাল।"

বিন্ধ্য নিজের মনে এই নিশ্চিন্ত আমন্ত্রণের উত্তর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই অঞ্চলপ্রান্ত অন্যমনস্কভাবে পাকাইতে পাকাইতে উত্তর দিলেন, "এখন নয়, যখন গৌরীর বিয়ে দেবে, তখন আমায় নিয়ে যেও।"—কথাটা যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত শুনাইল। সুখ এবং বেদনা, উভয়ই ইহার মধ্যে তুল্যাংশে মিশ্রিত ছিল।

নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তাহলে, কেমন করে আমি ওকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাই? ও যে তোমারই—"

"পোড়াকপাল, আমার হয়ে তার ত সবই হয়েচে।—এমন মানুষের আবার মেয়ে! তোমার ধন তুমি নিয়ে যাও, ভাই,—"

উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা সুখে বিন্ধ্যবাসিনী রুদ্ধবাক্ হইয়া রহিলেন। হায় স্বার্থান্ধ মানব হৃদয়! নিজেকে নিঃশেষে দিযাও যে সে আবার কিছুটা ফিরিয়া পাইতে চায়। অহংকে দলিত কীটবৎ পদতলে চাপিয়া ধরিলেও যে সে মরে না!

বড়বধূ ঘরের সব চেয়ে ভাল আসনখানা পাতিয়া ঠাকুরজামাইকে খাওয়াইতে বসিয়া ঘন ঘন পাখার বাতাস দিয়া কহিলেন, "নে যাও ভাই, তোমার জিনিষ তুমি নে'যাও, মা-খেকো-মেয়ে একরত্তি থেকে বুকে করে মানুষ করা—যত্ন টত্ন করো! আমাদের প্রাণ কাঁদচে, পরের মেয়ে, জোর ত নেই, শুধু এতকাল করে মরাই সার। দেখ না, বিয়ের নামেই কি না ছত্রকোট হ'ল! প্রায় দু-তিন শো টাকার জিনিষ-পত্তরই তো কেনা হয়ে গেছলো।"

নন্দকিশোর কহিলেন, "সে কি কথা! আপনাদের জোর নেই ত কার আছে? সে বরং আমারই ওর পরে কোনই জোর নেই। দয়া করে দিচ্চেন তাই দুদিন নিয়ে যাচ্চি, যখনই আদেশ করবেন, তখনই আমি ওকে আপনাদের চরণ দর্শন করাতে নিয়ে আসবো। আপনাদের ঋণ কি কখন শোধ হবে?"

পরদিন অতি প্রত্যূষেই পাড়ায় পাড়ায় প্রচারিত হইয়া গেল, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা এতকাল পরে হঠাৎ মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন, এবং শুধুই তাই নয়,—এই নন্দকিশোর লাহিড়ীটি টাকার ছালা সঙ্গে করিয়া সেই অজানা দেশ হইতে ফিরিয়া এক রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া এই গরীব ঘরের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বরপক্ষ এ সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন।

যেমন উৎসাহে লোকে শারদা-গৌরী-প্রতিমা দেখিতে আসে, তেমনই দলে দলে পাড়ার মেয়েরা গৌরীকে দেখিতে আসিল। উৎসাহের গভীরতায় তখন আর কাহারও মনে রহিল না, সে একটি দুর্দ্দান্ত অশিষ্ট এই গ্রামের মেয়ে। ধনী পিতার উপস্থিতি তার উপর যেন একটা শ্রীর খোলস পরাইয়া দিয়া সাত রাজার ধন মাণিকটুকুর মতই মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে না কি ?

করুণাময়ীর দাসী আসিয়া তাহাকে কমলার সনির্ব্বন্ধ আহ্বান জানাইয়া গেল। সেও শুনিয়াছিল, গৌরী পরদিন পিতার সহিত চলিয়া যাইবে। মানুষের মনে কোন অবস্থাতেই বুঝি তৃপ্তি নাই! বিবাহ বন্ধ হইল, পিতৃহীনা পিতৃস্নেহ লাভ করিল, তথাপি সে সুখী হইল না,—মাসিমা সঙ্গে যাইবেন না শুনিয়াই তার সকল আনন্দ ঘোর বিষাদে পরিণত হইল। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে এই গৃহ ও এই মাসিমার কোলের গণ্ডির বাহির হয় নাই, আজ একসঙ্গে এত বড় দুইটা বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিবে? কান্নার মধ্যেই এক সময় বলিয়া বসিল, "তবে ত বিয়ে বন্ধ হয়ে আমার সব হল! সে তবু ত তোমায় দেখ্‌তে পেতুম।"

অশ্রুধারার মধ্যে শরত রৌদ্রের মত মৃদু হাসিয়া মাসিমা সস্নেহে কহিলেন, "পাগলি!" সেদিন তরকারিতে লবণ ও চালতার-গুড়-অম্বলে গুড়ের অভাব ঘটিয়া পদে পদে রন্ধনকারিণীকে অনুযোগের পাত্রী করিয়া তুলিল।

নদীবক্ষে সুদৃশ্য তরণী ভাসিতেছিল। অশ্রুপরিপ্লুতা রোদনোচ্ছ্বসিতা গৌরী পিতার সহিত তরণী বক্ষে পদার্পণ করিতেই দাঁড়ি মাঝি ও ভৃত্যের দল উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল। মুহূর্ত্তের বিস্ময়ে গৌরী সব ভুলিয়া গিয়া স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল। জলের উপর ভাসমান গৃহের মত সুবৃহৎ

বজরার দ্বারে লতা-চিত্রিত পর্দ্দা বাতাসে উড়িয়া বিবিধ সুখ-বিলাসের উপাদান-পূর্ণ গৃহমধ্যে যেন তাহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছিল। ব্যগ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীটা তোমার নাকি?"

"হ্যাঁ মা! এ বজরা আমিই কিনেচি।" কিন্তু হায়,—মাসিমা ত এ বজরায় তাহার সহিত যাইবেন না! গৌরী পিতার হাত ছাড়িয়া তীরের দিকে তীরবেগে ফিরিল,—চিৎকার করিয়া উঠিল,—"মাসিমা! চলে গেছ, মাসিমা? না, আমি যাব না,—ওগো, আমি যাব না। আমায় নামিয়ে দাও।" উর্দ্ধস্বরে এবার সে কাঁদিয়া উঠিয়া সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণ মাঝি-মাল্লারা ক্ষিপ্র হস্তে সিঁড়ি তুলিয়া লইয়াছে।

বন্দী মৃগশিশু যেমন ব্যাধের জালমধ্য হইতে গভীর হতাশায় বনান্তরালবর্ত্তিনী ব্যাকুলা জননীর প্রতি আকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কাঁদিতে থাকে, তেমনই করিয়া তীরাভিমুখে ভট্টাচার্য্য-পরিবারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গৌরী লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "আমি যাব না গো, আমি যাব না।" ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি আর একটি পরিত্যক্ত চিত্তে তেমনি প্রাণফাটা হাহাকার বহন করিয়া আনিতেছিল। সে ক্রন্দন আরও করুণ, আরও মর্ম্মভেদী কারণ তাহা অব্যক্ত।

"মা গৌরী! আমি তোকে জোর করে তোর আত্মীয়দের কাছ থেকে কেড়ে আনলুম মা? তোকে আমি নিজের স্বার্থের জন্য কষ্ট দিচ্চি। মাগো! আমায় ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর।"

যে গভীর সংশয়পূর্ণ বিষাদের স্বরে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল, তাহা গৌরী ভিন্ন অন্য কোন সংসার-জ্ঞানে অভিজ্ঞা বালিকা বোধ হয় সহিতে পারিত না।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, গৌরীর মনে পিতার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কেমন করিয়াই বা থাকিবে? জন্মাবধি যাহার কাছে সে কণামাত্র স্নেহ পায় নাই, বরং তাহার নিকট হইতে সর্ব্বদা শুনিয়া আসিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন,—সহসা একদিন তিনি আসিয়া কাছে টানিলে সে এখন কেমন করিয়া তাহার এতদিনকার জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয়

করিতে পারিবে? সে তীব্ররোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, "কেন, তুমি আমায় নিয়ে এলে? আমি ত মাসিমাকে সত্যদাকে আর দেখতে পাবো না! মাসিমাকে ছেড়ে যে আমি কক্ষণো থাকিনি—" বলিতে বলিতে নদী তীরবর্ত্তী শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়াঢাকা গ্রাম্য পথে অনেকগুলি পরিচিত মূর্ত্তির মধ্যে এক শুভ্রবসনা বিধবার অশ্রুজলে রুদ্ধ দৃষ্টির ব্যথিত ছায়া কল্পনা নেত্রে উদিত হইবামাত্র আবার সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "মাসিমা গো! আমায় নিয়ে যাও—আমি যাব না।"

ক্ষেপ'নি-ক্ষেপ-চূর্ণিত তরঙ্গ ছল-ছল-ছলাৎ শব্দে বজরার তলায় আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। সোণার রৌদ্র মাখিয়া সেই ফেনমুকুট ঢেউগুলা মীনা-করা জড়োয়া জিনিষের মতই দেখাইতে লাগিল। গৌরীর ক্রন্দনে প্রকৃতি যেন কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখানো আবশ্যক বোধ করিল না। নৌকা দ্রুত চলিতেছিল। তীরে কোথাও পাকা ফসলে ক্ষেত হাসিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বাঁধা ঘাটে বাবুরা বায়ু সেবনে আসিয়াছেন, বটের ছায়া-ঢাকা কোন মেটে ঘাটে গ্রামের মেয়েরা গা ধুইতেছে! ছোট ছোট মেয়েগুলি জলে গা ডুবাইয়া মুখে জল পুরিয়া বিবিধ শব্দ সৃষ্টি করিতেছে, পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া অভিভাবিকাদের গালি খাইতেছে। কোন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতা বালিকা জলে নামিতে না পাইয়া কাদায় বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কোথাও নির্জ্জন ঘাটে ছাঁকনি জালে জেলের মেয়ে ক্ষুদে চিংড়ি ধরিতেছে। গ্রীবা বাঁকাইয়া দুইটি রাজহংস ইচ্ছা-সুখে সন্তরণ দিতেছে। নন্দকিশোর কন্যার শেষ কথায় অন্তর মধ্যে আঘাত পাইয়াছিলেন। প্রথম ধাক্কায় মনে হইল, নৌকা তিনি ফিরাইতে বলেন, কিন্তু মানুষের মন আশা-সূত্রে মালা গাঁথিতেই তো ভালবাসে, মুহূর্ত্তেই আবার সে ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হয় ত দুদিন পরে এ ভাব চলিয়া যাইবে। কিছু না বলিয়া তাই নীরবে বসিয়া রহিলেন। অতীতের স্মৃতি ব্যথিত বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুও ফুটাইয়া তুলিল। সহসা একবার কি ভাবিয়া মুখ তুলিতেই সেই বেদনার কষাঘাতস্বরূপ অশ্রুবিন্দু দুইটি গৌরীর চোখে পড়িল। সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল। তখন সূর্য্যের অস্তগমনোন্মুখ রশ্মিগুলা পশ্চিম আকাশের প্রান্তটাকে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে,

স্বর্ণ-মিশ্রিত লালের আভায় বিদ্যুৎপ্রভ শ্বেত মেঘপুঞ্জে নূতন নূতন রং ধরিয়াছে, যেন ইন্দ্রালয়ের চারু শিল্পী স্বর্গবাসিনী সুরকন্যাগণের বিচিত্র বসন পুঞ্জ নিজের পণ্যশালায় সাজাইয়া মর্ত্তবাসীকে প্রলোভিত করিতেছে। মেঘের ছায়ায় জল পর্য্যন্ত বর্ণময়, তরঙ্গের মুখে মুখে নূতন রংয়ে যেন একগাছি বিভিন্ন বর্ণের ফুলে গাঁথা গোড়ে মালা ভাসিতেছে! দুই ধারের সবুজ শোভা ও হেমন্ত-সায়াহ্নের ঈষৎ শিহরণকারী বাতাসে মৃদু স্পন্দিত ঘন তরুরাজি ভেদ করিয়া অদূরস্থ অট্টালিকা-বাতায়ন-পথে সান্ধ্য নক্ষত্রের মত একটি ক্ষীণ সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র শান্ত সমাহিত নির্জ্জন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। গৌরীর অশ্রু পরিপ্লুত মুখে রাঙ্গা আলো আসিয়া পড়ায় তাহাকেও যেন পরী-কন্যার মতই অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া অবশেষে সে পিতার দিকে ফিরল। জানুর উপর চিবুক রাখিয়া নত মুখে তিনি বসিয়া আছেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে সে স্পর্শ করিল, কহিল, "আকাশে কি আগুন লেগেছে? তবে এত রাঙ্গা কেন বলি দেখি? আমাদের ওখানে তো এ রকম লাল হয় না।"

উনত্রিশ

পরদিন যখন নন্দকিশোরের নিদ্রাভঙ্গ হইল চোখ চাহিয়া প্রথমেই তিনি তাঁর বিছানার কাছে অপর শয্যার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। গৌরী তখনও ঘুমাইতেছে। হেমন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তপনের দুই একটি রশ্মি সাসির কাচের উপর পড়িয়া নাচিতেছে, গৃহের মাঝখানে গৌরীর ঘুমন্ত মুখ স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মতই মোহ বিস্তার করিতেছিল। নন্দকিশোর নিঃশব্দে উঠিয়া বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে বোধ করি ভালভাবে নিশ্বাসও লইতেছিলেন না।

একটা উড়ন্ত পাখী বাতাসে ডানা মেলিয়া নদী পার হইবার সময় তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল, সে শব্দে চমকিয়া গৌরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল। নন্দকিশোরের মনে হইল যেন সেই মুদিত নেত্রের ছায়াতলে বিশ্বের সমুদয় পুঞ্জীভূত আলোক এতদিন ঘুমাইয়াছিল, এ পূর্ণ বিকাশের সহিত রাত্রি-শেষে তপনোদয়ের মতই এখন পুলকের স্পন্দনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে! কি এক অননুভূত আবেগে তাঁহার বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল। গৌরী তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া আপনা-আপনি কহিয়া উঠিল, "মাসিমা ডেকে দেয়নি! এত বেলা হয়ে গেছে,—এখনি বড় মামী বকবেন। কখন ফুল তুলব ঝাঁটই বা দেব কখন— সহসা নন্দকিশোরের সহাস্য মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্থির হইয়া গেল। মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বগতঃই বলিল; "ও হরি! সব ভুলে গেছলুম।" নন্দকিশোর তার মুখের ব্যস্ত ভাব সহসা অবসাদে পরিবর্ত্তিত-প্রায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথা পাড়িলেন, কহিলেন, "তুমি পড়তে জান?" গৌরী মুখ না তুলিয়া ঘাড় নাড়িল, "জানি।"

"কি পড়?"

"দ্বিতীয় ভাগ।"

"তুমি ফুল ভালবাস?" এবার নত মুখ ঈষৎ উঁচু হইল, গৌরী কহিল, "বাসি।"

"আমার বাড়ী অনেক ফুল গাছ আছে।"

"তোমার বাড়ী খুব বড় ?"

"খুব বড়। তাতে সন্ধ্যাবেলা কল টিপ্‌লেই আলো জ্বলে ওঠে, তাকে বিদ্যুতের আলো বলে। কল খুললে বৃষ্টির মত জল পড়ে, তাকে বলে জলের কল।"

গৌরীর ভগ্ন চিত্তে ক্রমে একটু উৎসাহ জন্মিতেছিল, সে কহিল, "সেখানে তা হলে নদী নেই ?"

"আছে,—অনেক দূরে, সেখানে আমরা বিকালে বেড়াতে যাব। সেখানকার গঙ্গা অনেক বড় বড় জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকায় ভর্ত্তি থাকে, তীরে কত আলো জ্বলে।"

এবার কৌতূহলের জয় হইল। "কলকাতাটা চাকদার চাইতে অনেক অনেক বড় ?" তারপর পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অধিক স্থলেই প্রৌঢ় শ্রোতা ও বালিকা বক্তা। কোথাও বা তিনি উত্তরদাতা গৌরী প্রশ্ন-কারিণী। সে প্রশ্নের সীমা ছিল না, সকল প্রশ্ন উত্তরেরও অপেক্ষা করিতেছিল না, দেখিতে দেখিতে অপরিচিত পিতা-পুত্রীতে অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলেন।

নন্দকিশোর আজ সম্পূর্ণ নূতনতর আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন! চিরশুষ্ক শীর্ণ নদীতে অকস্মাৎ পাষাণ বক্ষবিদারী তীব্র জলস্রোত ছুটিয়া আসিলে সে যেমন নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনই এই নবভাবের বন্যা তাঁহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পিতৃ-হৃদয়ের গভীর উন্মাদনাপূর্ণ স্নেহে তাঁহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে, অথচ এই অনাস্বাদিত সুখ কাঙ্গালের মত সঙ্কোচে তাঁহাকে পীড়িত করিতেও ছাড়িতেছে না। ব্যাকুল আগ্রহ স্নেহপাত্রীকে বুকে টানিয়া লইতে মুহুর্মুহুঃ বাহু প্রসারিত করিয়া ছুটিতে চাহিতেছিল, কিন্তু দারুণ সন্দেহ মনকে টানিয়া রাখিতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যে অবলম্বনটি মিলিল সে শিশু প্রকৃতি হইলেও শিশু তাহাকে বলা যায় না। বাহুতে দোলাইয়া বুকে চাপিয়া কোলে টানিয়া রাখা যায় না। এদিকে দুরন্ত ক্ষুধা যেন সর্ব্বগ্রাসীভাবে জাগিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ জাগ্রত কুম্ভকর্ণের মতই চিরদিনের পাওনা খোরাক দাবী করিতেছে যে!

নন্দকিশোর এমন করিয়া কাহাকেও ভালবাসিবার অবসর মাত্র লাভ করেন নাই।, মাঝখানের বারোটী বছর তো হৃদয়ের বৃত্তিগুলা জীর্ণ শুষ্ক হইয়াই পড়িয়াছে। এর আগেও শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নন্দকিশোর একমাত্র পত্নী কাদম্বিনীকেই সল্প কয়েকটী বৎসরই যেটুকু ভালবাসিবার অবসর পাইয়াছিলেন, সেই বা কয়দিন! অধ্যয়নকালে বালিকা পত্নীর সহিত দেখা শুনারই অবসর ঘটিয়া উঠে নাই, শেষ দুইটী বৎসরের স্মৃতিটুকুই তাঁর পক্ষে যা একটু সুখ স্বপ্ন ও জীবনের অবলম্বন।

গৌরীও তার অজ্ঞাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। প্রথমকার বিদ্রোহের ভাবটা মন হইতে অল্পে অল্পে সারিয়া আসিতেছে, অচেনা পিতার প্রতি সূক্ষ্ম অভিমান স্পষ্ট না বুঝিলেও মনের মধ্যে অনেকখানি স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, সেখানে একটা সহানুভূতির ছায়া ক্রমেই জলে পতিত তৈল-বিন্দুর ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে। মাসিমা ও সত্যদা, এই দুইটি প্রাণী ব্যতীত তৃতীয় আর এক ব্যক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া আছে সে কমলা। প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় বিচ্ছেদের বেদনায় বাধা প্রাপ্ত না হইলে হয়ত সে আরও পূর্ব্বে ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারিত। নন্দকিশোর নৌকা যাত্রা দীর্ঘ করিয়া দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে বৃহৎ তরণী মৃদু-মন্দ গতিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে, কিছুদূর আসিয়া কোথাও নোঙ্গর ফেলে। পিতাপুত্রী তীরে খানিকটা ঘুরিয়া আসেন, গৌরীর মনে তখন আর ক্ষোভ থাকে না। বনের ফল ছিঁড়িয়া, ফুল তুলিয়া, প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া সে যখন বনচারিণী দেবশিশুর মত হাসির লহর তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, নন্দকিশোরের সারা চিত্ত সেই আনন্দের তালে নাচিয়া উঠে।

জলযাত্রা ফুরাইয়া আসিল। একদিন শেষ বেলায় প্রকাণ্ড মাস্তুলওয়ালা জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকা ও তীরের পিপীলিকাশ্রেণীবৎ ব্যতিব্যস্ত লোকজন-সমেত একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য চোখে পড়িয়া মুগ্ধা গৌরীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কি হয়েচে, বাবা?"

এই প্রথম সে তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল। সে আনন্দে পিতার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং তাঁর জীবন সার্থক ও বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজনীয়

বোধ হইল। ভবিষ্যৎ অকস্মাৎ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কহিলেন, "ওই তো কল্‌কাতা।"

"ও –মাগোঃ! ঐখানে আমরা থাক্‌ব?"

গৌরীর দুই নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দুধারের দীপালী অকস্মাৎ গৌরীর চোখ ধাঁধিয়া দিল। সুন্দর অশ্বযানে পিতার পাশে বসিয়া সে নিস্পন্দভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সারি সারি দোকানে কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ! অশন, বসন, ক্রীড়নক, পুস্তক কত প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় রাশি রাশি পরিচিত অপরিচিত দ্রব্যসম্ভার একত্রিত করা! গাড়ী ঘোড়া লোকজন অস্বাভাবিক রূপসম্পন্ন নূতন ধরণের স্ত্রী-পুরুষ, শিশু বালক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোলা গাড়ী চড়িয়া সদর্পে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! গগনস্পর্শী অট্টালিকা একটার পর একটা এমনই করিয়া সাজানো যেন একটা বিরাট প্রাচীর-শ্রেণীর মত কোন সীমাহীন পথের দুই ধারকে তারা ঘেরিয়া রাখিয়াছে। উহার মধ্যে একবার পড়িলে বুঝি আর কখনও বাহির হওয়া যায় না! বহু পথ বহু দৃশ্য অতিক্রম করিয়া গাড়ী একটা উদ্যান মধ্যস্থ অট্টালিকার সামনে থামিল, সে পিতার সহিত তেমনই নিস্পন্দভাবে নামিয়া আসিল। কোন প্রশ্নই করিল না। কলিকাতা যেন যাদুকরের যাদু-যষ্টির মত মনকে তার স্পর্শ করিয়া রহিল। ফুল গাছের টব-সজ্জিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া নন্দকিশোর একটা হল ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, দ্বারে গৌরী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিলেন, "এস মা! এস, এ যে তোমার বাড়ী।" গৌরী আড়ষ্ট হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল,—"এখানে রাজারা থাকেন না?"

নন্দকিশোর মৃদু হাসিলেন, "না মায়ি! তোমার গরীব বাবা থাকেন।"

সে বক্ষরোধকারী নিশ্বাসটা ছাড়িয়া দিল, কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "পায়ে কাদা ধূলো,—বিছানা যে নষ্ট হয়ে যাবে।"

"যে ঘরের বুকে তোদের পায়ের চিহ্ন না পড়েছে, তার মত অভাগা কি আর আছে রে? যাগ্‌গে, এ সবই তো তোমার।"

গৌরী হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এ সব তার? বড়মামীর বকুনি বাঁচাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান ও গৃহে ফিরিয়া ভৎ‍র্সনালাভ এই যার পাওনা—সেই সে আজ এই বাড়ীর মালিক? এর চেয়ে আশ্চর্য্য কাণ্ড আর কি ঘটিতে পারে?

প্রভাতে যাদুকরী নগরী আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। ট্রামের প্রকাণ্ড বপু দেখা যাইতেই গৌরী নিশ্বাস-রোধ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কত রকম শব্দ। কতপ্রকার গাড়ী। কত না মানুষ! রাস্তায় ফেরিওয়ালা কত সুরে বেসুরে,—'চাই মটর ভাজা', 'ভালো ভালো জরির সাড়ি', 'কৃষ্ণনগরের সরভাজা',—'জামাই-ভুলান লেডিক্যানী' হাঁকিতেছিল। জানালা ছাড়িয়া গৌরী নড়িতে পারে না, যেমন সরিয়া আসিবে ভাবে, অমনি একটা না একটা আশ্চর্য্য কিছু ঘটিয়া বসে। বদ্ধদৃষ্টি বদ্ধপদে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া থাকে। নন্দকিশোর আড়াল হইতে দেখিয়া অনেক সময় পা টিপিয়া ফিরিয়া যান। অবসর করিয়া যখন তাহাকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিতেন, সেই অবকাশে সে এই বাড়ীর অদ্ভুত রহস্য সকল উদ্‌ঘাটন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। পাখা, আলো, জলের কল, আহ্বান-ঘণ্টা, ঔষধের আলমারি, পুস্তকের সেল্‌ফ হইতে ছোটখাট খুঁটিনাটি শত বস্তু যে তার অপরিচিত। কোথায় সেই পল্লীগ্রামের আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরকন্না,—আর কোথায় কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ডাক্তারের সুসজ্জিত ভবন গৃহ। সবই নূতন সবই আশ্চর্য্য! যাকিছু দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যায়, কখনো মুগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠে, "কি চমৎকার!" নন্দকিশোরের সকল আযোজন এত দিনের পর সার্থক মনে হয়। কিন্তু এমন করিয়া নূতনত্বের বিস্ময় বেশী দিন তার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, একদিন সন্ধ্যায় ছাদে উঠিয়া দীপান্বিতার উৎসব-রজনীবৎ আলোকমালা-মণ্ডিতা নগরীর দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া যখন কি একটা বিষয় জানিবার চেষ্টায় পিতাকে খুঁজিতে নামিয়া গেল, দেখিল তিনি বাড়ী নাই, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, এই বাড়ীতে সে একেবারেই একা!

নন্দকিশোরের ফিরিতে বিলম্ব হইল। যখন ফিরিলেন, গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অতৃপ্ত নেত্রে সে মুখ দেখিতে দেখিতে পিতৃহৃদয় সেই ছোট্ট মুখখানিতে চুম্বন দিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। পাছে সে জাগিয়া উঠে, সেই ভয়ে তাহাকে স্পর্শ করিতেও সাহস হইল না। মায়ের কাছে তাঁর নবজাত শিশুটি যেমন অসহায়, তাঁর চোখেও এ'ও তেমনই শিশুবৎ প্রতীয়মান হইত। গৌরীর মনে আবার বিদ্রোহ দেখা দিল। সে দাসীর হাত হইতে ঝাঁটা

টানিয়া মার্ব্বেলমণ্ডিত দালান ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, নিবারণ করিলেও গ্রাহ্য করিল না, বলিল, "আমার খুসী, আমি ঝাঁট দোব, তুমি অন্য কাজ করোগে না।"

"এমন মেয়ে কক্ষণো দেখিনি বাবা! যা ধরবে তাই।" দাসী রাগ করিয়া বাবুকে খবর দিতে চলিয়া গেল! ক্ষণপরে নন্দকিশোর আসিয়া শশব্যস্তে কহিলেন,—"এ কি হচ্ছে মা?"

গৌরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া একমনে কাজ করিতেছিল, কাজে কামাই না দিয়া উত্তর করিল,—"কেন, সেখানে ত করতুম।"

পিতা আসিয়া হাত ধরিলেন, "তা হোক, ও সব ঝিয়েরা করবে, ঝাঁটা ফেলে চলে এস।"

গৌরী এবার সম্মার্জ্জনী ত্যাগ করিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিল, ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "তবে আমায় কেন নিয়ে এলে? আমি কি করে থাকবো একলাটি, দিন-রাত্তির?"

এ কথা সে বলিতে পারে! তাঁর সারা জীবনটা নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে, তাই বলিয়া এই পল্লী-বালিকা সে দুর্ব্বিসহ জীবনের অংশ কেমন করিয়া বহন করিবে।

আহত ও লজ্জিতভাবে কহিলেন "একা তোমার কষ্ট হচ্ছে, একজন সঙ্গীর চেষ্টা করচি।"

গৌরী আহ্লাদে মুখ তুলিল, "সত্যদা ত কল্‌কাতাতেই থাকে!"

"সে' কে?"

"সত্যদাদা গো, গাঙ্গুলী বাড়ীর সত্যদাদা,—এর মধ্যেই ভুলে গেছ? কতদিন ত বলে'চি।"

নন্দকিশোর এই দাদাটির সংবাদ অনেক বারই পাইয়াছেন, তবে বড় একটা মনোযোগ করেন নাই, তাই স্মরণ ছিল না। সামলাইয়া কহিলেন, "সে এখানে আসবে কেন?" আগ্রহাতিশয্যে গৌরী পিতার হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে তাহা নাড়িতে নাড়িতে কহিয়া উঠিল, "আসবে না আবার, আসবে, আসবে খুব আস্‌বে।"

অপরাহ্ণে নন্দকিশোর তাহাকে ইডেন উদ্যানে বেড়াইয়া আনিলেন। মনোরম দৃশ্যাবলী পরীশিশুবৎ ইংরেজ বালক-বালিকাগণের স্বাধীন-বিচরণ,

নূতন নূতন বিবিধ বস্তু তাহার চিত্তকে মোহিত করিয়া তুলিল। দুই চারিটি বাঙালী বালক-বালিকা তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন হাসা হাসি করিয়া কাছে কাছে ঘুরিল। তাদের বেশভূষা চলন-বলন সবই স্বতন্ত্র! সে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিল। মন চাহিলেও তাই সে তাদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিল না।

ফিরিবার সময় পিতা বলিলেন, "তোমার একজন জ্যেঠাইমা আছেন, তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, তিনি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে এসে থাকতে পারবেন।"

"আর সত্যদাদা?"

নন্দকিশোর কি করিয়া ইহাকে এ আবেদনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া কেবল গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আচ্ছা, চল তো দেখি।"

যে গৃহে গৌরীকে তিনি লইয়া আসিলেন, সে গৃহও তাঁর নিজগৃহবৎ সমৃদ্ধির পরিচায়ক। গৌরী দেখিল তামাক-পোড়া-রঞ্জিতাধরা বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া গৃহিণীর পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বেশভূষায় হাস্যমুখী পরিণত বয়স্কা নারী আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এস মা, এস।" তিনি তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কি বিশ্রী করে চুলবাঁধা! দাসীরা দিয়েছে বুঝি? তুমি নিজে পার না? পাড়াগাঁর মেয়েরা অনেক বয়েস পর্য্যন্ত নিজের গায়ের যত্ন করতেও শেখে না। আমাদের কল্‌কাতায় ন'বছরের মেয়েটিও নিজের চুল নিজে বাঁধতে শেখে। এ কাপড় পরা ত ঠিক হয়নি, জামার নীচে কি শাড়ী পরে!"

নন্দকিশোর সম্পর্কিতা ভ্রাতৃজায়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন, ফিরিবার সময় লইয়া যাইবেন।

এখানকার সঙ্গ গৌরীর পক্ষে লোভনীয় হইল না। জ্যেঠাইমার একটি বিশেষ বন্ধু এখনই আসিয়া পড়িবেন, ইতিমধ্যে এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির সংশোধন আবশ্যক। দাসীকে চিরুণি আনিতে আদেশ দিয়া তিনি তাহার চুল খুলিতে বসিলেন। গৌরী ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া নিরুপায় ক্ষুব্ধ চিত্তে মাথাটা ছাড়িয়া দিল, ভাবিল,—"বেশ ছিলুম সেখানে,—বাবা আমায় কেনই যে আনলে!"

মোহিনী ঝি কেশবন্ধনের পর সাবান দিয়া মুখহাত ধোয়াইয়া দিলে কতকগুলা মৃদু গন্ধ, তীব্র গন্ধ, লাল, সাদা হরিদ্রা বর্ণের তরল পদার্থ দ্বারা জ্যেঠাইমা দেবর কন্যার প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া পছন্দমত ফ্যাসানে শাড়ী পরাইয়া কহিলেন, "দেখ ত কেমন দেখালো! দিব্যি! গড়নটা একটু কাঠ-কাঠ আছে, গায়ে ত মাংস নেই,—ও দুদিনে সেবে যাবে। এস, জলটল খেয়ে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করগে।"

গৌরীর হাত ধরিয়া ভোজন-স্থানে লইয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "এই বয়সে হাত এমন কড়া হয়ে গেছে কেন, গা? সেখানে কাজ করতে বুঝি?"

গৌরী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। "তাই জন্যে এমন ঝান্‌ খেয়ে গিয়েছে! আহা, মা নেই বলেই ত এত কষ্ট।" আহারে বসিয়াও সে দুইএকবার জ্যেঠাইমার নিকট অনুযোগ লাভ করিল, "মেয়ে মানুষের এত তাড়াতাড়ি খাওয়া কি গো! জলের গ্লাসটা নামাবার সময় সাবধান হবে, দেখলেত—হাত থেকে পড়ে গেল, পাশে যদি অন্য লোকের পাত থাকত!" আহারান্তে মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলেই মিতভাষিণী হইলেও চাপা হাসিতে সল্প কথায় পদবিন্যাসে কৌতুক ঝরিয়া পড়িতেছে। তার প্রাণের ভিতরে একটা অব্যক্ত আকুলতা জাগিয়া উঠিল। হায়, তার চাকদা!

বাড়ীর মেজ মেয়েটি একটু প্রগল্‌ভা। সে এই নূতন আলাপীর সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কে তোমার বন্ধু ছিলেন?"

"বন্ধু, কেউত না।"

"কারুর সঙ্গে খেলতে টেলতে না?"

গৌরী ঢোক গিলিয়া বলিল, "খেলতুম বই কি! চুণী, নালু, কালী, আর সবচেয়ে বেশী সত্য দাদার সঙ্গেই খেলতুম।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "সবাই পুরুষ মানুষ?"

"উঁহুঃ,—কালী শুধু মেয়ে, সে তেমন দৌড়ুতে পারত না, কেবলই চোর হ'ত। সত্য দাদা কখনও চোর হ'ত না, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হ'ত,—সেও আমাকে রাগাবে বলে—"

"তুমিও দৌড়োদৌড়ি খেলতে নাকি ?"

"হ্যাঁ ত,—তোমরা খেল না ?"

মেজো মেয়েটি ঘাড় নাড়িল ; সকলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। একজন কহিল, "সত্য দাদা কে ?" গৌরী একবার প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্যের সহিত উত্তর দিল, "সে আমার বন্ধু।"

নূতন বন্ধু কহিল, "সে কি ভাই ! মেয়ে মানুষের বুঝি আবার ব্যাটা ছেলে বন্ধু হয় !" শুনিয়া গৌরীর পক্ষে হাস্য সম্বরণ দুরূহ হইল। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, "কেন হবে না ভাই ? সত্যি করেই সে আমার খুব বেশী বন্ধু !"

ত্রিশ

কলিকাতায় মণীশ যে বাসা ভাড়া করিয়াছিল, তার নীচের ঘরে দিনে পাড়ার গরীব ছেলেদের পাঠশালা ও রাত্রে নৈশ বিদ্যালয় বসিত। এ শিক্ষালয়ে বালির কাগজ ও খাকের কলমের ব্যবস্থা, কালি তৈরি হয় চাল চোঁয়াইয়া দুই একটী জিনিষ দিয়া। বইগুলি মণীশের হাতে লেখা এদের উপযোগী ভাবে তৈরি। মণীশ হাসিমুখে মুখভাঙ্গা কলম কাটিয়া ছাত্রদলকে যোগান দেয়। লেখার ঘটায় ক্ষণে ক্ষণে সমরক্ষেত্রে ব্যবহৃত তরবারিবৎ লেখনী বিগতশীর্ষ হইয়া পুনশ্চ তাহার হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পাঠ-কলরব পাশের কামারের দোকানে লোহা পেটার শব্দ ছাড়াইয়া পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করে, কিন্তু এই অশুদ্ধ অস্পষ্ট উচ্চারিত শব্দলহরী শিক্ষক মণীশের চিত্তে বিশুদ্ধ আনন্দ-রসেরই সঞ্চার করিত। দেশের শ্রমজীবী দলই দেশের আশা—কৃষি কার্য্যে, শিল্পোৎপাদনে বৈজ্ঞানিক আলোচনার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারা ওদের কিছুটা প্রয়োজন। ওদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। মণীশ এদের কথা মুহূর্ত্ত ভোলেনা।

প্রাচ্যে সাহিত্যের আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পুণ্য তপোবন এবং পাশ্চাত্ত্য দেশোন্নতি প্রচেষ্টার ইতিহাস তার জীবনের বিশাল বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। অন্তরের মধ্যে প্রাচ্যকে বরণ করিয়া বাহিরে উদীচির সাধনা ও প্রয়োজনকে সে তুচ্ছ করিতে পারে না। মণীশ জানে প্রতীচ্যে যা পাওয়া যায়, প্রাচ্যে তার অভাব ছিল না, আধুনিক প্রতীচীকে তার আড়ম্বর মুক্তরূপে বরণ করিলে প্রাচ্যকেই গ্রহণ করা হইবে। আর্য্য ঋষিরা স্বদেশ-প্রেমের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই নিবদ্ধ ছিলেন না, যাঁরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই উদ্দেশ্যে মৈত্রী পোষণ করিতেন, তাঁরা দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন নাই,—এত বড় হাস্যকর কথা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ! 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,' সে এই দেশেরই বাণী নয় কি? তাঁরা স্বর্গ কল্পনাতেই মত্ত ছিলেন, মর্ত্তভূমিকে বাদ দিয়া?—

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে সে কিন্তু বড় একটা ব্যবধান

দেখিতে পায় না, চক্র ঘুরিয়াছে মাত্র। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে বৌদ্ধ শাস্ত্রের সার তথ্য দেখিয়া পুলকিত হইল, খ্রীষ্টের জীবনে প্রাচ্য যোগীর সিদ্ধৈশ্বর্য্যের উদাহরণ বিস্ময়ানন্দে উপভোগ করিল, তার ভাবুক চিত্ত কোথাও বাধা প্রাপ্ত হইল না, নিজের দেশকে ও ধর্ম্ম প্রভাবকে সে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইল। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন এক অবিচ্ছিন্ন পরিবারের মত তার চক্ষে প্রতিভাত হইয়া আত্মীযতম হইয়া উঠিল। দুঃখ এই—আদর্শ ক্রমেই যেন ম্লান হইয়া আসিতেছে! যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ কবিতেছিল, ততই অন্তরে একটা গভীর, বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল, মন বলিতেছিল, এ কি হইতেছে! আর কি হইবে? বিবেকানন্দের কার্য্যকলাপ সে সাগ্রহে লক্ষ্য করিত। তাঁহার উপরই দেশেব ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। কত বিনিদ্র রাত্রে সে এমনই তন্ময হইয়া পড়িত যে, তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই সুদূর আমেরিকার বিশাল জনসঙ্ঘপূর্ণ মহাসভা জীবন্তরূপে ভাসিযা উঠিত। লক্ষ লক্ষ নরনাবীব সকৌতুক দৃষ্টিতলে সেই বাল-কান্তি তরুণ মূর্ত্তি বঙ্গ-যুবা, কিশোর বলিলেও চলে,—কি উন্নত-মহামহিমার মুকুটমণ্ডিত শিরে দাঁড়াইয়া! সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসঙ্ঘের মহামনীষীগণের মুকুটমণি ম্লান করিযা এই তরুণ আজ সমস্ত জগতের সাক্ষাতে মহান্ সত্য প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম জগতের বিজয় মাল্য গ্রহণ করিয়াছেন। বিজযী শঙ্করের মতই সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল। তার কানে দূরাৎদূর হইতে অপার জলধি ভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!"—সে মন্ত্র মুগ্ধবৎ যেন কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইত। স্বপ্নভাবময় দুই নেত্র সীমাহীন আকাশে পৃথিবী দ্বাদশ গুণ বৃহৎ সমুজ্জ্বল বৃহস্পতি গ্রহের উপর স্থাপন করিয়া সেই অভয়মন্ত্র আহ্বান যেন স্পষ্টস্বরে ধ্বনিত শুনিত,—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তার উপর হইতে ক্ষুদ্রতার আবরণ খসিয়া পড়িত। নিজের অজ্ঞাতে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হইয়া সেই অসংখ্য গ্রহজ্যোতির্মণ্ডিত অনন্ত রহস্যময় আকাশের মধ্যে নিজের সীমা হারাইয়া ফেলিত। গভীর স্বরে সেই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি তার অন্তরে বাজিয়া উঠিত, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

তাই বলিয়াই কি মণীশ পৃথিবীর সকল চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়াছে? বড় বড় মনীষীরা বিশ্বরহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনকার্য্যে যে মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, ক্ষুদ্র শিশুর চিত্ত-হর ক্রীড়া কৌশল আবিষ্কারেও সে মস্তিষ্ক বাধিত হয় না। চিন্তা ও কল্পনায় বড় বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট রাখিলেও সাংসারিকতাকে সে অবহেলার চক্ষে দেখিত না।

মণীশ কবি নয়, তার আশা-স্বপ্ন মরক্কোমণ্ডিত খাতার পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে না, তাই তার সবটুকুই তার শান্ত হৃদয়ের নিভৃত নিরালায় গোপনে অথচ পরিপূর্ণ শোভা-গৌরবে মধ্যরজনীর রজনীগন্ধার মত বিকশিত হইয়া থাকে। অবকাশ পাইলে একা বসিয়া নিজেই তাব গন্ধাঘ্রাণ করে, চয়ন করিয়া মালা গাঁথে, এই মানস অভিসারে তার অংশী ছিল না। তার আশা, কল্পনা তারই বুকের মধ্যে সোণার হরপে লিখিত হইয়া আছে,—অপরের দৃষ্টিস্পর্শে তারে তাহা পুরাতন হইতে পারে নাই।

মণীশ এখানে একজন সহকর্ম্মী পাইয়াছিল। ছেলেটীর নাম ইন্দুভূষণ। ইন্দু মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে। মেসে থাকিয়া পড়ে, মণীশের সঙ্গে অল্প দিনেই বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সকালে নিজের পড়া থাকে, নৈশ শিক্ষায় ইন্দু মণীশের সহকারী। এক একটা ছুটীর দিনে সে আসিয়া মণীশকে তার গৃহ কোটর হইতে টানিয়া তোলে। সত্য এইজন্য শুধু ইন্দুদা'র উপর ঘোর সন্তুষ্ট। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ইন্দুর মারফৎ মণীশের পুরাতন সহপাঠীরদল হইতে নিমন্ত্রিণ আসিল।

উদ্যান তখন প্রসন্ন সূর্য্যকিরণে অতুল শ্রী ধারণ করিয়াছে। ডেলি পেসেঞ্জারের হাত এড়াইয়া পাখীগুলা কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দ কলরব করিয়া ঘুরিতেছিল, তালীকুঞ্জের শান্তিভঙ্গ করিয়া তরুণ কণ্ঠের তরল হাস্য নিশ্চিন্ত কানন দেবতাকে যেন চকিত করিয়া তুলিল এবং সেই শব্দে কমলদাম কাঁপাইয়া সন্তরণশীল রাজহংসের দল ত্রস্তে গভীর জলে পলাইয়া গেল।

শ্যামল শষ্পাসনে বসিয়া পড়িয়া দুই চারি বন্ধুতে এক অজানিত গাছের পরিচয় লইয়া তুমুল তর্ক পাকাইয়া তুলিল। একদল রন্ধনের জন্য সহস্র শাখা প্রসারিত প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষতলে সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া অগ্রসর হইল। ভাবপ্রিয় তরুণেরা না তর্কে না কর্ম্মে যোগ দিয়া কেহ নির্জ্জন প্রকৃতির

শোভা সম্পদ উপভোগ করিতে লাগিল, কেহ বা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

মলয় রাতে সুপ্রভাতে তারেই আজি পড়ে মনে,
সে যে মিশে আছে ফুলের বাসে—
জেগে আছে পখীর গানে।

নলিনাক্ষ মণীশকে জিজ্ঞাসা করিল, "শচীর 'ক্ষণিকের দেখা'—পেয়েছ ?"

"কই না,—পাইনি তো! ছাপা শেষ হয়ে গেছে না কি ?"

"সে কি ? তুমি জান না ? কয়েকটা বড় কাগজে সমালোচনাও তো বেরিয়েছে,—দেখ নি ?—চমৎকার বইটা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কবি, সত্যই কবি নামের যোগ্য কবি।"

মণীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমি ত কই কিছুই দেখিনি।"

"তা' দেখবে কেন ? আশ্চর্য্য মানুষ তুমি মণীশ! সংসারের কোন ধারই তো ধারো না! কিন্তু শচী আমাদের পাঠালে আর তোমায় বই পাঠালে না, এর মানে কি ? চিঠিপত্র লেখে ত ?"

নৈহাটী ষ্টেশনে বিদায়ের পর শচীকান্ত তাহাকে পত্র লেখে নাই। মণীশ তিনখানা পত্র লিখিয়া আজও উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে। চিরদিনের বন্ধুর ব্যবহারে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া প্রশ্ন করিল, "বই ভাল হয়েছে না ?"

"ভাল ? চমৎকার!"

আরও দুই একটী দল আসিয়া পৌঁছিল। অনুরুদ্ধ হইয়া বেহালা বাজাইল।

কুমুদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল প্রশ্ন করিল, "কি চমৎকার ?"

"শচীকান্তর 'ক্ষণিকের দেখা'।"

"ওঃ,—সেই প্রেমের কবিতা তো ? রাবিস্!" এই বলিয়া সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল, "ছেড়ে দাও প্রেম-গীত ভারত ভিতরে রে।"

নলিনাক্ষ শচীকান্ত-কবির একনিষ্ঠ ভক্ত। সে কুমুদের এই তাচ্ছিল্য সহিতে পারিল না, উত্তেজিত হইয়া কহিল, "প্রেমের কবিতা রাবিস! তাহলে

বল্‌তে চাও, শেলি, বায়রন্‌স্‌ কীট্‌স, সবই রাবিস্‌? মেঘদূত বিহারী যক্ষের প্রেমলিপি যখন, তখন সেও তোমার মতে রাবিস্‌?"

কুমুদ মৃদু হাসিল, "তা'না ত কি!" পরে গাহিয়া বলিল, "জান না কি কিসে সদা তপো নাশ করে রে!"

নলিনাক্ষ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, "বল কি তুমি? সমস্ত সাহিত্যের পুষ্টি, সংসারের প্রধানতম ঐশ্বর্য্য, সেই জিনিষটাকে তুমি—ছ্যাঃ, এমন অর্ব্বাচীনদের মধ্যেও কবির অভ্যুদয় হয়! বল্‌লুম শচীকে ইংরেজিতে বইটা তর্জ্জমা করে ছাপা, তারা যোদ্ধার জাত বটে কিন্তু তারাই ভাল জিনিষের বোদ্ধা। বেনাবনে মুক্তো ছড়ালে এই রকম ফলই হয়! দেখেছ, কাগজগুলো কি বলেছে? তুমি, আমি, রামী শ্যামী 'রাবিস' বল্লেই ত আর রাবিস হবে না। দশের কাছেই সাঁচ্চা ঝুটোর বিচার। বলে কি? বিরহী যক্ষ!—হাঃ কালিদাস! উঃ! কবি কি কথাটাই যে বলে গেছলেন;—'অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্‌ শিরসি মালিখ, মালিখ মানিনি!'

কুমুদ অনুত্তেজিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, রেখে দাও তোমার বিরহী যক্ষ! ঐ দেখ না,—মে-ঘ-দূ-ত! উদ্ভট ব্যাপার! তার চেয়ে পড়—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।' হ্যাঁ, বুঝি, কিছু এতে সার আছে। কাব্য বল ত মেঘনাদবধ একখানা কাব্য ঘটে! 'রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর,—সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে?'—এতে গাম্ভীর্য্য কত, যেমন ভাষা তেমনি ভাব! তা'না প্যানপ্যেনে সুরে নাচারি ছন্দে একঘেয়ে কাঁদুনির গান 'নয়নজলে গেঁথেছি মালা পরাব কায়? তোমার সাথে ক্ষণিক দেখা বিজলী প্রায়',—একে বলে, কবিতা? আরে বাপু 'বিজলী-প্রায়' যার সঙ্গে 'ক্ষণিক দেখা' তার জন্যে এত কান্না-কাটিই বা কেন? যেন কচিখুকী শকুন্তলাটি,—"হলা সহি অনসূয়ে'—বলে নেতিয়ে পড়ে পদ্ম-পত্র পেতে শুলেই হয়।"

"অরসিকেষু রহস্য নিবেদনম্‌"—কবি বড় দুঃখেই একথাটা বলে গেছেন। তাই তো বল্লুম।" নলিন মুখ ভার করিয়া ঘাসের উপর সজোরে ছড়ি ঠুকিতে লাগিল। বেহালা-বাদকের বাজনা আপনার মাধুর্য্যের ভারে

আপনি কম্পিত হইতেছিল। অনেকগুলি শ্রোতা সেখানে জমিয়াছে, তাদের মধ্যে একজন তার্কিকদলকে তাড়া দিয়া বলিল, "আরে ছিঃ! বাজনা না শুনে কতকগুলো অসার জল্পনা নিয়ে কথা কাটাকাটি।—তোদের প্রাণে একটুও রস কস নেই!"

আর একজন বলিল, "তোবা না শুনিস্ নাই শুন্‌বি বাপু, এত বড় বাগান আছে,—উঠে যা'না অন্যখানে। তোদের ও সব লিরিক্‌ফিরিক্ ওর তার তর্কর চেয়ে অমলেব বেহালাব হাত ঢের মিষ্টি।"

ইন্দুভূষণ মণীশেব নিকট সবিয়া আসিল, কহিল,—"চুপচাপ বসে যে? শ্রোতা না অন্য কিছু?"

মণীশ চকিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফিবাইল। তার কর্ণমূল লাল হইযা গিযাছে। কহিল, "অন্য কি?

"এই কবি কিম্বা—? না ছুটোই?"

সে "না?" বলিয়া হাসিতে গেল কিন্তু হাসিটা ফুটিল না। যাহা সে মনে প্রাণে অনুভব করিতেছে, কেমন করিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবে? ব্যথার কবি নয়,—সার্থক কবি। সে মুখ নত করিয়া জলের উপর রাজহংসের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। বেহালাটার তালে তালে পুলকের একটানা স্রোত হৃদয়-তটের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। যদি তার ভাষা জোগাইত সে লিখিত সার্থক কবিয়া প্রেমের বন্দনা গান। ইন্দুর কথা কানে যাইতেই নলিনাক্ষ তর্কের বিরক্তি প্রশমিত কর র্থ অগ্রাহ্যভাবে কহিয়া উঠিল, "ঈস প্রেমিক! কবি! মণীশ?—পুস্তক-কীট মণীশ না হলে—ইন্দু, তুই হাসালি।"

মণীশ মুখটা আর একটু নত করিয়া সলজ্জ হাসি হাসিল! সে হাসিটুকু সুস্পষ্ট অক্ষরে যেন বলিল, "ওগো, মহাদেবকেও বিশ্বাস করো না।—একদিন তরুণী পার্ব্বতী তপোবনে প্রবেশ করে যোগি-রাজেরও তপোবিঘ্ন সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন।'

কুমুদ গুন্‌গুনানি ত্যাগ করিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিল, "পূত রামায়ণী কথা, প্রতাপের বীরগাথা, গাও সবে প্রাণ ভরে নগরে নগরে রে!"

প্রমোদ শেষে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মণীশ ভাবিতেছিল, সে আজ যেন কমলার প্রতি তার অন্তরের আকর্ষণ প্রবলভাবে অনুভব করিতেছে। সে পুস্তক-কীট হোক তার প্রকৃতি গম্ভীর হোক, প্রকৃতির মতই তাহা স্নেহ-প্রবণ। চপলতা শূন্য চিত্ত নিস্তরঙ্গ জলরাশিবৎ একখানি চন্দ্রচ্ছায়াকে প্রতিফলিত রাখে। সে নাই হোক কবি,—সে প্রেমিক তাহাতে সন্দেহ নাই। সূর্য্যাস্ত-সমাধা হইয়া প্রকৃতিকে মলিনতর দেখাইতেছিল। জীবনের পথে প্রবেশোদ্যত তরুণের সহিত জীবনের শেষে প্রস্থানোদ্যত প্রবীণের এক মুহূর্ত্তে যেন চোখে চোখে মিলিয়া রহিল। সারা জগৎ—জড় অচেতন জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তখন তাঁহারই মধ্য দিয়া "তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্" বলিয়া বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাকে বন্দনা করিতেছিল। মণীশ নারবে চাহিয়া রহিল। আসন্ন সন্ধ্যাতলে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর রক্তরাগের মধ্যে একখানি করুণ মুখের ছায়া তার মনশ্চক্ষে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়িল সর্ব্বোভৌমের বাণী "এক ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষরূপে জীব ঈশ্বর রূপে দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।" স্বপ্নমুগ্ধ মণীশ মনে মনে উচ্চারণ করিল, "তাই তোমায় দেখে আমার সব বদলে গেছে কমলা।"

স্বপ্নাভিভূত শিশুর মত মৃদু স্নিগ্ধ হাসি অধরে লইয়া মণীশ প্রবেশ করিতেই সত্য কহিল, একটা চিঠি এসেছে বাবার লেখা। আমাদের বড় দিনের ছুটিতে যেতে বলেছেন বোধ হয়?"

মণীশ খামটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "তোর কেবল বাড়ী যাবার ভাবনা! তবু ত দলের সেরাটি নেই।"

দলের সেরাটি গৌরী। তার আকস্মিক তিরোধানে সত্য আদৌ খুসি হয় নাই, বরং তাহার প্রতি একটা দুর্জ্জয় অভিমান পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। সভ্রূভঙ্গে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া কহিয়া উঠিল—"ওঃ! সে না থাকলেই বা কি বয়ে গেল। বৌদি ত আছে।"

মণীশ চিঠি খুলিয়া সস্নেহ-নেত্রে ভায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসি হাসিল,—কহিল,—"এখানে আমিও ত আছি। আমার চেয়ে বুঝি তোর—যে সে একজন বেশী হল?"

"ও কি দাদা! বৌদি বুঝি যে'সে?" সত্যর স্বর তিরস্কারপূর্ণ। দাদা যেন এই গঞ্জনাটুকু শুনিতে চাহিতেছিলেন, তৃপ্তচিত্তে সকৌতুকে হাসিয়া তিনি পত্রপাঠে মন দিলেন।

কিন্তু এ কি সংবাদ! কাকা লিখিয়াছেন,—"ছুটী হইলেই দুই জনে চলিয়া আসিও। ভ্রাতৃবিয়োগে তোমার খুড়িমা একেই অত্যন্ত কাতর, তাহার উপর সম্পূর্ণ একা,—বিশেষতঃ কমলার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। এ সময় তোমাদেব কাছে পাইলে আমরা একটু শান্তি পাই—"

কমলার জন্য ব্যাকুল? সম্পূর্ণ একা! কি অর্থ ইহার,—অর্থ কি? অপঠিত অংশে হয় ত এ ঘোর সমস্যার পূরণ হইতে পারে, কিন্তু পড়িতে যে আর সাহস হয় না! কমলা কি তবে ঋষিশাপ ভ্রষ্টা কমলাব মতই অতল সমুদ্রের তলদেশে অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হইয়াছে?—সে কি তবে নাই?

একত্রিশ

শচীকান্ত যখন রত্নপুকুরে ফিরিয়া আসিল, গিরিজাসুন্দরী ও কল্যাণী উভয়েই অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। কয়লার চুল্লী হইতে সদ্য উঠিয়া আসিলে মানুষের যেমন চেহারা হয় তাহাকে তেমনই দেখাইতেছিল। প্রশ্নের উত্তরে কহিল, "অসুখ করেছিল।"

মাসি কহিলেন,—"মবে যাইবে! শরীরটা একেবারে কিছু না। একটু অনিয়ম হলেই রাংয়ের মত গলে যায়। যেন ডাইনে চুষে খেয়েছে!" অকস্মাৎ অত্যন্ত গুরু আঘাতে মানুষ অনেক সময় যেন কি এক প্রকার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়,—সেও তাই হইয়াছিল। এ আঘাত যে তার স্বপ্নেরও অগোচর!

গিরিজাসুন্দরী কযদিন ছেলের অসুখ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, মুখে তার একটা আরোগ্যহীন ক্লান্তির ঘন ছায়া মৌরসী পাট্টা লইয়া বিস্তৃতই হইতে থাকিল, তখন হঠাৎ মনে হইল অসুখটার মূল শরীরে না হইয়া হয়ত মনে। একদিন গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন,—"এমন হয়ে যাচ্ছিস্ কেন, বল্‌ত শচি? কি ভাবিস্? মনে একটুও সুখ নেই কেন তোর?"

মানুষের মন যখন বড় দুর্ব্বল থাকে, তখন সে নূতন কোন সুখ দুঃখ বা সহানুভূতির ভর সহিতে সমর্থ হয় না। মাসিমার আদরে তাই অকস্মাৎ তাহার ব্যথিত চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল; দুই চোখের কোণে জল দেখা দিল। দৃষ্টি নত করিয়া গাঢ় স্বরে কহিল,—"কি আর ভাববো মাসিমা?"

"তাই ত বল্‌চি, তোর আবার ভাবনা কি? আমি যত দিন আছি, তুই নিশ্চিন্তি থাক্। আমার যা কিছু আছে, দু ভাগ করে দেবো!" শচীকান্ত গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এ আশ্বাস আজ আর তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়,—সাংসারিক লাভ ক্ষতি আজ তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর এক দিন গিরিজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ছোট বউয়ের বাপ বলে পাঠিয়েছেন, যে পাত্রটি বসীর জন্য ঠিক করেছিলেন, সেটি বে-হাত হয়ে গেছে,—তোর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর খুব ইচ্ছা, কি বলিস্?"

শচীকান্ত কোন কথা বলিল না। সে কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যে আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে, তাহারই স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া কাঁদা ভাল, না, হাহাকার রুদ্ধ করিয়া নবীন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত? একজন তার করতলাযত্ত অপর অতলে তলাইয়া দিযাছে। কিন্তু মন সেই প্রার্থিত-দুর্ল্লভের জন্যই যে অস্থির! তাহাকে নীরব দেখিয়া গিরিজা প্রসন্নমুখে কন্যাকে কহিলেন,—"তোর কথাই ঠিক রে! বসীকে বিয়ে কর্‌তে শচীর অমত নেই।"

শচীকান্ত মাসিমার মনের কথা বুঝিতে পারিল না, সে গভীর চিন্তায় আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছিল, তেমনই অর্থহীন, আশাহীন, নিরানন্দ চিন্তাস্রোতে সে ভাসিতে লাগিল। প্রাণটা তাহার অকূলের তীরে পারের-যাত্রীর মতই হতাশ্বাসে ক্রমাগত লুটাইয়া পড়িতেছিল, কেবলই মর্ম্মভেদী স্বরে বলিতেছিল,—তাহাকে আর না দেখিতাম সেও সহ্য হইত, কিন্তু এ যে অসহ্য!—অসহ্য! আজ এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ কি বজ্রঘাত? সে দিনের প্রভাতে যে তরুণী তার চিত্ত-বীণার তারে তারে যে-ঝঙ্কার তুলিযাছিল, আজও তার ললিত সুর তো শুব্ধ হয় নাই। সে যে তার সমুদয় আশা-তৃষ্ণাকে সহসাই জাগাইয়া তুলিয়াছিল, আজও সে তৃষ্ণা যে তেমনই প্রবল। সঙ্গীতের সুরে, পুষ্পবাসে, পত্র-মর্ম্মরে, জীবন-নিকুঞ্জে সে যে নিয়ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

এই সুগভীর হতাশার মধ্যেও বিন্দুমাত্র সংশয়পূর্ণ আশা শচীকান্তর চিত্তকে স্পন্দিত করিতেছিল। মণীশ লজ্জায় অস্ফুট কণ্ঠে যাহাকে তার বাগ্‌দত্তা—বধূ বলিয়া উল্লেখ করিল, বহু পূর্ব্বেই যে শচীকান্তর সঙ্গে তার বাগ্‌দান হইয়া গিয়াছে,—এ কথা তাহারা কেহই জানে না। তার ধর্ম্মভীরু বাপ নিশ্চয় এ সংবাদ পাইলে কমলাকে মণীশের পরিবর্ত্তে শচীকান্তর ভাবী বধূরূপেই অঙ্গীকার করিবেন। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত দ্বিধা সরাইয়া তাঁহাকে সে পত্র লিখিল,—

"প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

বহুদিবস আপনার পত্রাদি প্রাপ্ত না হইয়া চিন্তিত আছি। এখানকার সমস্ত কুশল। আপনার নিকট একটি বিশেষ নিবেদন আছে, এই পত্র পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ হইবে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহা আপনি

শিবু-কাকার মারফৎ আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। যে অনাথা বালিকা শিবু কাকার বাড়ীতে আশ্রিতা রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একমাত্র অভিভাবক নিখিলনাথ বাবু তাহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আপনার আদেশ আনিতে আমাকে অনুরোধ করেন; আপনার আদেশ পাইলে তিনি ঐ কন্যা অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেন না, আমার সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তাও হয়। আপনার লিখিত আদেশ লইয়া ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম আকস্মিক বসন্তরোগে নিখিলনাথ মারা গিয়াছেন,—কমলা ও তাহার পিতামহী কোথায় গিয়াছেন কেহই বলিতে পারিল না।

সে পর্য্যন্ত বহুস্থানে তাহাদের সন্ধান করিয়াছি, সন্ধান পাই নাই। শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্তবয়স্কা বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিণীতারূপেই গণ্য হয়। যাহাকে মণীশের বাগ্‌দত্তা বলা হইতেছে, সে পূর্ব্ব হইতেই উৎসর্গিত। আশা করি, আপনি এ বিষয়ে অনুধাবন পূর্ব্বক যথোচিত মীমাংসা করিবেন। মণীশ আমার আবাল্য বন্ধু, কিন্তু ধর্ম্ম তাহা অপেক্ষাও বড়। আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। সেবক—শচী"

পত্রখানা স্বহস্তে রেজিষ্ট্রি করিয়া আসিয়া সে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। মন যখন নানা ছুতায় খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠে, সে তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলে, এতই কি ভয়? লোকে বলে তিনি ন্যায়বান্, আমার বেলায় ন্যায় বিচার করিবেন না? মণীশ হয় ত দুঃখিত হইবে—কিন্তু সেই মণীশ,—সেই নারীদ্বেষী শঙ্করাচার্য্য, তার এতে কতটুকু ক্ষতি? হয় ত এ বোঝা নামাইতে পাইলে সে তাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া পারিবে না।

গিরিজা ও কল্যাণী দেখিল, এত দিন পরে শচীকান্তর মুখের ক্লিষ্ট ভাবটা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। উভয়েই প্রসন্ন চিত্তে ভাবিল,—খেয়াল বাস্তবের নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে, বাসন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শচী অনুশোচনা ভোগ করিতেছিল, এত দিনে দূর হইয়াছে।

সে দিন চন্দ্রগ্রহণ। প্রাচীনা আত্মীয়াদের সহিত ছপ্পর ঘেরা গো-যানে চড়িয়া গৃহিনী স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নদীতীরে যাত্রাকালে কল্যাণীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "ওরে, তোরা এই বেলা খেয়ে দেয়ে নে' না,—কখন গ্রহণ লেগে যাবে, খাওয়া হবে না শেষে।"

শচীকান্ত ইজি-চেয়ারে পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল,—কল্যাণী ডাকিল, "ছোট্‌দা!"

"কিরে?"

"খাবে এস। গ্রহণ লাগবে কোন্‌ সময়!"—শচী কহিল, "লাগবে—লাগবেই,—তার জন্যে এক্ষণি খেতে গেলাম কেন?"

কল্যাণী বিস্মিত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"ওমা, গ্রহণের সময় বুঝি খেতে আছে? গ্রহণী রোগ হয় যে!"

"কারও হতে দেখেছিস?"

কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল, "কেউ খায়, যে হবে? এস, এস, গ্রহণ-পাওয়া খাবারে পাপ স্পর্শ করবে। ফেলা যাবে সব।"

শচী কয়দিন পরে একটু লঘুচিত্ত হইয়াছে; স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের লোভ ছাড়িতে পারিল না; হাসিয়া কহিল, "পাপ লাগবে? আকাশের চাঁদে লাগবে গ্রহণ, আর মর্ত্ত্যবাসী বেচারা আমাদের খাবাবগুলিতে লাগবে পাপ,—কোন্‌ অপরাধে?"

কল্যাণী এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মুখ চূণ করিয়া বলিল' "কি জানি ভাই, সব্বাই এ কথাই ত বলে, যে রাহু চাঁদকে খেয়ে ফেলে কি না, সেই জন্যে।"

"খেয়ে ফেলে না তোর মুণ্ডু করে! পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লেই চন্দ্র-গ্রহণ হয়।"

তাদের বিলম্ব দেখিয়া এই সময় গিরিজাসুন্দরী ডাকিতে আসিতেছিলেন, শচীকান্তর কথা কানে যাইতেই কহিয়া উঠিলেন,—"তোদের যত গাঁজাখুরি। চিরকাল ধরে রাহু চাঁদকে গিলে ফেলে শুনেও এলুম, দেখেও এলুম,—এখন বলে, 'পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ে।' অবাক্‌ কর্‌লি! যা, যা, খেতে যা, দেরী হয়ে যাচ্চে, আমি চল্‌লুম।"

আহারে বসিয়া কল্যাণী বলিল, "গ্রহণের সাতদিন কেটে গেলে পাকা দেখা করে এইবার বিয়ের দিন ঠিক হবে, ২৮শে অগ্রাণই আমার ইচ্ছা, বিয়েটা হয়ে যায়। এখানে পৌষ মাস পড়ে যাবে, আমাকেও আর তাড়াতাড়ি যেতে হবে না।"

শচীকান্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল ; কহিল,—"কার বিয়ে রে ?"

"যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই,—তাই হয়েছে। তোমার বিয়ে আবার কার ?

"আমার বিয়ে ? কার সঙ্গে ? সে কি ? শচীকান্ত অন্নগ্রাস পাতে নামাইয়া রাখিল।

কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল, "কি যে বল ! কার সঙ্গে ? কেন, বাসন্তীর সঙ্গে ! বিয়েতে তোমার মত আছে—মাকে বলনি ?"

"আমি ? না, কোন দিন না। কে' বল্লে, আমি বলেছি ?"

কল্যাণী ভ্রাতার উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "তবে বোধ করি মার বুঝবার ভুল। বাসন্তীকে বিয়ে করবে না, তা হলে ?"

শচীকান্ত পরিত্যক্ত আহার্য্য পুনগ্রহণ করিয়া কহিল, "না, কোন মতে না, অসম্ভব !"

ক্ষুব্ধা কল্যাণী কিছু না বলিয়া যথাকার্য্য-সম্পাদনে মনোযোগী হইল। ক্ষণপরে প্রথম উত্তেজনাটা ঈষৎ প্রশমিত হইলে, তাহাকে একান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া শচী একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছায় কহিল, "কেন জানিস ? আমি তার সন্ধান পেয়েছি।"

সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কল্যাণী কহিল, "সত্যি ?"

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। যথাসময় কাশীধাম হইতে পত্র আসিল। তাহাতে অন্যান্য কথার সহিত লিখিত ছিল –

"তোমার বুঝিবার ভুল ! কমলা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মণীশেরই বাগ্‌দত্তা বধূ। নিখিলনাথ তোমায় যথাশাস্ত্র বাগ্‌দান করেন নাই। অতএব বন্ধুপত্নীবোধে তাহার সহিত স্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক চিত্ত হইতে ছিন্নভাব বিদূরিত করিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার চিন্তার বিষয় জানিতে পারিলে মণীশের পক্ষে অত্যধিক ক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব। সে তোমার প্রকৃত বন্ধু, বন্ধুর সুখে ঈর্ষা করিও না। শাস্ত্রে আছে,—'ব্রহ্মহা মুচ্যতে লোকে মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।'— বাসন্তীকে বিবাহ করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

হায় শাস্ত্র! হায় নীতি! হৃদয় লইয়া কোথাও কি বিচার নাই? পাষাণস্তূপবৎ দুর্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রবিধি সর্ব্বস্থানেই মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য খাড়া হইয়া আছে। যাহাকে সে শয়নে স্বপ্নে এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া ধ্যান করিয়া আসিল, মুহূর্ত্তে কে তাহাকে কাহার হাতে সঁপিয়া গিয়াছে সেই হেতু সে আর তাহার কেহ নয়?—নিষ্ঠুর বিধান!

বত্রিশ

গৌরী যেদিন চাকদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল, সেদিন দ্বিপ্রহরে সে যখন কমলার কাছে বিদায় লইতে গিয়া নির্ব্বাক বিষাদে দাঁড়াইয়া রহিল, কমলা তখন সত্য সত্যই তাহার বিচ্ছেদ চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। এই একান্ত সরলা মেয়েটি ভিন্ন তার এখানে সাথী বলিতে কেহই ছিল না। সে যখন হাসিবার চেষ্টা করিয়া সজলনেত্রে কহিল, "তোমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে,—না গৌরী?" তখন বারুদ-স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিলে অকস্মাৎ যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনই করিয়া তাহারও চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে সে কহিল, "মোটে না, একটুও না, সত্যদার সঙ্গে একবার দেখাও হল না, আর বোধ হয় হবেও না।"

গৌরী চলিয়া গেলে কমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খিড়কির নিকট হইতে সরিয়া আসিল। ভ্রাতৃশোকাতুরা করুণাময়ী পাশের ঘরে মাদুরের উপর শয়ন করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। কমলা তাঁহাকে নিদ্রিতা বোধে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। মধ্যাহ্নে চারিদিক মধ্যরজনীর মতই নিস্তব্ধ। ভিজা চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া সে সেলাই করিতে বসিল। কিন্তু ভাল লাগিল না। বহুক্ষণ চেষ্টার পর একটি ছোট ফুল সমাপ্ত হইলে, সূঁচ ও সূতা ও কার্পেট যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এবাড়ীর ছোটখাট কাজগুলি আপনা হইতে তাহারই উপর স্বতঃই পড়িয়াছিল। ঘরটা গুছাইয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া পুনশ্চ সে সেই আমবাগানের দিকের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমনই তার মনে পড়িল, গৌরী গা ধুইতে আসিয়া এই জানালাটার নীচে হইতে তাহার সহিত কথা কহিত। বক্ষ উদ্বেল করিয়া নিশ্বাস উত্থিত হইল। "গৌরী বাপ পেলে,—সব পেলে, আমার দাদা যদি এমনি কোন দেশে থাকতেন!"

সে রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে চাহিল, "আমার কেউ কোথাও নেই। এত বড় দুর্ভাগ্য নিয়েও মানুষ জন্মায়?"

বিষাদের ভারে বুকখানা তার ভারী হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি

অশ্রু-বাষ্পে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, পরাশ্রিত পর-প্রত্যাশী জীবন—পরের সংসারে সে একটা ভারমাত্র।

কিন্তু জলে আর্দ্র জলছবির অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া যেমন সমুজ্জ্বল বর্ণ বাহির হয়, তেমনই তাব অশ্রুকম্পিত নেত্রের সম্মুখে মণীশের মূর্ত্তি স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। সে দুর্ভাগিনী? এই স্নেহ, এই সান্ত্বনা—এ কি তার পক্ষে বিধাতার অল্প দান?

পায়ের উপর স্পর্শ অনুভব করিযা করুণামযী কহিলেন, "গৌরী চলে গেল! আহা, বাছা আমাব সত্যদা সত্যদা কবে খুন।"

"ওদের দুজনের বিযে হলে বেশ হয়; না, মা?—তাই কেন 'দিন না' এই কথাটুকু বলিবার জন্য কমলার মনটা অনেক দিন হইতেই ছট্‌ফট করিতেছিল।

ক্ষীণ হাস্যের সহিত করুণামযী উত্তর করিলেন, "তা কি হয়, ওঁবা যে বারেন্দ্র।"

কমলা রাঢ়ী-বারেন্দ্রের প্রভেদ বিশেষ কিছুই বুঝিল না। কহিল, "ওঁবাও ত ব্রাহ্মণ।"

"ব্রাহ্মণ হলেই কি হয়? ব্রাহ্মণেও কত ভেদ আছে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক। তার মধ্যে আবাব কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয়। তা ছাড়া মেল টেল, কার সন্তান, ক-পুরুষে, ওসব নানাখানা দেখতে হয় মা! এখন লোকে তবু অনেকটা কমিযে দিয়েচে। এই যে তোমাব মামারাই দেখ না—বংশজ তো তবু তোমার মাকে ওঁরা বেচা না করে দানে দিয়েছিলেন, তাই তোমাকে এদের কুলীন-ঘরে নিতে পারা গেল। যদি বেচা কেনার ঘরেই দিতেন"—কথাটা উল্টাইয়া কহিলেন, "আমাদের বিয়ের সময় দেখেছি, কুলটাই আগে দেখা হ'ত। কুলীনের ছেলের অনেকগুলো বিয়েও ত এই করেই দাঁড়িয়ে গেছ্‌ল। সব্বাই কুলীনে মেয়ে দিতে চাইত, তা মেয়ের তাতে যেমনই দশা হোক্‌।"

কমলা নীরবে শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। যাহার যেখানে ব্যথা, সেইখানেই আঘাত লাগে। করুণাময়ীর অসতর্ক কথাটায় তার মনো বেদনায় একটু চাড় পড়িল। ইঁহারা তাহাকে কোথা হইতে তুলিয়া

লইতেছেন। প্রতিবেশী পাঁচজনের মুখে সে শুনিয়াছে, কুলীন-সন্তান মণীশ সুন্দরী পাত্রীর সহিত অযুত মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেও সক্ষম ছিল।

কমলাকে নীরব দেখিয়া করুণাময়ী মাথা তুলিয়া চাহিলেন। তাহার স্থির বিষণ্ণতা তাঁহাকে ব্যথিত করিল। উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "কদিন ভাল করে দেখতে শুনতেও পারিনি,—চিরুণি দড়ি নিয়ে আয় মা, মাথাটা বেঁধে দিই। ভাগ্যে তোকে পেযেছিলুম কমল! ছেলেবা ত ঘরে থাকেই না, তোকে নিয়ে আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়।"

পুলকিত-চিত্তে কমলা আদেশ পালনের জন্য উঠিয়া গেল। সে যে ইহাঁদের কোন কাজে লাগিতেছে, ইহা শুনিলেও তার কিছুটা কুণ্ঠা কমিয়া আসে।

পরদিন প্রভাতে কমলা স্নান সারিয়া হলুদ চেলির শাড়ী পরিয়া পূজা আযোজনে নিবিষ্ট হইল। সব কার্য্য সারিয়া চন্দন ঘষিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল, শিবনারায়ণ করুণাময়ীব উদ্দেশে ডাকিলেন।—"শুনে যাও।"

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কহিলেন, "কি করা যায় বল দেখি? করালীচরণ ত বড়ই ফ্যাঁসাদ বাধিয়েছে। সে এই ভোরে এসে উপস্থিত—বলে, কমলাকে এক্ষনই নিয়ে যাব। না দাও ত পুলিশ এনে মেয়ে আদায় করবো।"

করুণাময়ী বিস্ময়-ধ্বনি কবিয়া উঠিলেন, "বল কি?"

অন্তরালে আর একজন তড়িতাহত হইল! শিবনারায়ণ চিন্তিত মুখে কহিলেন, "আর বল কি? অতি ভয়ানক লোক! ত্রিবেণীতে সে দিন প্রথম যখন তাকে আমি কমলার কথা বলেছিলাম, তখন কি রকম তাচ্ছিল্য দেখালে।—কিন্তু তার পর যখন আমি তাকে কন্যা সম্প্রদানের ভাব নিতে অনুরোধ করি, আর তার কোন খরচ পত্র লাগবে না, শুধু সার্ব্বভৌম মশায়ের বাড়ী থেকে সম্প্রদানটা করে যাবে, এই কথাটা বুঝিয়ে দিই,—তখনই ও কি মতলব এঁটেছিল। বলে উঠল,—'কিন্তু জানেন ত, আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ের আমরা কিছু প্রণামী পাই। সেটা অবশ্য বিবেচনা করেচেন?' তার মানে উনি মেয়েটির অভিভাবকত্ব নিয়ে তাকে আমার কাছে বেচতে চান, স্পর্দ্ধা দেখ! বলে ফেল্‌লাম,—'প্রণামী মণীশ

তার মামাশ্বশুরকে যেমন পারবে, ছদশ টাকা দেবে বই কি। কিন্তু মশাই, আপনি যে প্রকার প্রণামীর প্রস্তাব করলেন, কুলীন-সন্তান এতে অপমান জ্ঞান করে।' তোমার সেই বিপদ আপদের মধ্যে আর এসব কথা তোমায় বলিনি। কথায় কথায় বেশ একটু বচশাও হয়ে গেল। উনি বলেন, 'তবে আমি এ বিয়েতে পাযেব ধূলাও দেব না।' আমিও বলি, আমরা তাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ কবিব না। ভক্তিনাথ কন্যা সম্প্রদান করবেন, আপনাকে একবার জানান আমাব কর্ত্তব্য ছিল, চুকে গেছে। এখন দেখছি কর্ত্তব্যটা নেহাৎ অপাত্রেই পালন করতে গেছলাম। আজ হঠাৎ মতলব এঁটে এসে উপস্থিত; বলে, 'আইন-মতে আমাব ভাগ্নি আমার অধীন; আমি তাকে এক্ষণই নিযে যাব। সে পবের বাড়ী পড়ে থাকে কিসেব জন্যে। এতদিন ঘুমুচ্ছিলি, না মরেছিলি?'

"উপায়?" করুণামযীর গলা বুজিয়া গিযাছিল।

"উপায় ভগবানের দয়া, কবালীচবণের সুমতি।"

শিবনারায়ণের চিত্তে করুণাব অভাব না থাকিলে আরও একটা জিনিষ ছিল, কঠোর বিচার। অত্যাচারীর প্রতি ন্যায়-নিষ্ঠের স্বাভাবিক ঘৃণা সহজেই তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তোলা এবং ঘৃণা ক্রোধের মূর্ত্তি পবিগ্রহ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। এ তেজ অন্যাযেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ইহা প্রকৃত ব্রহ্মতেজ—ভীরু অপবাধী ইহা সহ্য করিতে পারে না। যাহার প্রকৃতিতে যাহা নাহ, সে সেই বস্তু সহিতে অক্ষম। তাই জগতে এত ভেদ সংসারে এত দলাদলি। সে দিন করালীচবণের নির্লজ্জ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ শিবনারায়ণ ঘৃণার সহিত যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তাহার মধ্যে যে কতখানি বিষ নিযুপ্ত রহিযাছে, তিনি তাহা ধারণা করিতেও পারেন নাই। নিজের মেয়েটিকে চল্লিশ বৎসর বয়সের একটি বাজার সরকারের হাতে দিয়া সে চারি শত টাকামাত্র পাইয়াছে। শিবনারায়ণের মত লোকের কাছে সহস্রাধিক মুদ্রা আদায় না করিয়া কি ছাড়িতে পারে? গঞ্জিকা-সেবনের আড্ডায় উপদেষ্টার অভাব নাই। মতলব ঠিক করিয়া আইন আদালত বুঝিয়া আসিয়াছে।

করুণাময়ী কহিলেন, "যা চায়, তাই দিয়ে চুকিয়ে দাও, উপায় কি?"

সহসা এই গর্হিত উপায় অবলম্বনে শিবনারায়ণ স্বীকার পাইতে পারিলেন না।—"ছোট লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি মেয়ে বিক্রির সাহায্য করবো ?" এইকথা বলিয়া কমলার কথা স্মরণ করিয়া স্বর নামাইলেন—"দেখা যাক, ভক্তির সঙ্গে পরামর্শ করি, অপমান স্বীকার করতে হবে, দেখচি।" বলিতে বলিতে চিন্তাকুলভাবে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কমলা সবই শুনিয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া উঠিয়াছে, স্খলিত-পদে সে দ্বারের কবাটে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। এ কি তার কাম্য ফল ? কাল সে পরের সুখে ঈর্ষা করিয়া নিজেকে যে পরাশ্রিতা বোধ করিয়াছিল, আত্মীয় খুঁজিয়াছিল, তাই কি এখানকার আশ্রয় তার ফুরাইল ? কিন্তু তুমি ত সবই জান অন্তর্য্যামি। তুমি প্রাণের লেখা পাঠ করিতেছ,—সে লেখার অক্ষর পড়িতে তোমার ত ভ্রম হওয়া সম্ভব নয়। সামান্য মুহূর্ত্তের সেই পাপ—তারই এত বড় কঠোর দণ্ড বিধান তুমি কি করিতে পার ? জ্বলন্ত চিতালোকে মণীশের মূর্ত্তি কমলার মানসপটে উজ্জ্বল আভায় ফুটিয়া উঠিল। নিজেকে সে সেই মূর্ত্তির পদপ্রান্তে সঁপিয়া দিয়া অবরুদ্ধ-বাক্ হইয়া মনে মনে বলিল, "আমি তোমার পায়ে স্থান চাই ;—আর কিছুই চাই না।"

করুণাময়ী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। করুণাময়ী তাহাকে বুকে টানিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তেত্রিশ

জীবজগতে মানুষের স্থান সকলের উর্দ্ধে; কেন না সেই শুধু আহার নিদ্রা প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ জৈবিক ক্রিয়া ব্যতীত বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যখন স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে পশু অপেক্ষাও অধম হইয়া উঠে। করালীচরণ যখন তার স্ত্রীকে গিয়া বলিয়াছিল, "দেখ্‌চিস্‌ কি? বড় লোকের স্ত্রী হলি বলে!" তখন রোগ-শয্যা দারিদ্র্য ও অত্যাচার নিপীড়িতা সত্যকালী তার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু স্থির করিয়া ভাবিল,—"পাগল হ'ল না কি!" করালীচরণ সতেজে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে আত্মগতই কহিল,—"কেন আমি এমন সুযোগ ছাড়বো? আমার ভাগ্‌নি,—শুন্‌চি, আর কেউ ওর নেই; আমিই ওর অভিভাবক,—কেন দাঁও মারবো না? কেবলই নেই, নেই নেই। কচি খুকি বিছানায় পড়ে হাঁপাচ্ছেন, ওষুধ গেলাও পথ্যি জোগাও কোথা থেকে আসে? আমায় কি কেউ ছেড়ে দেয় যে আমিই লোককে ছেড়ে দোব? কক্ষনও না,—হাজার টাকার কম নয়।" সত্যকালী মুখ ফিরাইয়া বিকৃত মুখে কহিল, "মদ গিলে মরেচ, এতে ত পয়সা লাগে না? ঘরে একটু মিছরি নেই যে কাশির সময় মুখে দিই। মরণ হলেই হাড়টা জুড়োয়!" কথাগুলো করালীর কানে গেল, সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "মলে ত আমিও বাঁচি,—মরিস্‌ কই?"

শিবনারায়ণ ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার দ্বারাই করালীচরণকে জানাইলেন,—"বাগ্‌দত্তা কন্যা লইয়া তিনি কি করিবেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা তাঁহাকে এক হাজার টাকা দিতেছেন সব দাবী দাওয়া ছাড়িয়া যান।" করালীচরণের চক্ষু ফুটিল! আপনা হইতে যখন হাজার টাকা দিতে চাহিল, ডাল নাড়া দিলে না জানি, আরও কি হয়! সে মাথা চুল্‌কোইয়া কাসিয়া বলিল, "তা, তা, উনি বড় ভাইয়ের মত যা আজ্ঞা করবেন না'ত বলতে পারিনে, তবে সংসারে বড়ই অভাব, যা দিচ্চেন,—দয়া করে আর পাঁচটি শো!"

শিবনারায়ণ গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "যা বলেছি, ওই পর্য্যন্ত।"

করালীচরণ তাঁহার স্বরের দৃঢ়তায় একটু থতমত খাইয়া গেল। তথাপি চেষ্টা ছাড়িল না; "নিদেন আর দুটি শো।"

"শাক মাছের মত ঘরের মেয়ের দর করতে লজ্জা করে না? এক পয়সাও নয়।"

অধিক নিঙ্‌ড়াইলে লেবু তিক্ত হইয়া উঠে, জানা ছিল; সে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু যখন কথাটা কমলার কর্ণে প্রবেশ করিল, ধিক্কারে তার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ছি, ছি, কি ঘৃণ্য জীবন তার! অর্থ মূল্যে এই দেহখানা বিকাইতে হইবে? এর চেয়ে কাশীর সেই অসহায় অবস্থাও যে ভাল ছিল! সে করুণাময়ীর নিকটে গিয়া ডাকিল, "মা!"

"কি মা?" সস্নেহে করুণাময়ী তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি দ্বারা তার হৃদয়ের সমস্ত তাপ দাহ প্রশমিত করিতে চাহিলেন।

"মা! তোমরা আমার মামার কাছে টাকা দিয়ে আমায় কিনবে? তা'হবে না।"

অবিচলিত দৃঢ়তায় তার নম্র দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

করুণাময়ী চমকিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা! কেনা আবার কি? উনি যদি দুটো টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান;—ভালই ত। তোমায় আমরা পাবো সেই ত ঢের। তোমার কাছে কি ও ক'টা টাকা বেশী?"

মন মানিতে চাহে না। দাম দিয়া তাহাকে ক্রয় করিবে? কমলা নিজের অস্তিত্বটাকেও নিজের বলিতে পারিবে না? দৃঢ় স্বরে সে কহিল, "লোকে কি বলবে? এ হতে পারে না।—না মা!"

লোক লজ্জা করুণাময়ীর মনেও না ছিল, এমন নয়। তিনি উত্তর করিলেন, "কে জানবে? কেন মা এটাকে বড় করে দেখচো? তুমি কি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও?"

এ কথায় কমলার দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে সলজ্জ অনুতাপে মনে করিল, এ স্নেহের নিকট আত্মবিক্রয় করা কি এতই কঠিন? কিন্তু না, সে ত তাঁদের স্নেহমূল্যে মন-প্রাণ সবই দিয়াছে। কিন্তু ক্রীতদাসীর মতন দেহ বিক্রয়! এত বড় হীনতা রক্ত মাংসের শরীর বহিয়া কে স্বীকার

করিতে পারে? অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় বুঝিয়াই মুখে আর কিছুই বলিল না; মনে মনে বলিল, "অসম্ভব! মরিয়া গেলেও এ পারিব না।"

বিদায় কালে করালীচরণ ভাগিনেয়ীকে দেখিয়া যাইতে চাহিল। স্বাভাবিক মমতা না থাকিলেও হাজার টাকায় অকস্মাৎ মমতা জন্মায় বই কি। এ দেখা সাক্ষাৎ শিবনারায়ণের মনঃপুত ছিল না, কিন্তু করুণাময়ীর করুণা এ বাধা মানিতে চাহিল না, "আহা, হাজার হোক্ মামা তো বটে। একবার চোখে দেখ্‌বে না?"

কমলা নিজেও বলিল, "দেখা করায় দোষ কি? সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, হয়ত তাহাকে দেখিলে তার মাতুলের মন একটু কোমল হইলেও হইতে পারে।—আর তা যদি হয়, সে একবার তার মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুনয় করিয়াও দেখিবে। মানুষের ত প্রাণ—গলিবে না কি?

কিন্তু মানুষ জগতে যত কিছু ভ্রম করে অন্য লোকের প্রকৃতি বুঝিতে যাওয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অপাত্রে করুণা এবং অযোগ্যে বিশ্বাস এ দুইটি-ই ধ্বংসের কারণ। কমলা সন্দেহ মন্থর গতিতে গিয়া মাতুলকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করালীচরণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রহিল,—এই কমলা! এ তার ভাগ্নি?

কমলার মুখ ফুটিতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া চোখ তুলিল। এ সুযোগ ব্যর্থ হইলে আর ত মিলিবে না? কিন্তু মাতুলের দিকে চাহিয়া সে আর কিছুই বলিবার চেষ্টা করিল না। মূর্ত্তিমান্ নিরাশাকেই যেন সে সেই কুব্জাকৃতি, রক্তনেত্র, শীর্ণদেহে প্রত্যক্ষ করিল। জগতে এত বড় নির্ব্বোধ কেহ নাই, যে এই মূর্ত্তিমান্ লোভ ও নির্ল্লজ্জতার নিকট কৃপাকণার আশা করিতে পারে। মাতুল বহুক্ষণ পরে সম্ভাষণ করিলেন, "তুমি কমলা!—নারাণীর মেয়ে?"

তাহার বিস্মিত নেত্র হইতে প্রচণ্ড লোভের রুদ্র ক্ষুধা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শিকারী শিকারের দিকে চাহিয়া যে দৃষ্টিতে বলে, "তোমার গায়ে এতখানি রক্তমাংস আছে,—তা'তো জান্‌তাম না!"—এ দৃষ্টিও সেইরূপ।

কমলা মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "হ্যাঁ।"

"তাহলে দু'হাজার টাকার এক পয়সা কমেও আমি রাজি হচ্চিনে।"

ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া গিয়া কমলা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। হায়, পৃথিবী যদি তাহাকে গ্রাস করিত !

কিন্তু এই সুস্পষ্ট ঘৃণা ঘৃণার্হের মনকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। বসন্তের নবপুষ্পসম্পদ-বিভূষিত কাননশ্রী উদ্যান-পালকের চিত্তে লাভের চিন্তামাত্রই উদ্রেক করে, হস্ত কণ্টকে বিক্ষত হইলেও ফুটন্ত গোলাপকে লাভের খতিয়ানে সে চয়ন করিতে ছাড়ে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থপর মানুষ পশু অপেক্ষাও হিংস্র,—পিশাচ হইতেও ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ দারিদ্র্যগ্রস্ত চরিত্রহীন লোকের মত হীনতম মানুষ সংসারে অল্পই জন্মায়, ইহারা নেশার কড়ির জন্য এমন পাপ, এমন অপরাধ নাই যাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে। নিঃস্বার্থ লোকের সঙ্গে তুলনা করিলে মনে হয় এরা দুজনে এক সৌরজগতের জীব নহে। করালীচরণ অনায়াসে দম্ভ করিয়া জানাইল,—"এমন মেয়ের দর দু' হাজারের একটী পয়সা কম হতে পারে না।" হাজার টাকার উল্লেখ করিয়া তিনি তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

শুনিয়া শিবনারায়ণের দুই চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, তথাপি আত্মসংযম করিয়া কহিলেন,—"ভদ্রলোকের কথা বদল হয় না, যে চুক্তি হয়ে গেছে তা বদলাবে না,—টাকা আমি আনিয়ে রেখেছি। গুণে নিন।" ঘৃণার সহিত টাকার থলিটা টানিয়া আনিলেন।

লোভই লোভকে বাড়ায়,—করালীর ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইল,—এক কথায় এতটা! না:, এ মাছকে খেলাতেই হবে। মুখ ভার করিয়া কহিল,—"দু হাজার টাকা না পেলে আমি ভাগ্নীকে এক্ষণই নিয়ে যাব, এ মেয়ের যা রূপ, দশ হাজার দিলেও বেশি দেওয়া হয় না।"

"তবে উৎসন্ন যাও!—আমি এক পয়সাও দেব না। কোথাকার একটা জোচ্চোর ছোট লোক এসে জুটেচে!"

করালীও চিৎকার করিয়া উঠিল,—"দাও শিগ্‌গির আমার ভাগ্নীকে এনে। তুই জোচ্চোর, তুই ছোটলোক,—মেয়ে আটক রাখ্‌বি ভেবেচিস্! বড় লোক আছিস, তুই আছিস,—আমায় কিসের চোখ রাঙাস্? আমি তোকে

কেয়ারও করিনে,—পুলিশ ডেকে মেয়ে আদায় কর্ব্বো। মিনি পয়সার বংশজের ঘরের মেয়ে আনবেন ?'—মজা পেয়েছেন।"

শিবনারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "যার ভাগ্যে যা আছে খণ্ডন হয় না, নিয়ে যাও তোমার ভাগ্নীকে। এক পয়সাও আমি দেবনা, পাপের সাহায্যে কর্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়।

কমলা শুনিল তাহাকে যাইতে হইবে। হয়ত জন্মের মতই এ যাত্রা—ইহাও বুঝিল,—একবার চারিদিকে হতাস নেত্রে চাহিয়া দেখিল ; এই ঘরদ্বার সবই যথাযথ বর্ত্তমান থাকিবে, শুধু ইহার আশ্রয়তলে আশাপূর্ণ চিত্ত লইয়া এতদিন যে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই দিনটিই বুঝি আর আসিবে না! এ গৃহের অধিষ্ঠাতা আবার ফিরিয়া আসিবেন কিন্তু যে অভাগিনী সূর্য্যমুখী গোপন ধ্যানে রজনী যাপন করিতে চলিল সে তাঁব দেখা আব পাইবে কি ?

শিবনারায়ণ রাগ করিয়া চলিয়া আসিলে স্বয়ং করুণাময়ী করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "আর পাঁচশো টাকা আমি নিজে তোমায় দোব দাদা ; তুমি কমলাকে রেখে যাও। সই থাকলে কি এমন করতে পারতে ?" উত্তর পাইলেন, এখনই "টাকা চাই।" করুণাময়ী এত টাকা এই মুহূর্ত্তে কোথায় পাইবেন ? সময় দিতে করালীচবণ নারাজ। আর কি করিবেন ? স্বামীকে গিয়া বলিলেন,—"ওগো দু'হাজার টাকাই দিয়ে দাও, ও যে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।"

শিবনারায়ণ করালীচরণের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন, সক্রোধে কহিলেন,—"লক্ষ্মীছাড়ার পাল্লায় পড়েছ, লক্ষীছাড়া হওয়া ভিন্ন উপায় কি ? তুমি কি মনে কর, দু'হাজার টাকা পেলেই ও ছাড়বে ? ও অতি পাপিষ্ঠ!"

অগত্যা করুণাময়ী অশ্রু মুছিতে মুছিতে কমলার চুল বাঁধিয়া কাপড়চোপড় গুছাইয়া দিলেন। কমলা কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিল না বিদ্যুদ্গত মেঘের মতই স্তব্ধ রহিল।

শিবনারায়ণ যখন দেখিলেন করালীচরণ সত্যই কমলাকে লইয়া যায়, তখন মান খোয়াইয়া ভক্তিনাথকে দিয়া বলাইলেন,—পাঁচশত টাকা আরও পাইবে

কিন্তু লেখাপড়া করিয়া দিক্‌, আর কখনও কোন দাবীই করিবে না, কোন সম্পর্ক রাখিবে না। শুনিয়া মাতুল উত্তর করিলেন, দুটী হাজার আর দুশোখানি টাকা 'ফাণ্ড' পেলেই এক্ষণি লিখে দিই।"

কমলা শিবনারায়ণের সজল গম্ভীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জীবনে এই প্রথম বার কথা কহিল, বলিল ;—"কেন আপনারা আমার জন্যে বারে বারে অপমানিত হচ্চেন? টাকা দিয়ে আপনারা আমায় কিছুতেই পারবেন না।"

চৌত্রিশ

শচীকান্ত কল্পনা-কুশল কবি না হইলে 'ক্ষণিকের দেখা' কাব্যে পরিণত হইত না, তার জীবন-কাব্যেও এ বিষাদের সুর একঘেয়ে তানে বাজিত না। কমলাকে সে কতটুকুই বা জানে? দ্বিতীয় বারই বা কত সামান্য ক্ষণের জন্য সে তাহাকে দেখিয়াছে? কিন্তু কল্পনা সে কোন মতেই ছাড়িতে পারিল না যে, তার বাগ্‌দত্তা কমলাকে তারই পাওয়া উচিত। এ যুক্তি তার মনে যেমন প্রবল তার আকর্ষণও তেমনই প্রবলতর হইয়া উঠিল। পিতা তাহার প্রতি অবিচার করিয়া মণীশের পক্ষ লইয়াছেন ইহাও সে ভুলিতে পারিল না।

বাসন্তীকে দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যানের সময় মাসিমার সহিত যথেষ্ট মনোমালিন্য ঘটিয়া ছিল। উদ্ভট একটা খেয়ালের পশ্চাতে ছোটা বাস্তববাদা গিরিজাসুন্দরীর পক্ষে অসহ্য! বাগ্‌দত্তা মেয়েটি নিরুদ্দিষ্টা; গিরিজাসুন্দরী তার পরের সংবাদ অবগত নহেন, কল্যাণীবলে, সে নাকি বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সেও অসমর্থ, ওর চেয়ে বেশী সেও জানে না, এ অবস্থায় তার প্রতীক্ষা করা কেন? খেয়ালী যুবকের খেয়ালের ঝোঁক তিরস্কার লাঞ্ছনা বা ক্ষতির দ্বারা বাধিত হওয়া সম্ভবপর নয়,—সে অটল রহিল। ভাবিল, "তাকে না পাই,—তার স্মৃতি ত কেউ কেড়ে নিতে পার্ব্বে না।"

এই সময় কলিকাতায় বন্ধু মহলে তলব পড়িল, মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটে, বন্ধু-মহলে তার প্রতিপত্তি এখনও কমে নাই, অনেকেই তার ভক্ত। একবার ভাবিল, সেখানে মণীশের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, কিন্তু উপরোধ কাটাইতে না পারিয়া শেষে বাহির হইয়া পড়িল। শিশিরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। সে নৈহাটী ষ্টেশনে গঙ্গা পার হইয়া ট্রেণ ধরিবে। তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"এই যে ছোটবাবু! খুব রোমান্টিক রকম বিয়ে কর্‌ছো না কি?

"কে বল্লে তোমায়?" শচীকান্ত বিস্মিত হইল।

"সব খপরই পাইগো, ঘরে স্পাই রয়েছে না! চাদরে যে এসেন্স মেখেছ কমলা সুলভ হবে।"

সে সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। শচীকান্ত তাহাকে অঙ্গুল পীড়িত করিয়া সলজ্জ আস্ফালনে কহিল,—"জ্বালিয়ো না আর! এসেন্স যদি দুর্লভকে সুলভ কর্‌তে পার্‌ত, তা'হলে দেশে বিদেশে ও জিনিষ থাকতেই পেত না।"

"ভদ্রা 'সিঁথায় সিন্দুর আর নয়নে কজ্জল'—দিয়ে ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের ব্রত ভঙ্গ করেছিলেন, হে ভদ্র! তুমি পারবে না?" আবার সে তাড়না লাভ করিল।

মণীশ কলিকাতায়, নাই, ছুটীতে বাড়ী গিয়াছে, শুনিয়া সে বাঁচিল। হায়, আবাল্যের সখ্যতা, কে জানিত, তারাই আজ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়া দাঁড়াইবে? কয়দিন পরে ফেরার পথে নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে, গাড়ী বদলের জন্য নামিয়া একটা বেঞ্চে বসিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। পোষের সন্ধ্যা,—এর মধ্যেই বেশ একটু ঘোরঘোর হইয়া উঠিয়াছে,—শীতকাতর গাছপালা হিমবাবুর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সারবা সরিয়া এক প্রকার মিনতিপূর্ণ মৃদু বিলাপ গাহিতেছিল। ষ্টেশনের নিকটেই একটা বিস্তৃতশাখ প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আকাশের কোল ছাড়িয়া সদ্যঃ সমাগত পক্ষী কলরবে মুখরিত, আর এই মানব-কুলায়ে বিবিধ পথের যাত্রিগণ নানারবে সান্ধ্য-প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিতে ছিল। সার্ব্বজনীন শান্ত মুহূর্ত্তেও মানব-চিত্তে শান্তি নাই।—সহসা একটা কর্কশ কণ্ঠের মন্তব্যে অসুখী চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিল শচীকান্ত।

"নেতৃতোর, হরিদুগ্‌গা! হরিদুগ্‌গা! তোর হরিদুগ্‌গা কি বেঁচে আছে,—তারা কোন্‌কালে অক্কা পেয়েচে!"

শব্দানুসরণে ফিরিল। প্লাটফরমের একধারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামস্থানে কতকগুলা পোঁটলাপুঁটুলির মধ্যে একটি রুগ্না স্ত্রীলোক হাঁফানির টানের সহিত "হে হরি। হে মা দুগ্‌গা! ভাল ক'রে দাও,—নয় ত নাও মা!"—ইত্যাদি অর্দ্ধস্ফুট কাতরোক্তি করিতেছিল, আর অর্দ্ধবয়সী শীর্ণাকৃতি একটি লোক তাহাকে খিঁচাইতেছিল, ঐগুলি তাহারই উক্তি।

এ দৃশ্য সংসারে বিরল নয়। শচীকান্ত দৃষ্টি ফিরাইতে গেল কিন্তু নিকটে কতকগুলা পোঁটলাপুঁটুলি ও জীর্ণশীর্ণ শিশুর দলে পাখা হাতে বসিয়া আর এক জন,—কে'ও?—এই হীনাবস্থ হীনচিত্ত সহচরবেষ্টিত হইয়া আজ কে

তাহাকে দেখা দিল? বক্ষের উন্মত্ত আলোড়নে যদিও দৃষ্টি রোধ হইবার উপক্রম করিয়া ছিল, বিস্ময় ও হর্ষ একত্রে বীতসংজ্ঞ করিয়া তুলিযাছিল, তথাপি সে মুখ চিনিবার পক্ষে কোনই বাধা ছিল না,—নিশ্চয়ই এ'সে!—কিন্তু কেন সে এখানে? কেন এই অবস্থায়? শচীকান্ত নিস্পন্দ-লোচনে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রের দিকে চাহিয়া সমুদ্র-বক্ষেব মত তাহারও বক্ষ কখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, কখন আবেগের অশ্রু চোখ ছাপাইয়া আসিতেছিল, কিছুই সে জানিতে পাবিতে ছিল না। শুধু এইটুকু মাত্র মনে ছিল, ধ্যানের দেবতা তাব আবাব প্রত্যক্ষ হইয়াছে! বসন্ত প্রভাতেব বাসন্তিকা শীত-সাযাহ্নে আবাব তার সম্মুখীন!

রুগ্না নারী যন্ত্রণা দিগ্ধ কলহের স্বরে কহিতে ছিল—"আমাব ভাগ্যে সব্বাই মরে, আমাবই অখণ্ডপরমাই!—ঘরে যে 'চাষ' করে একটু পড়ে থাকবো তাও কপালে লেখা নেই,—টেনে হিঁচুড়ে পথে বাব কল্লে,—হোঁচুটে পড়ে অপঘাতে মিত্যুই অদেষ্টে আছে।" বলিতে বলিতে সেই নারী কাসির ধমকে আড়ষ্ট হইয়া গেল। অভিভাবকটি দন্তে দন্ত চাপিয়া "আপদটা মরেও না"—বলিয়া পুঁটুলি খুলিযা থেলো হুঁকা ইত্যাদি বাহিব করিয়া তামাক সাজিতে মন দিল। শচীকান্ত এই সমস্ত দেখিতে ছিল তথাপি সে কিছুই দেখে নাই, কিছুই শুনে নাই,—নির্নিমেষে মলিনবসনা অপ্রত্যাশিত-দর্শনা তরুণীমূর্ত্তির পানেই চাহিযাছিল। আকাশ হইতে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটা যদি নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখীন হইত, তাহাতেও হয়ত সে এতখানি বিহ্বল হইত না।—এই সময় তরুণী ভূমে পাখা রাখিয়া রুগ্নার কঙ্কালবৎ শরীরটিকে চারু বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। সান্ত্বনার মৃদু মৃদু স্নিগ্ধবাণী তাব মুখ হইতে উৎসারিত হইতেছিল; রুদ্ধশ্বাস শচীকান্তর কর্ণেও যেন দুই একটা গুঞ্জন প্রবেশ করিয়া তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চালিত করিল। এত কাছে এতক্ষণ ধরিয়া সে আর কখন ত তাকে পায় নাই।

হুঁকা হাতে এদের সাথীটি তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ভাবে মনে হয়, তার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা। বক্ষের দ্রুত স্পন্দন স্থির হইয়া আসিল।

যাহার সহিত সে অপর স্থলে দৃষ্টি বিনিময় পর্য্যন্ত করিতেও অপমান বোধ করিত। এখন তাহার আগমন দেবদূতের আগমনের মত প্রার্থিত মনে হইল। ভয় হইতেছিল, পাছে সে তাহাকে এড়াইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। একটা রুক্ষ কণ্ঠ ভগ্নকাংস্য পাত্রের মতই অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল,—"মশায়। বলতে পাবেন টেবেনটা কখন আসবে?" কৃতার্থ বোধ করিয়া শচীকান্ত ক্ষীণালোকে টাইম টেব্‌ল খুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ট্রেণ?

"মূলোজোড়ের,—মশায় কোথায় যাচ্চেন?"

"রত্নপুকুর,—জেলা যশোব। বসুন না এইখানে। ট্রেন আস্‌তে দেরী আছে,—মূলোজোড়ে আপনার বাড়ী?"

"কর্ম্মস্থান।—বাড়ী ত্রিবেণী।" তাম্রকূটসেবনকারী মুখসঞ্চিত ধূমরাশি বাহিরের দিকে ছাড়িয়া দিতে দিতে শচীকান্তব খুব কাছ ঘেঁষিয়াই বসিল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকট একটা গন্ধ নিজ অস্তিত্ব প্রচার করিল। সেটা কড়া তামাকের কিংবা গঞ্জিকাবও হওয়া বিচিত্র নয়! একবারের জন্য সে গায়ের শালখানা টানিয়া তাহারই প্রান্তে নাসিকা আবৃত করিতে গিয়াছিল; কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইল।—"উনি আপনার কে হন?"

"আমার মেয়ে" আবার কে' বলিয়া আগন্তুক হুঁকাতে মুখ দিল।

"মেয়ে? আপনার মেয়ে?" শচী চমকিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়!" এই বলিয়া হুক্কাধারী গম্ভীর মুখে যথাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শচীকান্ত বহুক্ষণ নির্ব্বাক রহিল। তরুণী রুগ্নার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া মাথায় বাতাস করিতেছেন, মুখখানি ঈষৎ আনত—করুণাদেবী সশরীরে যেন আর্ত্ত ত্রাণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন,—ব্যথিতের জন্য ব্যথাবোধ যে এমন মধুব শচীকান্ত জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল। মনে হইল সে যদি এমন সুস্থ সবল দেহী না হইয়া রোগ ক্লিষ্ট শরীরে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারিত!

প্লাটফরমের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টা বাজাইয়া পয়েণ্টসম্যান "গাড়ী হালিসহর ছোড়া হ্যায়"—জানাইল। লাইনের আলো অস্পষ্ট দৃশ্যপটকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। অসম্ভব! এ নিশ্চয়ই সে? সংশয়াকুল কণ্ঠে সে প্রবীণ সহযাত্রীকে প্রশ্ন করিল,—"মেয়েটির নাম কি জান্‌তে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে!—ওর নাম মাধবীলতা।"

প্রশ্নকারীর মুখে ঘোর নিরাশার ছায়া পড়িল। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া কি এত মিল থাকিতে পারে! সে যদি এই সেদিন মাত্র তাহাকে না দেখিত তবে বরং সংশয় ছিল।

"এটা কি রকম ভদ্দরতা মশায়, ভদ্দরলোকের মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা? হলেনই বা আপনি বড়লোক!"

শচী অপ্রতিভের একশেষ হইল; লজ্জিত মৃদু স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল,—"মাপ কর্‌বেন, এই মেয়েটির সঙ্গে আমার একটি পরিচিতার আশ্চর্য্য রকম মিল, মানুষে মানুষে এত মিল থাকা কখন সম্ভব? মেয়েটির বিয়ে হয়েছে বোধ হয়?"

"বিধবা।"

"বিধবা!"

"আপনার সে পরিচিতা আপনার ঘরেই আছেন?"

"বিধবা!"—এই শব্দটা একটা তীক্ষ্ণ তীরের মতই শচীকান্তকে বিঁধিল। এমন রূপ ও হৃদয়ৈশ্বর্য্য লইয়া এই বয়সে বিধবা? কহিল,—"না, তিনি আমার নিকট আত্মীয়া নন।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"চাকদায়।"

"বটে! তাঁর নামটি?"—শচীকান্ত এই গঞ্জিকাসেবী অপরিচ্ছন্ন সঙ্গীর প্রতি অনেকটাই বীতশ্রদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; তথাপি এ প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, হাজার হোক, মালতী ত তারই জ্বলন্ত প্রতিকৃতি। সে স্নেহ স্বরে উচ্চারণ করিল, "কমলা।"

অদূরস্থ তরুণী চমকিয়া দুই আনত-নেত্র উঠাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তার দৃষ্টি বিষাদপূর্ণ, তথাপি তাহা সেই বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ! চোখে বিস্ময়ের নিবীড় ছায়া,—নীরবে যেন সে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

আগন্তুক ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে দিতে পার্শ্বস্থ যুবকের পরিপাটী কেশকলাপ হইতে মূল্যবান জুতা জোড়া পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল, তার অপ্রসন্ন মুখের ভাবে আনন্দ রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিল,—

"সে মেয়েটিকে আপনার কিছু দরকার আছে? চাকদায় শিবনারাণের বাড়ী থাকত, কমলা বলে একটি মেয়ে,—সেই নাকি?"

"থাকত? এখন নেই?"

"না মশায়!"

"সত্যি? কেন? কেন? কি হল? কোথা গেল সে?"

আগন্তুক ধূর্ত্ততার সহিত মিটি মিটি করিয়া চাহিয়া উত্তর করিল,—"তার মামা তাকে নিয়ে গেছে।"—পরে মৃদুস্বরে কহিল,—"সেখানে যখন বিয়ে হবে না, তখন শুধু শুধু সেখানে রাখ্‌বে কেন? কোথাকার কে একটা পরের বাড়ী বইতো না?"

শচীকান্তর শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়া তাহাকে জড়ে পরিণত করিয়া দিল। করালীচরণ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল, অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তেমনই মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "বংশজের ঘরের মেয়ে আমাদের বিয়ের কন্যে পণ আমরা পাই—কেন ট্যাকা নেবো না, বলুন ত? তোরা কুলীন যদি বেটার বিয়েতে ট্যাকার ছ্যালা ঘরে পুরতে পারিস্, আমরাই বা ছাড়ি কেন? কথায় বলে, 'বেটা আর বৌ'—তা' এ দুয়েতে তফাৎটা কি? অমন মেয়ের জন্যে আড়াই হাজার খানি ট্যাকা, এমনই কি বেশী? কিন্তু এমন কিপ্‌টে মশায়, কিছুতে দিলে না—উল্টে আবার যাচ্চেতাই করে গাল মন্দ। দেখা যাক্, করালী চক্কোত্তি আড়াই হাজার ট্যাকা ধরে আন্‌তে পারে কি না পারে।"

"তাহলে তার মামার কাছে কমলা আছে? কোথায় করালী চক্রবর্তীর বাড়ী বলুন ত? শচীকান্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল, কিন্তু জিহ্বার জড়তা, কণ্ঠের কম্পন রোধ করিতে পারে নাই।

"মশায় কি এখনও বুঝতে পার্‌চেন না,—আমিই করালী চক্কোত্তি।"

শচীকান্তের সর্ব্বশরীরে বিপুল বেগে তড়িৎ ছুটিয়া গেল। কোনমতে কহিল, "আর উনিই কমলা?"

করালীচরণ নির্লজ্জভাবে হ্যা, হ্যা, হ্যা, করিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "ঠিক এঁচেচেন,—মাধবী নয়, কমলা।" হ্যাঁ আমার দেয়া মাধবীলতা নামটাও কিছু অমন্দ ছেল না! কি বলেন?"

পঁয়ত্রিশ

জঙ্গলে পূর্ণ পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামগুলিকে বাহির হইতে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ভগ্ন গৃহে গৃহস্থরা তাদের সুখ দুঃখ লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। লোনাধরা দেওয়ালে বঙ্গভূমির সম্পদ চিহ্ন শ্যামলতা প্রকটিত, ভিতরে তাহারই সঞ্চিত ম্যালেরিয়া পূর্ণ প্রকোপে প্রতিষ্ঠিত। কলমী কহ্লার সমাচ্ছন্ন পচা ডোবার উপর মশকেরা মহাকলরবে সান্ধ্য-স্তোত্র গাহিয়া বিষ বর্ষণ করিতেছে, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধ বিছানায় পড়িয়া কাঁপিতেছে, কচি ছেলে চেঁচাইয়া রুগ্না প্রসূতির যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করিতেছে, গৃহের অভিভাবক কলিকাতার মেসের বাবু সপ্তাহান্তে গৃহে আসিয়া দুই হপ্তা অফিস কামাইয়ের জন্য জরিমানা দিতেছেন, ঘরে যত কুইনিন মিক্সচারের শিশি জমিয়া উঠিতেছে, সাগুর বাটিতে দুধ মিছরির ততই অভাব ঘটিতেছে। সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমির অবস্থা এইরূপ। গ্রামের বড় লোকেরা সহরবাসী হইয়াছেন। পাড়া নিবন্ত,—দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত, কচ্চিৎ কোন শুদ্ধ গৃহে প্রবীণা আত্মীয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া পুরোহিত দিয়া গৃহ-দেবতাকে চাউল কলা ও ফুল ফেলিয়া নিয়ম রক্ষা করতেছেন। চিলের ছাদে প্রাচীরের গায়ে অশথ বট সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া আশ্রয়কে মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিয়াছে ? প্রবেশ দ্বারে তালা বন্ধ।

এইরূপ জঙ্গলময় স্থানে একখানি অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহে করালীচরণ আসিয়া সংসার পাতিল। মূলাজোড়ের বিখ্যাত কালীবাড়ীর দপ্তরখানায় পূর্ব্বে সে কিছুদিন কাজ করিয়াছিল, পুরাতন দাবী তুলিয়া একটা কর্ম্মের জোগাড় করিয়া সে যে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল, এর প্রধান কারণ কমলার দর বাড়ানো। ত্রিবেণীতে থাকিলে শিবনারায়ণ সংবাদ পাইবেন, একটু সরিয়া থাকিলে তাঁরা শীঘ্র শীঘ্র বন্দকী গহনার মত কমলাকে খালাস করিয়া লইতে ব্যগ্র হইবেন, এই আর কি! শিবনারায়ণকে সে লিখিল, "কমলার জন্য অপর পাত্র স্থির হইয়াছে, সে ব্যক্তি আড়াই হাজার টাকা দিতে তৈরি আছে, আপনার ইচ্ছা থাকিলে ঐ টাকা নিয়া আগামী সোমবার নৈহাটী

ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন, কমলাকে দিয়া টাকা নিয়া নিব।" সোমবার সপরিবারে সে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল। সেখানে প্রচার করিয়া আসিল, কলিকাতায় ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিতে যাইতেছে। সেদিন ষ্টেশনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাকদহ হইতে কেহ আসিল না, দেখিয়া করালী একটু ফাঁপরে পড়িল, এত টাকা দিয়া অপর কাহারও কমলাকে বিবাহ করা সম্ভবই নয়, ইহা সে বুঝে। দরিদ্র ও মূর্খ বংশজ সন্তানগণ মাথিয়া কাটিয়া পাঁচ সাত শতের অধিক উঠিতে একান্তই অক্ষম, ধনীগণ কন্যা পণ দিয়া বিবাহে অসম্মত। শিক্ষিত সমাজে পুত্রপণপ্রথা চলিত থাকিলেও কন্যাপণ ঘৃণা বলিয়াই বিবেচিত। বেশী টানিতে গিয়া জাল শেষে ছিঁড়িল না কি ?

কিন্তু সে পত্র যে শিবনারায়ণের নিকট আদৌ পৌছায় নাই, এ সংবাদও সে জানিত না। ডাকঘরে প্রেরণের জন্য শিশু হস্তে দত্ত পত্রখানা কমলা হাতে পাইয়া পাঠান্তে উহা রন্ধন-চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

মনে মনে বলিল, "আমার জন্যে তাঁদের এ অপমান আমি ঘটতে দেব না।" কিন্তু তথাপি নৈহাটি ষ্টেশনে বারম্বার সে আশে পাশে চমকিয়া চাহিতেছিল। হায়, যদি সহসা—অতর্কিতেও তাঁদের কেহ আসিয়া পড়িতেন,—যদি কেহ তাহাকে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিতেন! গর্ব্বের সহিত অনুতাপের বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। সে বলিল, "তুমিই ত অহঙ্কার করিয়া চিঠি ছিঁড়িলে, নহিলে হয়ত মুক্তি পাইতে।" ভিতর হইতে আত্মমর্য্যাদা মাথা তুলিয়া বলিল, "যা হয় হোক, তাঁদের কাছে অর্থ মূল্যে কেমন করিয়া আত্ম বিক্রয় করবো ?"

দারুণ বুভুক্ষার আদর্শ লইয়া মাতুল গৃহের নূতন গৃহস্থালী কমলাকে গৃহিণী পদে বরণ করিল, তার অভাব শীর্ণ বাহু তুলিয়া কঠোর কণ্ঠে তার আবাহনীর গান গাহিল। দাসী, পাচিকা, গৃহিণী এতগুলি সম্মানিত পদ একসঙ্গে লাভ— এ বয়সে প্রায় সকলের ভাগ্যে জুটে না।

তবে আর যার পক্ষে যাই হোক, সত্যকালী তাহাকে পাইয়া বাঁচিলেন। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনে অন্ধকার দারিদ্র্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, শ্বশুরের অবস্থা খুব মন্দ ছিল না; কিন্তু শ্বশুর-পুত্র অতি অল্প দিনেই নিজেকে নিঃস্ব করিতে ত্রুটি করেন নাই। শাশুড়ী অপয়া-বউ বলিয়া

তাহাকে লাঞ্ছনা করিতেন। সহানুভূতিহীন স্বার্থপর নেশাখোর স্বামীর নিকটে এতটুকু শান্তি সে কোন দিন পায় নাই। শারীরিক মানসিক উভয় শ্রমে দেহ পিষিয়া গিয়াছে, হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তবু এতটুকু বিশ্রাম মিলে নাই, এতদিনে তাঁর মনে হইল, "দেবতা হয়ত আছেন!" কমলার হাত ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া কহিলেন,—"আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি। মা না হলে কে ছিলি? নৈলে এতদিন পরে এই সময় কোথা থেকে এলি বল্ দেখি?"

অনেকগুলি মরিয়া হাজিয়া এখন বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছাড়া তিনটি পুত্র জীবিত আছে। সবগুলিই কচি কাচা,—বুভুক্ষিত এবং রুগ্ন। এদের মধ্যে মেয়ের উপরই একটু যত্ন লওয়া হয়। কারণ তাহার পিতা বলিতেন, "ভুলে যেয়ো না,—হাবি আমার পাঁচশো টাকার মাল।" ছেলেগুলা কুলীন সন্তান নয়, তাদের আদর নাই। কমলা আসিয়া এই পরিত্যক্ত মানবকগুলিকে সদয় চিত্তে কাছে টানিয়া লইল। অবসর যদিও অল্প, তথাপি সে নিজে অবিশ্রাম ঘা পাচড়ায় ঔষধ পত্র দিয়া তাদের মানুষের চেহারা বাহির করিল। প্লীহার দাপটে সাত বছরের ছেলেটির উদরখানি বাদ্য যন্ত্র বিশেষের আকার ধারণ করিয়াছিল, বসিলে বুকের উপর ঠেলিয়া উঠে। সেকালের গৃহিণীরা অনেক টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন। করুণাময়ী ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর নিকট এ সকল বিদ্যার কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। কমলা তাঁর দেখা দেখি ছেলেটির পেটে গোমূত্রের সেঁক দিয়া ও গাছ গাছড়ার ঔষধ খাওয়াইয়া মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে অনেকখানি সুস্থ করিয়া তুলিল। একখানা বর্ণপরিচয় সংগ্রহ করিয়া শিশুদের সুযোগমত একটু আধটু পড়াইতে গিয়া সে দেখিল, মেধাশক্তি এই জন্ম-অনাদৃত শিশুদিগের একেবারে নাই তা নয়, করুণায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে ভাবিল, এ ভালই হয়েছে। অত টাকা কেউই দেবে না,—সারা জীবন ধরেই আমি এই দুর্ভাগ্যদের নিয়ে কাটিয়ে দেব,—দুদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করবো আর দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে দুঃখীদের সুখী করবো। এ ঢের ভাল।'

সংসারে সকলেই গুণের বশ। সত্যকালীর রোগ শোক ও অভাবগ্রস্ত অসহিষ্ণু চিত্ত এই মেয়েটার মোহিনী মায়ায় সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িল। ছেলেদের উপর কমলার যত্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন। তাহাদের

মধ্যে গালিগালাজ নাই, মারামারি কমিয়া গিয়াছে,—চেহারাও ফিরিয়াছে। আহা, যদি কমলা থাকিত তাঁর অন্তসন্তান দুটি ভুগিয়া ভুগিয়া অসময়ে চলিয়া যাইত না। করালীচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সব চাহিয়া চাহিয়া দেখে, তার মুখের পাষাণ-রেখার মত কঠোর কাঠিন্যে এতটুকু দাগ পড়ে না। মনে মনে হাসিয়া বলে, "মেয়েটা খুব সেয়ানা! ভেবেছে ভোল দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবে। তেলই দাও, ফুলই দাও, এ ভবি কিন্তু ভোলবার নয়।"

যত বড় সুগৃহিণী হোন, যতই আত্মোৎসর্গ করুন, সংসার চালাইতে হইলে একটা জিনিষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেটা রৌপ্যচক্র, এ সংসারে সেই বস্তুটীরই সবচেয়ে অভাব। গৃহিণীপনার সমস্ত কলা কৌশল প্রয়োগ করিয়াও ও শ্রীবৎস উপাখ্যানের অচল তরণীর ন্যায় ইহাকে চালানো কমলার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাতুলের সহিত কথা বলা তার পক্ষে রুচিকর নয়, কিন্তু না বলিলেও চলে না, সত্যকালীকে দিয়া সে তাঁকে বলাইল। করালী-চরণ মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, টাকা আমি কি বাটপাড়ি করে আনব না কি? যেমন করে চলচে, চালিয়ে নিতে বলো।"

সত্যকালী কহিলেন, "ওই কি বাটপাড়ি করতে যাবে না কি? শোন কথা! ও-যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছে। যে ক টাকা হাতে ছিল, তাই খুইয়ে তোমার সংসার চালালে, বার মাস কোথায় পাবে শুনি? বলতে মুখে একটু বাধলো না? একেবারে হায়া-লজ্জাও নেই!"

"যেখান পায় ও এনে দিক্—ওর জন্যে আমার দুনো খরচা পড়চে না। হতভাগা ছোঁড়া দুটোর মত তাঁবেরং কেন শুনি? তোমার কাপড়ও ত দেখি দিব্যি ধোপদুরস্ত। আদা, মরিচ, মিছরি নিত্যিই আসছে, দেখতে পাইনে না কিছু? যতসব বাজে খরচ। আমি কি নবাব বাদসা, জোগাব কোত্থেকে?"

"নিজের গাঁজা, ভাঙ, তামাকের পয়সাগুলো বড় কাজের খরচ না? সাফ কাপড় পরি না পরি তোমার তা কি? ও ত কমলার নিজের কাপড়। ছেলে দুটো যেন তোমার আপদ বালাই হয়েছে, সব কটাকেই ত খেয়েছ, ওদের তুমি না খেয়ে ছাড়বে না।" বলিতে বলিতে সত্যকালী ক্রোধে দুঃখে,

অভিমানে পিছ ফিরিয়া শুইলেন। করালীচরণ বিড় বিড় করিয়া তাহার ও কমলার উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে কমলা বড় ছেলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একটি প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করিল। সেই বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে স্নানের সময় পুকুর-ঘাটে তার আলাপ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় করুণাময়ীর দেওয়া বালা দুই গাছি হাতে তার দেখা গেল না। একগাছি করিয়া বাঙা কড় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ এ সম্মান লাভ তাদের ভাগ্যে ছিল না, কাজের ভিড়ে পল্‌কা জিনিষ দুখানা হইয়া খসিয়া পড়িল। কমলা একেবার মাত্র শিহরিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া হাতখানা ঢাকিয়া ফেলিল, পুনরায় নির্ব্বিকারভাবে আরব্ধ কর্ম্মে মনোনিবেশ কবিল। তার ভারাক্রান্ত চিত্তে একটা গভীর ভাব বোধ হইতেছিল। এমন কেউ নাই যে তাহাকে এই অকল্যাণকর অবস্থা হইতে মুক্ত করে! সত্যকালা ভৎ'সনার সহিত স্বামীকে সংবাদটা জানাইলে মাতুল হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বটে! তা মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি তো ভাল দেখচি, বেশ করেচে, কখন্ চোরে ছিনিয়ে নিত, এ তবু কাজে লাগল।" কমলাব সহিত সাক্ষাৎ হইলে কহিল, "আগা হাজার হোক নারাণীর মেয়ে ত! নারাণী বড় মানুষের ঘরে রূপের জোরে গিছলো, দাদা বস্‌তে খুন। ভাই-ফোঁটায় মিহি ধুতি পাঠাত। আমার বরাতে অমন বোনটা মরে গেল, না হলে আজ আমার ভাবনা কি?"

ছত্রিশ

পৌষের পর মাঘ মাসেরও অর্দ্ধেক কাটিয়া গিয়াছে। শীতের প্রকোপ মন্দীভূত হইতেছিল। রাত্রে হিমপাত অল্প হইয়া গ্রহ-তারকার উজ্জ্বলতা ও শুক্লা জ্যোৎস্নায় হৈম প্রভা উভয়েই বর্দ্ধিত হইতেছে, নূতন ভূষণের জন্য উন্মুখ বৃক্ষলতা পুরাতন জীর্ণ পত্ররাশি পরিত্যাগ করিতেছিল, আকাশে বাতাসে সূর্য্য কিরণে নবদ্গোত শষ্পদলে চিক্কন অরুণিমায় পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল! শুধু জড় জগতেই নহে, জীবজগতেও নব বসন্তের সূচনা দেখা দিয়াছে। পশুপক্ষীগুলাও প্রকৃতির এ দান উপেক্ষা করে নাই। গহ্বর-শায়ী কীট বাহিরে আশা আরম্ভ করিয়াছে, নবীন চ্যুত-মুকুলের আঘ্রাণে আমোদিত মধুমক্ষিকার দল ঝাঁক বাঁধিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, এমন কি ঝোঁপ ঝাঁপের মধ্য হইতে দোয়েল পাপিয়া বুলবুলিরা তাদের চির-পরিচিত রাগিণীর আলাপ সুরু করিতে ভোলে নাই।

মানুষের মধ্যেও ঋতুর প্রভাব অল্প নয়। শীত কমিয়া যাওয়ায় এবং কমলার শুশ্রূষায় সত্যকালী অনেকখানি সুস্থ বোধ করিতেছিলেন, বিছানা ছাড়িয়া প্রথম যে দিন বাহিরে আসিতে পারিলেন সে দিন তাঁর মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। অর্থ বোধ করি,—“এবারের মত বাঁচিলাম!” যে যত দুঃখ ভোগ করুক, মরণকে কেহই হয়ত চায় না।

আজকাল বোধ করি নব বসন্তের উতলা হওয়া কমলার মনেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর নির্ব্বাপিতালোক কক্ষের কঠিন শয্যায় আর সে বিনিদ্র যামিনী যাপন করে না। তেল খরচের ভয়ে সন্ধ্যায় এক-বার জ্বলিয়াই দীপ এখনও নিবে বটে, কিন্তু সে সেই সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতিবাসী দুই একজন মাত্র। সকলেরই গৃহের মধ্যে পচা পুষ্করিণী বা কালকাসন্দ ও গাবভেরেণ্ডার বেড়া ঘেরা সবজির বাগান বা আগাছার জঙ্গল ব্যবধান। সে অদূর বংশবনের পানে চাহিয়া থাকে। বাতাস খেলা করে, জ্যোৎস্না হিল্লোল তুলে, সে শুধু চাহিয়া দেখে।

চিত্ত ভরিয়া তেমনি একটা হিল্লোল তারও বুকে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। বাতাস বন্ধ হইয়া চারিদিক নিঃসাড়া হইয়া যায়, বক্ষ তাহারও কাতর তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতে থাকে, ফোটা ফুলের মত আকাশ-ভরা নক্ষত্রের দীপ্তি, আশে পাশে গাছের গায়ে গায়ে জোনাকির ঝিক্ মিক্, কমলার দৃষ্টি উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, অধঃ হইতে উর্দ্ধে ব্যাকুল হইয়া ফিরে। যদি সে ঐ সকল ছোট ছোট আলোগুলির কোনটার মধ্যে একদিন নৈশ অন্ধকারে চিতাগ্নি পার্শ্বে করুণাপূর্ণ বেদনাব্যথিত যে মুখ দেখিয়াছিল, তাহার ছায়াটুকুও দেখিতে পায়। কিন্তু হায়, বৃথা এ প্রতীক্ষা,—এ আশা আকাশ কুসুম! কোথায় তিনি, আর সে কোথায়? মন তবু বুঝে না। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া মনে হয় আজ সেখান হইতে কেহ আসিবে। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া কেবলই সেই দুদিনের স্বপ্ন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। প্রত্যূষে সেই স্মৃতিটুকু অবলম্বন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজ করিয়া যায়,—কিন্তু দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেলেও কেহ আসে না, কেবল দু চোখ জলে ভরিয়া আসে।

সেদিন কর্ম্মক্লান্ত শরীরে সে যখন প্রাত্যাহিক বিশ্রাম স্থানটি গ্রহণ করিল, তখন আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল হইয়া আসিয়াছে, একখানা হাল্কা মেঘ লঘুপক্ষ শ্বেত পক্ষীর মত বায়ুভরে উড়িয়া যাইতেছিল। সেদিন সে অল্পক্ষণ পরেই নিরানন্দ চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে, অল্প দূরে এক দল শৃগালের ঐক্যতানে প্রথম প্রহরাতীত ঘোষিত হইতেছিল, ফিরিতে গিয়া সে চমকিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিল। পশ্চাতে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে তার নিজের ছায়াপার্শ্বে আর এক জনের ছায়া,—পুরুষের দীর্ঘ মূর্ত্তি! সে সুস্পষ্ট দেখিল, মুহূর্ত্তে ছায়া মূর্ত্তি অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তার পা হইতে মাথা অবধি কাঁপিয়া উঠিল। কণ্ঠের অত্যন্ত নিকটে একটা সাতঙ্ক আর্ত্তনাদ ঠেলিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু যার জীবন শীত দেশের কাচের ঘরের মধ্যে বন্ধ করা গ্রীষ্মের লতার মত অবরণের চাপ মাথায় করিয়া বাড়িয়া উঠে নাই, মুক্ত আকাশের তলায় নিজের শক্তিতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পদে পদে যুদ্ধ করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—শৈশব অতিক্রান্ত হইতে না হইতে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় লইয়া ঝড় ঠেলিয়া

ঊর্দ্ধদিকে যাহার গতি,—বাজ পড়িলেও সে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়াইয়া দগ্ধ হয় ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে চীৎকার করিল না, যেদিকে ছায়া অপসৃত হইয়াছিল সেইদিকে বরং একটু অগ্রসর হইল। কৈ, কেহই ত নাই! গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। বাতাস হয়ত শাখা নাড়াইয়া শুষ্ক পত্রগুলিকে ঝরাইয়া ফেলিল। মনে হইল, কে যেন সাবধানে চলিয়া যাইতেছে! নিজের চমকে নিজে লজ্জিত হইয়া সে ফিরিতে গেল—কিন্তু এ কি! পদস্পৃষ্ট হইয়া কি একটা গোলাকার বস্তু গড়াইয়া গেল না?—ইটকাঠের মত জিনিষটা নহে, ধাতু দ্রব্য শব্দানুসরণে নিকটে গিয়া একটা টিনের কৌটা কুড়াইয়া লইল। ছেলেরা ফেলিয়া গিয়াছে, এই কথাই মনে হইয়াছিল, কিন্তু কই এ কৌটা ত তাদের কাছে দেখে নাই,—তারা এ জিনিষ কোথা পাইবে? কৌটাটা সে খুলিয়া ফেলিল। মেঘ সরিয়া গিয়াছে, তার হাতে যা উঠিল তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। কৌটার মধ্যে দুইগাছি সোনার কুলি রহিয়াছে, সেই সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা পত্র। সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়িল, "কমলার জন্য"। তার হস্ত কম্পিত এবং সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল। নিকটবর্ত্তী গৃহ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। এত বড় অপমানও তার কপালে লেখা ছিল! অতি ঘৃণার্হ বস্তুর মত কৌটা মাটিতে সে নিক্ষেপ করিতে গিয়া ভাবিল, পত্রখানা একবার পড়িয়া দেখা উচিত। অক্ষর বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট আলো ছিল। সাবধানে পাঠ করিল। "কমলার জন্য।"

"অযোগ্য হলেও গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়ো না; দিবার অধিকার না থাকলে দিতে সাহসী হতাম না। এভাবে রেখে যাবার কারণ প্রকাশ্যে দেবার অধিকার এখনও পাইনি।"

"এখনও পাই নি!"—তবে একদিন যিনি এ অধিকার পাবেন এ তাঁরই দান? হায় মূঢ় কমলা! তুই না জেনে কার অপমান করছিলি? আবেগের অশ্রুজলে তার কৌমুদী-বিভাষিত গণ্ডযুগল প্লাবিত হইয়া গেল। সকল দুঃখ যেন সার্থক হইয়া উঠিল। নির্ণিমেষ জাগ্রত দেবতার মত তিনি তার চারিপাশে নিজের রক্ষা-হস্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সে

যে ভূষণহীন হস্তে রহিয়াছে, ইহা তাঁহার প্রাণে সহে নাই,—তাই এ অকাল-উপহার!—গভীর কৃতজ্ঞতায় তার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিল। একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী শক্তি লইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিল, জোয়ারের জলের মত মুহূর্ত্তে হৃদয় সমুদ্রের ঢেউ উথলাইয়া কুল ছাপাইয়া দিল। তখনই দ্বিধা লজ্জা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রথম প্রাপ্ত উপহারটিকে সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকাইল—সে শ্রদ্ধা এই জড়ের প্রতি নয়, যে চেতন পুরুষ এই জড়ের মধ্যে তাঁহার স্নেহপ্রীতির ধারা ঢালিয়া ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রণাম তাঁহারই সেই অভয় পদোদ্দেশ্যে। বলয় দুইখানি বহু মূল্য নহে—কিন্তু কমলার চোখে তাহা সাত রাজার ধন মাণিকের মতই অমূল্য ঠেকিল। যে অলক্ষ্য দৃষ্টি তার নিরলঙ্কার হাত সহিতে পারে নাই, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই যেন সে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারই দত্ত অলঙ্কার ধারণ করিল। মনে করিল, তিনি হয় ত এখনও কোন অদৃশ্য স্থান হইতে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, এইমাত্র যে ছায়া তার পশ্চাতে অপসৃত হইতে দেখিয়াছে, যে পদশব্দ শুনিয়াছে, সে তবে তার ভ্রম নয়—সে ছায়া মণীশের—সে পদশব্দ তাঁহারই?

তার আত্মাভিমান বিজিত বন্দীর মত মাথা নত করিয়া বলিল, আর না, পণ ছাড়! আর কি মান অপমান ধরিয়া নিজের সহিত নিজে যুদ্ধ করা চলে? দ্বারে যখন দেবতা নিজেই অতিথি—তখন আবার লজ্জা দ্বিধা কিসের? যুক্তি তখন অনুকূল হইয়া কহিল,—"যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পার, এ জীবন ও জন্মান্তরও উৎসর্গ করিতে পার, এই তুচ্ছ দেহখানা কি এমন যে তাহা লইয়া এত মান অপমান? এত ক্ষুদ্র অভিমানে ভরা মন লইয়া কি পূজার অধিকার পাওয়া যায়?-মানুষের অজ্ঞাতে তাহার মর্ম্মের মধ্যে যখন নূতন সৃষ্টি চলিতে থাকে, তখন তাহা মাতৃ কুক্ষিস্থিত শিশুর মতই গোপন থাকে, কিন্তু যখন তার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই সে লোক লোচনে আত্ম-প্রকাশ করে। কমলা যে আজই এই মত স্বীকার করিয়া আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিল তাও নয়। যে নব যুগ তার মধ্যে বীজে বৃক্ষের মত, মহাপ্রকৃতির মধ্যে ভবিষ্য সৃষ্টির ন্যায় লীনাবস্থায় ছিল তাহাই আজ সহসা অঙ্কুরিত হইল মাত্র। আপনাকে সে দানের সুখে ধূপের মত নিঃশেষ করিয়া দিল, কিছু বাকি রাখিল না। এই

এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল 'এই ভাল, তাই হোক, আমার স্বাতন্ত্র্যে কাজ নেই, আমি বিকিয়েই যাব।'—

হায়, সে যদি জানিত!

রাত্রির অন্ধকারকে সহস্র রশ্মিচ্ছটায় বিদ্ধ করিয়া অম্লান প্রভাত আত্মপ্রকাশ করিল। কমলার পক্ষে আজ সুপ্রভাত। প্রত্যূষে উঠিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা কমলা প্রাতঃকৃত্য [illegible] সমাপনান্তে কাগজ কলম জোগাড় করিয়া করুণাময়ীকে পত্র লিখিতে বসিল। এক রাত্রে তার মনে যে রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, সেই মানসিক [illegible] বাক্য হইয়া পড়িতেছে। সে এখন কোন [illegible] —[illegible] সহিতে [illegible]।

[illegible] প্রসন্ন [illegible] বলিলেন—"ওগো [illegible]।"

"হাঁ, [illegible]"

"[illegible] এত [illegible] আর দেরি করবো না। হনসিওরে [illegible]। ও [illegible] যখন [illegible], তখন যত শীগ্‌গির হয়, ততই ভাল। আমি কলকাতা টাকা জমা দিতে যাচ্ছি—জানিস্ এই থলিতে কত টাকা আছে?—পঁচিশ শো! বিয়ের খরচা আলাদা। দু-চারটে যদি এমন ভাগ্যি আমার থাকত! তোর [illegible] পাড়া গাঁয়ের যে হাড় [illegible] সব মেয়ে, ওদের কি আর এর সিকি পয়সার দাম উঠবে নাকি?"

সাঁয়ত্রিশ

কলিকাতার এক প্রশস্ত অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে গৃহস্বামীর কন্যা শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেছিল। সুকেশী সুবেশী মেয়েটি গঠন সৌকুমার্য্যে, এবং একটি কমনীয় সরল শ্রীতে সকলেরই মন আকর্ষণ করে। মাষ্টার বই খুলিয়া পাঠ করিতে আদেশ দিলে, ছাত্রী পড়িল—"কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেনদেশে কর্ক নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার বল্কল এরূপ স্থূল—হ্যাঁ মাষ্টারমশায়, বল্কল কি রকম দেখতে? কাকে বলে বল্কল।"

"গাছের ছাল।"

"গাছের ছাল যে বল্লেন—তাহলে রাম লক্ষ্মণ কেমন করে বল্কল পরেছিলেন? মানুষে কখনও গাছের ছাল পরতে পারে?"

"কোন কোন গাছের ছাল নরমও হয় কি না।—আচ্ছা, বল দেখি, স্পেন দেশ কোথায়?"

"কেন, আফ্রিকায়। সেইখানেই ত খুব বীর একটা জাত—স্পার্টান্ বুঝি—জন্মেছিল না? তারা—"

"নাঃ,—স্পার্টান্‌রা তো স্পেন দেশে জন্মায়নি, তারা গ্রীসদেশের লোক ছিল। কাল যে ম্যাপে ভাল করেই দেখিয়ে দিলুম, স্পেনদেশ ইউরোপে। বৃক্ষ কাকে বলে?"

"তা বলে এটা আর ভুল হবে না,—বৃক্ষ মানে গাছ।"

"ঠিক! আচ্ছা স্থূল মানে কি?"

"গোলমাল!"

"গোলমাল?"

"হ্যাঁ, লোকে যে বলে হুলুস্থূল!—হ'ল না?"

"মাষ্টার ইন্দুভূষণ হাসিল, "এতটা কল্পনা শক্তি না যোগ করে শুধু একটু মনোযোগ দিলেই যে আমি বাঁচি। আচ্ছা, তৈমুরলঙ্গ কোন্ দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, বলত?"

"তুরস্ক।"

"না—ভেবে বল।"

"আফগানিস্থান? তবে আমি জানিনে, মাগো, মা, অত কি সব যা'তো কথা মনে করে রাখা যায়?"

"কেন যাবে না, সব্বাই ত রাখে, মন দিলে তুমিও পার। বই দেখে নাও ভাল করে।" ছাত্রী পুস্তকে বারেক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই তাহা মুড়িয়া বলিল—"বাবাকে বলবো আমি আর পড়তে পারব না, অত সব ছাইপাঁশ কি করতে শিখবোই বা?—কখ্‌খনো পড়ব না।"

"কেন গৌরি, পড়বে না?"

"আমার ভাল পড়া হয় না, মনে থাকে না।"

"নাই থাক,—এম্‌নি করেই পড়।"

"আপনি রাগ করেন যে।"

"আমি কি কখনও তোমায় এর জন্য বকেছি?"

ছাত্রী একটু চিন্তা করিয়া কহিল—"না, কিন্তু আপনার মনে মনে রাগ হয় সে আমি ঠিকই বুঝতে পারি। সেদিন যে "ফল", না, না, "ফুল" না কি বলছিলেন—আচ্ছা সেকথার মানে কি মাষ্টার মশায়?"

অনুশোচনায় মাষ্টার মুখ নত করিলেন, মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন—"তার মানে নির্ব্বোধ।—তোমার অন্য সময় ত বেশ বুদ্ধি, পড়ার সময় মনে থাকে না কেন?"

"আচ্ছা, নির্ব্বোধকে 'ফুল্' বলে কেন? ফুলের মত নড়তে চড়তে পারে না,—তাই? আহা, আমার চন্দ্রমল্লিকাগুলি সব মরে গেছে, ঝুমকোলতাটাও মরমর।"

"ইন্দুভূষণ! তোমার কাজ শেষ হলে আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরি ঘরে দেখা করে যেয়ো।"

বলিয়া গৃহস্বামী কন্যার পাঠাগারের দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য এই বালিকা ছাত্রী গৌরী এবং এ গৃহের অধিস্বামী তাহার পিতা নন্দকিশোর। পিতার সাড়া পাইয়া গৌরী বই ফেলিয়া ডাকিল—"বাবা শোন!" নন্দকিশোর গৃহে প্রবেশ করিলেন। "আজ বাগানে বেড়াতে যাবে? আমি আর পড়তে পারিনে, ছুটী দিতে বলে দাও না।"

গৌরী তার পৃষ্ঠলম্বিত বেণী দুলাইয়া গোলাপী অধর ঈষৎ ফুলাইয়া পিতার মুখের দিকে আব্দারের দৃষ্টিতে চাহিল। পিতা কহিলেন—"ইন্দুভূষণ, আজ ওকে ছুটী দাও।"

শিক্ষক বিষণ্ণ মুখে সম্মতি জানাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ ঘটনা আকস্মিক নহে, নিত্য। তবু মনে কেমন যেন ব্যথা বাজে। ছাইভস্ম যাহাই কেন ছাত্রী পড়িয়া যাক, দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টায় পরিবর্দ্ধিত হইলেও সম্মুখস্থ ঘড়ির উপর শিক্ষকের নজর পড়ে না। জগতে মানুষ যত তাহাদের খেয়ালও বিভিন্ন। এম-এ ক্লাশের দরিদ্র ছাত্রটি প্রথম যখন গৃহ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই প্রথম দিন যাহার সঙ্গ তাহাকে সঙ্কোচে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, দুইদিন না যাইতে তাহারই শিশু সরল কোমল-মধুর ভাব মায়া যষ্ঠির মত তার চিত্তকে এমন অভিভূত করিবে। এখন ছুটীর দিন ইন্দু-ভূষণের পক্ষে শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু সে নিজ হৃদয়ে এই যে ধনী-দুহিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল, মাধ্যাকর্ষণের মত নিজের কক্ষেই তাহা স্থির থাকে, সীমা অতিক্রম করে না। সে ছাত্রীর শিশির বিন্দুর মত কৈশোর মাধুর্য্যে বিমণ্ডিত মুখখানির উপর স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি রাখিয়া বুলি শেখা তোতা পাখীকে ভালবাসিয়া বালকের যে সুখ সেইরূপ একটা আনন্দ লাভ করিত মাত্র।

ছুটী শুনিয়া গৌরী লাফাইয়া উঠিল।—"আঃ বাঁচা গেল! বাবা এসো,—তোমায় খরগোসের বাচ্ছাগুলি দেখাই গে, এই সেদিন কিনে দিয়েছ—এরি মধ্যে কত বড় হয়ে গেল,—দেখবে এস। মাগো, মাষ্টার মহাশয়কে নাম ধরে বলা হয়নি, অমনি চলে যাচ্ছেন!—আপনিও আসুন না—"

পিতার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া চলিল। ইন্দুভূষণও তাদের অনুসরণ করিল।

যে বাড়ী এক সময় পরিত্যক্ত পুরীর মত স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আজ একটি মাত্র বালিকার আগমনে বসন্তাগমে পক্ষী-কূজনের ন্যায় ইহার প্রতি গৃহ কলহাস্যে কণ্ঠস্বরে মুখরিত। আবার চারুবনস্থলী ঋতুরাজ-পাদস্পর্শে অভিনব শ্রী ধারণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, পুষ্পে মধু-সঞ্চয়ের ন্যায় অলক্ষ্যে বসন্তবৈভবও প্রদান করিতেছিল। নন্দকিশোরের শুষ্ক চিত্ত বর্ষার জলধারা পুষ্ট

নদীর মত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যৌবনের আশাহত চিত্ত অপরাহ্ণে জগদানন্দ আলোকের সন্ধান পাইয়াছে।

সময়ের চেয়ে পরিবর্ত্তনকারী জগতে আর কে আছে! গৌরীর মধ্যেও ইহার কার্য্য স্থগিত ছিল না। আকর্ষণ প্রত্যাকর্ষণ না করিয়া পারে না—আর বোধ হয় সম্বন্ধ গুণেও—সে পূর্ব্ব বিদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে ভাল বাসিয়াছিল। চিত্ত সমুদ্রের তলে জল এখনও পূর্ব্বস্মৃতির রত্নসম্ভার সাদরে সঞ্চিত থাকিলেও নীলাম্বুরাশি মেঘের ছায়া ধারণ করিয়াছে। বালিকা হইলেও পিতৃহৃদয়ের বেগ ব্যাকুল স্নেহ-গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে নাই। একটা সূক্ষ্ম যোগ সূত্র তাদের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। সে তাঁর কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীরে সুখের তাড়িৎ ছুটাইয়া একদা কহিয়াছিল,—"বাবা আমি তোমায় খুব ভালবাসি, সত্যি।"

দিন এদের সুখেই কাটিতেছে। গৌরীর মনের উপর হইতে দুঃখের ছায়া সরিয়া গিয়া তার পূর্ব্ব স্বভাব কতকটা ফিরাইয়া আনিয়াছে, গল্পে, ভ্রমণে দুজনকে অবলম্বন করিয়া দুজনের জীবন আশ্রয় তরু ও আশ্রিতা লতার মত মিশিয়া গিয়াছে। ইদানীং তাহাকে সত্যদার উপর অনেকখানি উদাসীন দেখিয়া স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কন্যার মুখের চিন্তারেখাহীন সরল হাস্য তাঁহার চিত্তে আশ্বাস ছড়াইতে ছিল।

কিন্তু বেশী দিন নিজের দিকটাকে বাঁচাইয়া রাখা চলে না। দেশাচার লোকাচার শতমুখে স্মরণ করাইয়া দেয়, ত্রয়োদশ উত্তীর্ণা কন্যাকে পাত্রস্থ না করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের নিম্নাবতরণ অনিবার্য্য! অনেক খুঁজিয়া মনের মত পাত্র পাওয়া গেল। ছেলেটির দারিদ্র্যখ্যাতি তার বিদ্যা বুদ্ধির ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। সেই নির্ব্বাচিত পাত্রটিই গৃহশিক্ষক ইন্দুভূষণ।

গৃহস্বামীর আদেশমত ইন্দু বিদায়ের পূর্ব্বে তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ছাত্রীর টবের গোলাপ গাছের মাটি নিড়াইয়া দিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় নন্দকিশোরের সহিত ইতঃপূর্ব্বে সে সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই।

গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের রৌদ্র তখনও অনুজ্জ্বল হয় নাই, জানালার মধ্য দিয়া ছায়া ঘরের মধ্যে অবতরণ করিতেছিল, কিন্তু ছাদের কার্ণিসে এখনও পশ্চিমের লালিমা রং খেলিতেছে। নন্দকিশোর চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন,

তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, নিকটস্থ চৌকিখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"বস।"

ইন্দুভূষণ আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। সে আজ তাঁর ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইয়াছে, উহা স্বাভাবিক অপেক্ষাও কোমল, সমধিক স্নেহপূর্ণ, ইহা কি কোন দুঃসংবাদের সূচনা ?

নন্দকিশোর কহিলেন—"তোমার অবস্থা ভাল নয় এবং অভিভাবক তেমন কেউ নেই, এ অবস্থায় বি-এল পাশ না করে ডাক্তারী পড়লে না কেন ?"

ইন্দু বুঝিল, এ একটা অবান্তর সূত্র, মূল সংশ্লিষ্ট নয়। সবিনয়ে কহিল—"ডাক্তারী পড়ায় খরচ বেশী তাই সাহস করিনি, স্কলাশিপের টাকা ক'টিরই ভরসা ছিল ত।"

"পাশ করে কি করবে স্থির করেছ ?—ওকালতি ?"

"আমাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে ওকালতি—"

"যদি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তা হলে ?"

ইন্দুভূষণ কিছু না বুঝিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিল। বিস্ময়েব কারণ বুঝিয়া নন্দকিশোর কথাটা ঘুবাইয়া লইলেন, গৌবীকে তোমার কেমন মনে হয় ? লোকে তাকে পাগলী বলে।" '

ইন্দুভূষণের সকল দ্বিধা চলিয়া গেল। সে সোৎসাহে কহিয়া উঠিল—"না, না, পাগল কিসের, অত্যন্ত সরল।—অতি চমৎকার মেয়ে !"

নন্দকিশোর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সৌৎসুক্যে তার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিয়া উঠিলেন—"তুমি তাকে নিয়ে আমার পুত্রস্থানীয় হও, আমার কাছে থাক,—এই আমার একান্ত ইচ্ছা,—এই জন্যই আমি তোমায তাকে চেনবার ভার দিয়েছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখে তাকে না বুঝে পাছে তার প্রতি অবিচার কর, এই ভয়ে।—তোমার আপত্তি আছে ?"

চাঁদ নিজে যদি পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসেন, পৃথিবী কি তাকে ফিরাইয়া দিবে ?

আটত্রিশ

পরদিন নিয়মিত পড়াইতে আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন, ছাত্রী পাঠ-গৃহে অনুপস্থিত, পড়িবার টেবিলের উপর মোটা খাতায় বড় বড় আঁকা বাঁকা ছাঁদের অক্ষরে তার দৈনিক হস্তলিপিগুলা পড়িয়া আছে। পুস্তকগুলাও মসীলিপ্ত, ছিন্নার্দ্ধ মূর্ত্তি লইয়া শুভ্র আস্তরণের উপর বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়া অধিকারিণীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ইন্দুভূষণ একবার জানালার নিকটে গিয়া কর্ম্ম কোলাহল ক্লান্ত রাজপথের পানে চাহিয়া দেখিল, পরে ফিরিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিল। এমন সময় গৌরী আসিয়া সহাস্যে কহিল—"আপনি এসেচেন? আমি কিন্তু জানতে পারিনি। আজ একটা চন্দনা কিনেছি কিনা, এতক্ষণ সেইটেকে খাওয়াচ্ছিলুম, উঃ কি দুষ্টু সেটা! অনেকক্ষণ এয়েছেন? ডাকেননি কেন?"

ইন্দুভূষণের মনে হইল, এ কণ্ঠ সমধিক মধুর রসসিক্ত! কহিল—"হ্যাঁ,—না,—অনেকক্ষণ তেমন নয়।"

ছাত্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—হ্যাঁ,—না, কি মাষ্টার মশায়? ওঃ—মা! আপনাব ছাতাটা বুঝি চুরি গেছে। তাই বুঝি এই নতুন ছাতা কিনেচেন?—বেশ এর হাতলটি ত! মাষ্টারমশায়, আপনার জুতোটাও ত দেখছি একেবারে নতুন। ও মা, সবই যে নতুন জিনিষ! কেন মাষ্টার মশায়? ও বুঝেছি, কুটুম বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যাবেন না?"

ছাত্রীর এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে মাষ্টার আরক্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁর সাজ-সজ্জাটা এখনই কি তবে লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে? চারি মাস পরে আজই নিজের অপরিচ্ছন্ন বেশ তাহাকে লজ্জিত করিয়াছে। কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে বলিয়া উঠিল,—"আজ তবে তুমি পড়বে না?"

"বাঃ, আমি যেন তাই বলেচি! পাখা চল্‌চে, তবু আপনি কত ঘামচেন! আপনাদের আজ ম্যাচ আছে না? এক্ষনি যেতে হবে না?"

"না,—ইতিহাস মুখস্থ বল।"

"১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। তাঁহার শাসন-

কালে—বঙ্গদেশে ইংরাজেরা—যাঃ, ভুলে গেছি। কতদিন আর পড়তে হবে, মাষ্টার মশায় ?”

“গৌরী !”

“কি মাষ্টার মশায় ?”

“আমি যদি বলি তোমাকে আর পড়তে হবে না ?”

“হুঁ—বাবা তাই নাকি শুনবেন ? বাবা বলেন, লেখাপড়া শেখা খুব ভাল।”

“যদি শোনেন ?”

“তাহলে খুব আহ্লাদ হবে।”

“শুধু আহ্লাদ হলেই ত চলবে না,—কি দেবে বল ?”

“আপনাকে—?” গৌরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“পুষুমণিকে দোব,—আর এক খাঁচা মুনিয়া পাখী দোব।”

ইন্দুভূষণ মৃদু হাসিল—“তাতে কিন্তু হবে না।”

“আচ্ছা, টিমি কুকুরটা নেবেন ? ওটা কি সুন্দর,—চোরটোরও তাড়াতে পাবে, কত ভাল !”

মাষ্টার এই সর্ব্বোত্তম পুরস্কারটির লোভও সংবরণ করিলেন, ডাকিলেন, “গৌরী !”

গৌরী হাসিয়া ফেলিল—“আজ কেবল কেবলই আমায় ডাকছেন কেন ? কি চাই বলুন না ? না—বলুন, বলতেই হবে।”

ইন্দু অপ্রতিভভাবে মুখ নত করিল, তার পর সহসা মাথা তুলিয়া দ্রুত কহিয়া গেল—“আমি এইটুকু শুনতে চাই, গরীব ব’লে আমায় তুমি ভবিষ্যতে ঘৃণা করবে না ?”

গৌরী উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—“ও মাগো, এ আবার কি কথা ! ঘৃণা কেন ক’রব ? গরীবকে বুঝি ঘৃণা করে ? দাদু বলেন, তিনি গরীব,—তাঁকে কেউ ঘৃণা করে নাকি ?”

গৌরি, তোমার মত শিশুকে যে এ সব ক্ষুদ্র আলোচনায় জড়াতে চায়, সে পাষণ্ড ! না, তোমার কাছে এ সব ছোট জিনিষ ঘেঁসতে পারে না, আমায় ক্ষমা কর।”

কথাগুলার অর্থবোধ হইল না। সে বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্তৃত করিয়া কহিল—"কি যে সব বলচেন। কেতাবের কথা বুঝি?"

"কেতাব ত মানুষেই তৈরি করে। তোমার বাবা তোমায় কিছু বলেন নি?" হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মত বিস্মরণের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল।—"ধেৎ" বলিয়া সবেগে বেণী দুলাইয়া সে মুখ লুকাইল। পিতা পূর্ব্ব রজনীতে একটিবার বলিযাছিলেন বটে,—"আচ্ছা, ইন্দুর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দিই?" সে সেখানেও যে উত্তর দিয়াছিল, এখানেও তাহার প্রভেদ করিল না। মাথাটাকে টেবিলের সহিত এক করিয়া ফেলিল। ইন্দুভূষণ স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"কিরে গৌরি! তোর পড়া শেষ হ'ল?"—বলিতে বলিতে অভিভাবিকা বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়া শিক্ষক ছাত্রী উভয়ে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, মাষ্টার সম্মুখের পুস্তকখানার পাতা উল্‌টাইয়া প্রশ্ন করিল—"প্রভঞ্জন' কথাটার মানে কি?" বলিতে বলিতে চকিতের মধ্যে একবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া লইল—কিন্তু কি ম্লান সে মুখ! এ কি সেই হাস্যময়ী গৌরী? তাঁর বক্ষে একটা অজ্ঞাত বেদনা বাজিল কেন সে সহসা এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল?

অভিভাবিকা দূর সম্পর্কে গৌরীর পিতার পিতৃষ্বসা, সম্পর্কে ঠান্‌দি, তিনি কহিলেন—"ইন্দু, তুমি ত ওকে এত ক'রেও পড়াশোনায় উন্নতি করাতে পা'রলে না, কা'ল থেকে একজন মাষ্টারণী স্থির করা হয়েছে; তোমার ভাই চাকরিটি গেল। তা' ডবল প্রেমোসন পেয়ে গেলে;—ক্ষেতি কিছু হবে না।—ও কি, উঠ কেন?—বসো, বসো।"

ইন্দুভূষণ মনের প্রফুল্লতা গোপন করিতে অক্ষম হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল,—"না, আর বসবো না, একটু কাজ আছে—" বলিতে বলিতে ছাতাটার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পলাইয়া গেল। গৌরী নতনেত্রে নিজের পদাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইন্দুভূষণ চলিয়া গেলে, মুখ তুলিয়া ঠান্‌দির পানে চাহিল। তিনি তাহাকে একটা ব্যঙ্গরসসিক্ত মধুর সম্ভাষণে ভাষিত করিতে যাইতেছিলেন, সে বাধা দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"বাবাকে বলুন না, আমি বিয়ে করবো না।"

ঠান্‌দিদি হাসিলেন—"ক্ষ্যাপা মেয়ে, আমি বল্লেই বা এমন অদ্ভুত কথা সে রাখবে কেন? কেন বিয়ে করবিনি? কেন না?"

"জানি না।"

"ইস,—বিয়ে কর্ব্বেন না,—ন্যাকা মেয়ে! বিযে সব্বাই করে মেয়েমানুষ কি আইবুড় থাকে।"

"উনি মাষ্টারমশাই যে,—ছিঃ—কি রকম?"

"তা'তে কি! স্বামীও ত মহাগুরু,—এত ভালই হবে লো।" মুহূর্ত্তে হাসির কলতানে কক্ষ মুখর করিয়া বিষণ্ণা গৌরী ঠান্‌দিব কোলে লুটাইয়া পড়িল—"গুরু? স্বামী মহাগুরু? তা'হলে আমাকে পা ধুইয়ে দিতে হবে ত? প্রণামী দিতে হবে? মাগো মা,—এমন কথাও শুনিনি।"

নন্দকিশোরের কন্যার বিবাহ-সংবাদ সুপ্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকবা দোকানী পসারীর আনাগোনার সঙ্গে ইন্দুভূষণ বেচারার এ গৃহে আগমন বন্ধ হইল, ভাল দেখায় না, পাড়াব মেয়েরা জানালার পাখী তুলিযা কাণাকাণি করে।

গৌরী যখন দেখিল বিবাহেব দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তখন সে একদিন স্থির করিয়া বসিল, নিজেই পিতাকে বলিবে। সে সেদিন স্কুলের প্রাইজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে কত বড বড় মেয়েরা আইবুড় রহিয়াছে।

সিঁডি দিযা উঠিতে উঠিতে দেখিল, সরকার একখানা বোঝাই গাড়ি হইতে নামাইয়া বড় বড় তুইটা ষ্টিল ট্রাঙ্ক, কতকগুলি রেশমী ও সুতি শাড়ী বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিতেছে। এদিকে ঠান্‌দি দশরথ চাকরকে ডাকিযা মালীকে টোপর আর সিঁথি ময়ূরের ফরমাস করিতেছেন।

ডাকিল—"বাবা!"

"মা!" নন্দকিশোর টেবিলের উপর হইতে একটা ভেলভেট মণ্ডিত বাক্স তুলিয়া আবরণ মোচনপূর্ব্বক কন্যার সম্মুখে ধরিলেন, কহিলেন—"তোমার এ হার পছন্দ?

"বেশ ত দেখতে! কত বড় বড় মুক্তো! ওগুলো কি? হীরে! কি রকম চক্‌চকে! একে কি বলে?—চুনী!—বাবা—"

"পর মা! আমি একবার দেখি—মাকে আমার কেমন্‌ দেখায়।"

গৌরী অগত্যা হার পরিল; কিন্তু কিসের জন্য এ অলঙ্কার মনে করিতে উৎসাহ জন্মিল না। ছলছল নেত্রে বলিয়া ফেলিল—"আমি বিয়ে ক'রব না।"

"সে কি? কেন মা!" নন্দকিশোর চমকিয়া উঠিলেন।

"জানি না,—এখন থাক।" গৌরী নিজের মধ্যে দারুণ দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। কথা জড়াইয়া গেল, কান্না আসিল। পিতা কহিলেন—"তা'কি হয় মা? কেন, তোমায় ত কোথাও যেতে হবে :না,—তুমি সর্ব্বদা আমার কাছেইতো' থাকবে।"

গৌরী নিরুত্তর রহিল, এ কথার উপর আর কি বলা যায় তার তা' জানা নাই।

উনচল্লিশ

বিবাহ-বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন যতই আনন্দ সমারোহ জাগাইতেছিল, পিতা পুত্রীর মনের বেদনা ও উদ্বেগ ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল। নন্দকিশোর বিবাহ উপলক্ষে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন, সামাজিক বিতরণ, দরিদ্র ভোজন, নানা সৎকার্য্যের সহায়তায় দান হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসীদের বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া ভোক্ষ্য ভোজ্যের অপর্য্যাপ্ত আয়োজনে পাড়া প্রতিবেশীর সন্তোষ বিধান কিছুরই তিনি ত্রুটী রাখেন নাই, তথাপি মনে দুঃখের ভার চাপিয়া আছে। পিতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বেদনা, পরহস্তে সমর্পণের সুখ-জড়িত ব্যথা ত ছিলই, ইহার উপর গৌরীর পরিবর্ত্তন তাঁহাকে উদ্বগ্ন করিয়া ছিল। সহসা সে এমন বদলাইয়া গেল কেন, এই কথাটা তাঁর মনকে অস্থির করিয়াছিল। মুখে তার হাসি নাই, এতটুকু স্ফূর্ত্তি নাই, বীতস্পৃহা বর্ষীয়সীর মত সে স্তব্ধ নিঝুম হইয়া থাকে।—এ'কি? একদিন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে গৌরি?"

"কিছুই ত হয় নি—" বলিয়াই সে মুখ নত করিল। "কি আবার হবে বাবা?" বলিয়া ত কল-ঝঙ্কারে হাসিয়া উঠিল না! কেন এমন হইল?

সন্ধ্যার ইমন কল্যাণে সানাই বাজিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে জানাইয়া দিল, বিবাহ নিকটবর্ত্তী। রঙ্গীন কাপড় পরা দাসদাসীগণ কর্ম্মবাড়ীকে কোলাহলে সরগরম করিয়া তুলিল।

দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের কনে নীচের উঠানে লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছিল। অদূরে শকটচক্রমথিত জনসঙ্ঘর্ষিত রাজপথ, লোকজন গাড়ি ঘোড়া এবং টুং টাং শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া বিসর্পিত-গতি ট্রামগুলা কর্ণ বধির করিয়া ছুটিতেছে।

গৌরী একটা ডালিয়া ফুলের রক্ত পাপড়ি নখরছিন্ন করিতে করিতে প্রাসাদময়ী নগরীর পানে অনিমেষে চাহিয়া আছে। যে দিন এই দৃশ্য তার সরল নেত্রে বিস্ময়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, আজ সেদিন নাই। আজ তারা তার নেত্র-দর্পণে ভাসিতেছে, ভিতরে প্রতিফলিত হয় নাই, সে

কিছুই দেখিতেছিল না,—চাহিয়াছিল মাত্র। নন্দকিশোর চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া এইখানে আসিয়া ডাকিলেন—"গৌরি!" গৌরী একটু চমকিয়া উঠিল, তারপর কবরীবদ্ধ চুলের মধ্য হইতে যে গুচ্ছটা শিথিল হইয়া মুখে পড়িয়াছিল, সেটাকে বামহস্তে সরাইয়া মুখ ফিরাইল। নন্দকিশোর নিকটে আসিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া সস্নেহে মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করচ মা? একলা কেন? এ কি কাঁদচ?" তিনি তাহার গণ্ডে অশ্রু দেখিতে পাইয়াছিলেন। ব্যথিত হইয়া আবার কহিলেন—'কেন মা?'

গৌরী কথা কহিল না, একবার শুধু সজল নেত্রে পিতার পানে চাহিল। বক্ষ হইতে একটা আকুল নিশ্বাস বাহির হইয়া ধূমভারাতুর বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল। পুনশ্চ নত মুখে সে একটু দ্রুত হস্তে পুষ্পপেলব দীর্ণ করিতে লাগিল। নন্দকিশোর কিছুক্ষণ তার বিষাদপূর্ণ মুখের উপর স্থিরচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া পরে জোর করিয়া যেন দুর্ভাবনাটাকে পরিত্যাগ চেষ্টায় কহিলেন—"দুজন কে' এসেছেন বল তো দেখি?"

গৌরী জিজ্ঞাসার ভাবে চাহিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিল না। তখন নন্দকিশোর আপনা হইতেই বলিলেন—"তোমার মাসিমা আর সত্যেন্দ্র।"

"সত্যদা এসেছে!—এতদিন পরে এলো—" গভীর হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে অকস্মাৎ স থামিয়া গেল। "কোথা যাচ্চো, গৌরি? সে নীচে আছে, দেখা ক'রবে এসো, এখনই সে নাকি ফিরে যাবে।"

দেড় বৎসর পরে দুই বাল্যসাথীর সাক্ষাৎ ঘটিল। দুজনেই দুজনকে দেখিয়া মনে মনে যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করিল। দুজনেই ভাবিল, কি বদ্‌লে গেছে—চেনা যায় না।" সত্যই প্রথমে বাল্যসখীকে সম্বোধন করিল—"ভাল আছ, গৌরি?"

'গৌরী 'ভাল আছ!' এ যেন কেতাবে লেখা বানানো কথা! তথাপি গৌরী হাসিবার এত বড় সুযোগটা প্রত্যাখ্যান করিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িল, কথা কহিতে পারিল না! চোখে কেবলই জলের ঝাপ্‌সা রেখা আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল যে।

সত্য দেখিল, তার সখী শুধু গায়ে মাথাতেই বাড়িয়া উঠে নাই,

স্বভাবেও সে বড় হইয়া গিয়াছে। সে যে এতক্ষণ ধরিয়া স্থির করিয়াছিল, ছিপ, বঁড়সি, আম চুরি লইয়া তাহার সহিত কি কি আলোচনা করিবে—সে সব কথা এই সুসজ্জিতা সুন্দরীকে বলা এখন যেন সম্ভব মনে হইল না। গৌরী আর সে গৌরী নাই! এত সুন্দরই বা সে কেমন করিয়া হইল? কৈ, সে ত সত্যদা বলিয়া ছুটিয়া আসিল না? গচ্ছিত দ্রব্যগুলার দাবী করিল না,—সেগুলা যে তাহারই অনবধানতায় খোয়া গিয়াছে, ইহা জানিয়া তাহাকে তিরস্কারও করিল না? গৌরী এখন এত পর হইয়া গিয়াছে! মন তার বিদ্রোহ কবিয়া উঠিল। চৌকীর নিকট দাঁড়াইয়া সেও পূর্ণ অবহেলার ভাবে গৃহসজ্জা পরিদর্শনে মন দিল।—ঈষ্। মেয়ের বিয়ে হচ্চে ত, যেন লাট সাহেবই হচ্চেন, গ্রাহ্যই নেই!

গৌরী তার অভিমান বুঝিল না। সে যে তাহাব প্রতি এত বড় অবিচার করিতেছে, এ সম্বন্ধে পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া স্বেদ জলে অহেতুক ভিজিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সেই ঘরের অন্য প্রান্তে চশমার মধ্য হইতে তাদের দিকে যিনি স্থিরনেত্রে চাহিয়া ছিলেন, তিনি বোধ কবি তাদের দুইজনকেই বুঝিতেছিলেন—তিনি তাদের মত মানব চরিত্র লিপি পঠনে অনভিজ্ঞ নন।

নন্দকিশোর কহিলেন—"সত্যেন্দ্রবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবে না গৌরি!"

গৌরী উত্তর না দিয়া সত্যেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল, সত্যও দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল, চোখে চোখ মিলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল। এমন করিয়া পূর্ব্বে তাদের সহস্র বিবাদ মিটিয়াছে; বুঝি সেই কথাই তার মনে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু আজ আর তা হইল না! সে হাসির বিদ্যুৎ গৌরীর মেঘাচ্ছন্ন নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া জলের ঝরণা ঝরাইয়া দিল। গৌরী অকস্মাৎ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর ডাকিলেন—"গৌরি, গৌরি!" সে ফিরিল না।

বিন্ধ্যবাসিনী সন্ধান করিয়া সংবাদ পাইয়া যখন তার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সে ঘরে আলো ছিল না। নীরব কক্ষে থাকিয়া থাকিয়া একটা রুদ্ধ বেদনার চাপা কান্নার অব্যক্ত ধ্বনি যেন কোন মতে নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

পরদিন নহবতের শানাই প্রভাতী সুরে প্রতিবাসী গৃহের শিশুদের জাগাইয়া তুলিয়া উৎসব-গৃহের দ্বারে জড় করিল। নন্দকিশোর নিয়মিত কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ চিকিৎসাগারে প্রবেশ করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই বিমূঢ়ভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। উপরে উঠিয়া ডাকিলেন—"বিন্ধ্য!" বিন্ধ্যবাসিনী শশব্যস্তে আসিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়াই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন,—হইয়াছে কি?

নন্দকিশোর বলিলেন,—"গৌরী নাম ওর কে' রেখেছিল? তোমরা কি?"

সংশয় কম্পিত সভয় কণ্ঠ এমন করিয়া বাধিয়া যাইতেছিল যে মনে হইতেছিল, তিনি যেন জজের কাছে তাঁর সর্ব্বস্ব পণের মকর্দ্দমার রায় শুনিতে চাহিতেছেন।

.বিমূঢ় ভাবেই বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন—"তা'তো জানিনে,—বোধ করি দিদিই রেখে থাকবে। যখন ওকে আনা হয় ওর জামার বিছানায় ঐ নামই ত লেখা ছিল।—আমরাও সেই থেকে ওকে গৌরী বলেই ডাকি।"

জজের রায়ে হতাশার সংবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল। নন্দকিশোরের মুখ নীল মাড়িয়া গেল। সমস্ত জীবনী শক্তিই যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমনই তাঁর বোধ হইল। আশাহীনের অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত মুখ হইতে বাহির হইল—"ভাল করে ভেবে দেখ।"

"এর মধ্যে ভাববার তো কিছুই নেই! জামা কাঁথার চেয়াতে গৌরী লেখাই ত ছিল।"

"আমার সবই ফুরিয়ে গ্যাল!"

অজানিত ভয়ে সম্মুখবর্ত্তিনী নারী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"লাহিড়ী মশাই!"

"জানো না তো বিন্ধ্য। ধারণা করিতেও পারেনি, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো—আমার তাহলে জগতে আর কেউ নেই—"

"লাহিড়ী মশাই! এ কি, পাগল হয়ে গেলেন—"

"পাগল? না পাগল ঠিক হই নি। শোন, যাকে আমার ব'লে মনে করে বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ভেবেছিলাম, সে আমার নয়, সে তোমার দিদির কাছে গচ্ছিত রাখা ভবানীপ্রসাদের মেয়ে। আমার মেয়েই মারা গেছলো,

সে নয়। ভবানীপ্রসাদ হঠাৎ এখানে এসেছে—বলচে, এ মেয়ে তার, আমার নয়। সে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তার মেয়ে তাই তার মতে এ বিয়েও হতে পারে না।”

“সে ভুল করেচে,—গৌরী দিদিরই মেয়ে। দাদা গিয়ে যখন নিয়ে আসেন, তিনি তাহলে শুনতে পেতেন না? বলেন কি? না, না।” দাদা কি খবর নেন নি।

নন্দকিশোরের চারিদিকের পৃথিবী তখন ভীষণ বেগে দুলিয়া উঠিযাছিল; অচলা পৃথ্বীর সচলতা অকস্মাৎ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁর অপ্রত্যাশিত রূপে পাওয়া প্রাণাধিকা গৌরী তাঁর নয়?—না মনে,—না বাহিরে।

তবে এ দুদিনের জন্য অন্ধের দৃষ্টি কেন দান করলে, ভগবান? চিরঅন্ধকারই ত ভাল ছিল।

স্খলিত পদে নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে ভর দিয়া নন্দকিশোর নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘুর্ণিত মস্তক দেহভার বহন করিতে পারিতেছিল না; তাই আসন গ্রহণ করিতে হইল। গ্রহণলাগা সূর্য্যের ঝাপ্‌সা আলোর মত সূর্য্য-কিরণ তাঁর দৃষ্টি-পটে পুরাতন বাঙ্গলা কালীর হরিদ্র লেখা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল—সে লেখা অবোধ্য অস্পষ্ট। একমাত্র স্নেহ পাত্রীর কৃতঘ্নতা,—ভাগ্যের বিশ্বাসঘাতকতা, এক সঙ্গে দুইটা আঘাত বড় বেশী নয় কি? গত সন্ধ্যার ঘটনা শেলের মত বিঁধিয়া আছে, হতাশ হৃদয় সেই অবধি কানে কানে বলিতেছিল—এত করিযাও মেয়ের মন পাইলাম না? তাকে সুখী করিতে পারিলাম না? ঐ কি আমার অজ্ঞাত পাতকের শাস্তি?

কিন্তু এই নব আতঙ্ক সহসা সে কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। শুধু এই মাত্র মনে আছে—গৌরী তাঁর হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; সে আর তাঁর নাই, সে অপরের। অন্য লোক তার বাপ,—তাঁহার এ জগতে কেহ নাই। হতাশার তীব্র ক্রন্দন মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল।

দ্বারের বাহির হইতে শ্রুত হইল,—“নন্দকিশোরবাবু বুড়ো ব্রাহ্মণটাকে বসিয়ে রাখলেন, উত্তরটা দিয়ে গেলেন না? ভিতরে যেতে পারি?”

উত্তরের পূর্ব্বেই দ্বার ঠেলিয়া কাশকুসুমসদৃশ শুভ্র মস্তক ও প্রসন্ন মুখ লইয়া এক অপরিচিত প্রবীণ প্রবিষ্ট হইলেন। নন্দকিশোর তাহাকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিতে গেলেন, কিন্তু কে যেন তাঁহাকে বাঁধিয়া দিয়াছে—উত্থান অসম্ভব হইল। ঈষৎ কম্পিত অধর একটা অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করিলেও অর্থবোধ হইল না। বিন্ধ্য তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে সচেতন হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। আগন্তুক কহিল—"আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার কাছে লজ্জা কি, মা? তাহলে ডাক্তারবাবু আমারই অনুমান ঠিক ত?"

আবার একটা অস্ফুট ধ্বনি নন্দকিশোরের কণ্ঠ ভেদ করিল—"এরাতো বলছে নাম এরা রাখে নি।"

"আমার স্ত্রী সূতিকাগারেই ওর নাম রাখেন,—গৌরী। আপনি জানেন, সূতিকাগারেই তাঁর মৃত্যু হয; আমিও সেই অবধি ভবঘুরে। দু বৎসর পরে মিরাটে ফিরে আপনাদের সন্ধান করি, কিন্তু কোন খবরই পাইনি। এবার কলকাতায় এসে এই পাড়ায এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথায় কথায়, আপনার কথা,—আপনার কন্যার বিবাহের কথা ওঠে, তিনিই কন্যার নাম উল্লেখ ক'রতে আমি চম্‌কে উঠি। গৌরী! সে ত আমারই মেয়ে—"

"বাবা!'

নন্দকিশোর চমকিয়া দেখিলেন, দুইখানা বল্লরী-কোমল বাহু তাঁহাকে সজোরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে—জুঁইফুলের মত একখানা ক্ষুদ্র মুখ তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া "বাবা!—বলিয়া ডাকিতেছে। সহসা তিনি সঞ্জীবনী তড়িৎ স্পর্শ অনুভব করিলেন। নন্দকিশোর পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় অকস্মাৎ যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রবলবেগে দুই হস্তে তাহাকে টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আকুল আর্ত্ত হৃদয় হইতে আর্ত্তনাদ বাহির হইল,—"মা, মা আমার! পরক্ষণে দুই বাহু শিথিল হইয়া দুই পার্শ্বে নামিয়া পড়িল—অবসাদগ্রস্তভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"হাঁ বাবা! আমায় না কি আবার কে না, কে একটা বুড়ো নিতে এসেছে?" গৌরীর মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া।—অদূরবর্ত্তী বৃদ্ধকে সে লক্ষ্যও

করে নাই। সংবাদটা কেমন করিয়াই ইতোমধ্যে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া তাহার কর্ণগোচর হইযাছিল।

বৃদ্ধ কহিল—"হ্যাঁ বাছা, আমিই তোমায দেখতে এসেচি—"

গৌরী বিদ্যুৎবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া সভযে নন্দকিশোরের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, কহিল—"এই এর সঙ্গেই কি আবার আমায় এখান থেকেও চলে যেতে হবে?"

মর্ম্মভেদী আবেদনের সুর হইলেও কি প্রচণ্ডতাপতপ্ত এ ভর্ৎসনা। —সে বলিতেছিল, এমন করিয়া তোমরা আমায় লইযা এ কি বীভৎস জুয়াখেলা খেলিতেছ?—নন্দকিশোর উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"উনিই তোমার বাবা, গৌরী! উনি হয়ত তোমায নিয়ে যাবেন, আমি ত তোমার কেউ নই—আমি কেমন ক'রে তোমায ধরে রাখব, মা আমার?" হৃৎপিণ্ডটা বোধ করি এই কথা কয়টার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি তার কেহ ন'ন? তাঁর সর্ব্বস্ব-ধন,—যে তাঁর চির দুঃখময় জীবনকে এত দিনে সুখের শান্তির অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়াছে,—সে তাঁর কেহই নয়?

গৌরী আকুল হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া উগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"যাও তুমি আমি যাব না।"

"না মা, তোমায় যেতে হবে না। তুমি যাঁর সন্তান হয়ে আছ সেখানেই থাক, সুখে থাক,—সকলকে সুখী কর। আমি ভবঘুরে মানুষ, চালচুলোও নেই আমার, তোমায় আমি কোথায় নিয়ে যাব? কেন তোমার ভালবাসার লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রব? শুধু একবার চোখে দেখে গেলাম,—আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলাম, আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ভালই হবে।··ডাক্তারবাবু! ভয় নেই দাদা! আপনার ধন আমি অপহরণ ক'রব না। এই বিয়েটা বন্ধ করা দরকার, ভিন্নগোত্রে ভিন্ন পৈত্রিক পরিচয়ে আমাদের ত হিন্দু বিয়ে হয় না। তা' না হলে শুধু দূর থেকে দেখেই চলে যেতাম। চল্লুম ভাই! রাঢ়ী পাত্র দেখে বিয়ে দেবেন। সুখে থাক মা,—চিরসুখী হও।"

এতক্ষণে ঘরের বাতাস যেন লঘু হইয়া আসিল, সূর্য্যের জ্যোতিঃ দীপ্ত তেজে জলিয়া উঠিল, পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সহজ অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া

নন্দকিশোর স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন—"তবে একে আমায় দিলেন ?"

"ও ত আপনারই—"

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে কোন সাড়া রহিল না, কেবল গৌরীর দ্রুত নিশ্বাসের একটা অস্ফুট শব্দ থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতেছিল! সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল—তাই আশ্বাস-লাভেও, সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তার জীবনে এ কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে ? মাসিমা ভিন্ন সত্যকার কেহই ছিল না, হঠাৎ একদিন একজন গিয়া পিতৃ পরিচয়ে তাহাকে সেই মাসিমার বুক হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। সে বিচ্ছেদ-ব্যথা এখনও জুড়ায় নাই। আবার অপর একজন আসিয়া বলিল—"ও নয়— আমিই তোমার বাবা!" আবার পিতা নিজেও সেই কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন,—"হাঁ, উনিই তোমার পিতা আমি কেউ নই।"

গৌরীর পিতা অবশেষে সেই উন্মাদনাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"তবে চল্লেম, লাহিড়ী মশাই। আর দেখা হয় কি না হয়।—এবার বদরিকেদার গঙ্গোত্রী চন্দনোত্রি যাব ভেবেছি। মা একবার ফিরে দাঁড়াও, মুখখানি দেখে যাই—" গৌরী নন্দকিশোরের বক্ষে সজোরে মুখ লুকাইল। তিনি সস্নেহে কহিলেন,—"যাও গৌরি, ওঁকে প্রণাম ক'রো।"

সে এ আদেশ প্রতিপালন করিল না বরং জোর দিয়া নিজের মুখ যথাস্থানে চাপিয়া রাখিল। নন্দকিশোর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে ঈষৎ অপ্রতিভ ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন বুঝিয়া ভবানী প্রসাদ হাসিয়া কহিলেন—"থাক্, থাক্, বেটী ভয় পাচ্ছে, পাছে ওর মুখখানি দেখ্‌লে এ পাষাণ বুকে প্রাণ সঞ্চার হয়ে যায়, পাছে মায়ার বাঁধনে প'ড়ে যাই,—হয়ত ঠিকই বুঝেছে। কি বলেন, ডাক্তার বাবু! আচ্ছা আসি নমস্কার মশাই!"

নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"সে কি এখনই কেন যাবেন ? দু-এক দিন—না হয় আজকের দিনটা—"

"কেন মিথ্যে আবার জড়াতে চাচ্ছেন ? আর দেখুন, এখন আমার এখানে থাকায় আপনি আমি আমাদের এই মাবেটী কেউই ঠিক স্বস্তি পাবো না মনে হচ্ছে। চলি—"

দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দে গৌরী বুঝিল, সে ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছে। মুখ তুলিতেই দুইটি গভীর স্নেহভরা উৎকণ্ঠিত নেত্রের সহিত নেত্র মিলিল। উভয়েই একটু হাসিল! গৌরী অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়োটা চলে গিয়েছে ত ঠিক?

"হ্যাঁ।—কিন্তু ও রকম করে তাঁকে বলতে নেই গৌরী, তিনি তোমার বাবা, আর কত মহৎ তিনি।"

কৃতজ্ঞতার আনন্দে নন্দকিশোর রুদ্ধবাক্ হইয়া গললগ্না কন্যাকে আর কাছে সরাইয়া লইলেন। তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে গৌরী কহিল—"রাম বল! ও বুড়ো কেন আমার বাবা হতে গেল? তুমিই তো আমার সত্যিকারের বাবা।"

বিন্ধ্যবাসিনী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে ছিলেন, এইবার খিল খিল হাসিয়া ফেলিলেন।

চল্লিশ

মানব-অন্তঃকরণের নিভৃত কন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক তার মানসলিপি পাঠ চেষ্টার মত কঠিন চেষ্টা বোধ করি আর কিছুই নাই। কি গভীর কি জটিলতার জালে জড়াইয়া বিধাতা ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়! যে মানব চিত্ত আত্ম-চৈতন্যের অবস্থিতি-গৌরবে উজ্জ্বল—আনন্দময় ও মহৎ, তাহাই নিজ স্বার্থানুসরণে নিরত হইলে ঘৃণ্য বীভৎস ও কুৎসিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এ জগতে সমুদ্রের বিশালতায় আমরা বিস্মিত হই, অনন্ত আকাশের বিশালতর মূর্ত্তি আমাদের চিত্তকে স্তম্ভিত করে; কিন্তু এই অসীম মানব-চিত্তের বিরাট পরিচয় আমাদের সমস্ত ধারণাকে অভিভূত করিয়া দেয়। একটি ক্ষুদ্র হৃদয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক যদি কেহ কাব্য লিখিতে বসেন, তবে নিঃসন্দেহ সে কাব্য মহাকাব্যকেও পরাভব করিতে সমর্থ। মানব-চিত্তে যাহা নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও তা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শচীকান্ত জীবিত দেহে প্রাণহীনবৎ সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিল। যে নাম সে জীবনের সম্বল করিয়াছিল, করালীচরণের মুখে অকস্মাৎ তাহা উচ্চারিত হইবার পর হইতে সে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল। অবস্থা বিশেষে বিষ অমৃত ও অমৃত বিষে পরিণত হয় না কি?

ট্রেন আসিল। বিরাট দৈত্যের মত উদর-গহ্বরে কতকগুলা লোক জুড়িয়া গর্জ্জন শব্দে বিদায় হইল। সন্ধ্যে শুকতারা তাহারই কুক্ষিতলে বিলীন হইয়া গেল, তথাপি শচীকান্তর শরীরের কম্পন থামিল না। একটা প্রবল ঝটিকা ভিতর হইতে দুর্ব্বল দেবদারুর মত তাহাকে কাঁপাইতেছিল, তাহা তার বিবেক ও স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ। পরম মুহূর্ত্তে সে মনে করিল,—"এখনই শিবনারায়ণকে গিয়া খবর দিই, তিনি এদের হাত হইতে মণীশের বাগ্‌দত্তাকে মুক্ত করিয়া নিন। এ লোক অতি নীচ, এর অভিপ্রায় ভাল নয়, অর্থের জন্য এ সব করিতে পারে।" কিন্তু এ চিন্তা স্থায়ী হইল না। এই প্রাথমিক মহত্ত্বকে চাপা দিয়া স্বার্থ হাঁকিয়া উঠিল—"রহ, রহ,—এত ব্যস্ত কেন? ভাবিয়া দেখা যাক্—সত্য সত্যই এর প্রয়োজন আছে কি না!" এইখানেই দেবে দানবে, যমদূতে বিষ্ণুদূতে সমর বাধিল। বিবেক কহিল—"ভাবিবে আবার কি? কর্ত্তব্যপালনে বিলম্ব

অবিধেয়।” স্বার্থ আপত্তি তুলিল,—“কর্ত্তব্যই ত করিতে চাহি, কমলা মণীশের বাগ্‌দত্তা কিসে? তার যথার্থ অভিভাবক বহুপূর্ব্বে তাহাকে আমায় দিয়াছেন, তার উপর মণীশের কিসের অধিকার?”

বিবেক এ যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টায় শরক্ষেপ না করিল তা নয়, কিন্তু এ দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। সপ্তরথীতে প্রবেশ পথ আগলাইয়া রাখিয়াছে। বিবেকের শাসন মন মানিতে চাহে না, সে প্রবল স্বরে হাঁকিয়া বলে—“কেন আমি এ সুযোগ ছাড়িয়ে দিব? কেন আমি নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিব না? আমি ত চেষ্টা করি নাই,—যদি -”

এইখানেই একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়,—কি বলিবে? ‘যদি ঈশ্বর সুযোগ দিয়াছেন?’ ঈশ্বর কে? সে ত তাঁকে কখন চিনে নাই,—ডাকে নাই,—আছেন কি না, সে বিষয়েও সংশয় করিয়াছে, তবে কি দৈব? অদৃষ্ট? কে, তাকে আজ এ সুযোগ দান করিল? তা সে যেই হোক, কি আসে যায়, কেন সে তার দান গ্রহণ করিবে না?

সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল। রাত্রিও গভীরতর হইতে লাগিল। বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া ডেলি-পেসেঞ্জার ট্রেনগুলা অফিসের বাবুদের ঘরে ফিরাইতে গেল। ষ্টেশন জনশূন্য হইতে হইতে এক সময় নিঃসাড়া হইয়া আসিল। বাহিরে গাছের ঝোপের মধ্যে তীব্রস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে লাগিল। কুয়াশার পাতলা চাদর নৈশ প্রকৃতির অঙ্গ আচ্ছাদন করিল, ক্ষীণ নক্ষত্রাবলী সূক্ষ্ম বস্ত্রান্তরালে সুন্দরীর অলঙ্কার দীপ্তির মত অর্দ্ধ বিকশিত হইয়া রহিল, কেবল গাছপালায় অসংখ্য জোনাকির ঝিমানি যেন তাঁরই নিশ্বাস-প্রশ্বাস কম্পিত হীরক দ্যুতির মত থাকিয়া থাকিয়া ঝকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রবল শীত হিম নিদ্রালস্য উপেক্ষা করিয়া শচীকান্ত তেমনই স্তব্ধ বসিয়া রহিল এবং তার মনের মধ্যে একই ভাবে ঝড় বহিতে লাগিল।

ষ্টেশনে লোকজন অল্পই। কুলী দুইটা একটা চট মোড়া মাল ঠেলিয়া আনিয়া তারই গায়ে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিল, আলোগুলা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কেবল একটিমাত্র বড় ল্যাম্প মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। ভোর পর্য্যন্ত আর কোন গাড়ি আসিবার কথা নাই। পাশের দোকানগুলাও সেই অবসরে নিঃশুতি হইয়া গিয়াছে।

সে ভাবিতে ভাবিতে আলোটার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। যেন মনে হইল, সেই আলোকে কে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত উলটিয়া দেখিতেছে! সে আলোর দিকে পিছন ফিরিল। কিন্তু হায়, সেই অদৃশ্য দর্শকের অন্তর্ভেদি দৃষ্টি হইতে নিজেকেও লুকাইতে পারিল না। মৃদু অন্ধকারেও তারই দুই নেত্র অনল উদ্গীরণ করিয়া যুক্ত-তারকার আকারে চোখের উপর ভর্ৎসনা দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাখিল যে! শচীকান্ত শিহরিয়া চোখ মুদিয়া বেঞ্চের পিঠে মাথা রাখিল। সে দৃষ্টি তার পিতার অচল নেত্র-যুগল স্মরণ করাইয়া দেয় না কি? সে মনে মনে বলিল—যেন সেই দৃষ্টির সম্মুখে নিজের কৈফিয়ৎ দিতে চাহিল,—আমার দোষ কি? অমি ত কোন অন্যায় করছি না, কারও ক্ষতি করতেও চাই নি।"

কিন্তু সঙ্কোচ নাই, বলিলেও সঙ্কোচ কি যায়? দোষ নেই ভাবিতে চেষ্টা করিলেও সারা প্রাণ অপরাধের ভারে ভারী হইয়া উঠিতেছে না কি? মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন? পাপ যদি নয়, তবে কিসের আগুন? কেন এ হত্যাকারীর আতঙ্ক? চোরের মত যন্ত্রণাপূর্ণ সঙ্কোচ! ইহা,—কি তবে?

সে উঠিয়া, বসিল, চারিদিকে চাহিয়া ললাটের কেশ অপসৃত করিল, কুয়াশার আক্রমণে নক্ষত্র দুইটি ঢাকা পড়িয়াছে, তথাপি সেই দিকে চোখ পড়িতেই আবার তার আপদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। সেই অদৃশ্য তারকাদ্বয় যেন অগ্নিময় অক্ষরে তার পিতার হস্তলিপির অনুকল্পে লিখিয়া রাখিয়াছে,—"বিশ্বাসঘাতকতা,—মিত্রদ্রোহ!"

জ্বলন্ত গোলা যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে বিদ্ধ করিয়া একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বাহির করিয়া লইল,—"ওঃ, না, না, না।"

সে যেন তার সম্মুখে তাঁহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল। প্রসন্ন সেই মুখ, তেমনই হৃদয়ভেদী দৃষ্টি! তিনি যেন তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। শুধু একটু হাসি, কিন্তু ইহাতেই তার সর্ব্ব-দেহ শিহরিয়া উঠিল। যেন কানের কাছে স্পষ্ট তাঁহারই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল,—"এই ত বিশ্বাসঘাতকতা,—মিত্রদ্রোহ ত ইহাই।" তবে তাহাকে কি এখনই চাকদায় যাইতে হইবে? মণীশের খুল্লতাতের নিকট করালীচরণের অসদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুত্বের ঋণ শোধ

করিতে হইবে? লোকে তাহাকে বন্ধুবৎসল বলিবে কিন্তু তার কি লাভ? তিনটি বৎসর যার সন্ধানে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, যার জন্য সংসারের কোন লাভের দিকেই চাহে নাই, করায়ত্ত লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দারিদ্র্যবরণে দ্বিধা মাত্র করে নাই, সেই চির ঈপ্সিতাকে কিসের মূল্যে সে ত্যাগ করিবে? বন্ধুত্ব? কর্ত্তব্য? সংসারে মূল্য কি এদের? গলা টিপিয়া আত্মহত্যা করাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাই হোক,—প্রথম ট্রেনেই চাকদা যাইবে।

এতক্ষণে যেন মস্তিষ্ক ও বক্ষের অস্থিরতা কতকটা স্থির হইল। ফুটন্ত শোণিততরঙ্গ উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গ করিয়া শান্ত গতি ধরিয়া নিজ পথে বহিতে আরম্ভ করিল। এত শীতেও আভ্যন্তরিক তাপে ললাটে যে ঘর্ম্ম জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া দুই হাতে সে মাথাটা টিপিয়া ধরিল, ইহাতেও ললাটের স্ফীত শিরা অল্পে অল্পে স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। সহসা চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। শব্দাহত শচীকান্ত সহসা যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে ত কই আমার কথা মনে করে নাই? অত বড় সন্দেহজনক অবস্থায় না কি কেহ তাদের সত্য পরিচয়ে অনভিজ্ঞ থাকে? মণীশ নিশ্চয় জানিত, এ তারই সেই হারান কমলা। সে কি তার মুখ চাহিয়াছিল? তবে কেন সে নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে?—না কর্ত্তব্য এমন নয়, সে ভুল বুঝিয়াছিল। কিছুই সে প্রকাশ করিবে না। করালীচরণ যে ইঙ্গিত দিয়া গেল, সেই মতই কাজ করিয়া যার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী, তাহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। জীবনের একমাত্র সুখের আলো কেন সে পাগলের মত নিবাতে যাইবে! সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই—মণীশই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

এতক্ষণে আসন ছাড়িয়া সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন কুয়াশার আস্তরণ স্থূল হইয়া সুপ্ত জগতের অঙ্গে শীতবস্ত্র বিছাইয়া দিয়াছে। আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিজে বল দিবার জন্য মনে মনে কহিল,—এইটেই আমার কর্ত্তব্য যে কমলাকে ঐ রাক্ষসটার হাত থেকে উদ্ধার করা, তাই আমি কর্ব্বো।"

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবকেও সে রাখিতে সক্ষম হইল না। সেই চন্দ্রতারাহীন নৈশ অন্ধকারে হিমবসনাবৃতা বিধবা নিশীথিনী যেন তাঁর শীতল

অঙ্গুলী তুলিয়া অলঙ্ঘ্য আদেশের শব্দহীন গভীর ভাষায় উচ্চারণ করিলেন,— "ব্রহ্মঘ্না মুচ্যতে পাপা মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।"—মহাশূন্যে সেই শাস্ত্র-শাসন গভীর ধ্বনিতে শব্দায়মান হইয়া উঠিল। দশ দিকে সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাণী ধ্বনিত হইল। শব্দহীনা যামিনীর তৃতীয় প্রহরে স্তব্ধতার প্রতি কেন্দ্রে সেই ভীষণ বাণী যেন কোন অশরীরী মহাপ্রাণীর অখণ্ডনীয় অভিশম্পাতের মতই জাগ্রত রহিয়া একমাত্র শ্রোতার প্রতি শিরা-উপশিরার মধ্যে মধ্যে তুষার শীতলতা সঞ্চালিত করিয়া দিল। দারুন ক্লান্তিতে সে গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কয় মুহূর্ত্তের জন্য তার সর্ব্ববিধ মানসম্বন্ধের অবসান হহল।

সে যখন জাগিল, শীতে সর্ব্ব শরীর জমিয়া গিয়াছে কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে দেহ মন যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সভয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তারপর ভাবিতে না পারিয়া অবসন্নভাবে আবার বেঞ্চের পিঠে মস্তক রক্ষা করিল। খোলা জায়গায় ভোরের হাওয়া ছুরির মত হাড়ের মধ্যে বিঁধিতেছে। প্লাটফরমের একটি মাত্র দেওয়াললাম্প অতি ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল। চারিদিকে তখনও অন্ধকারের রাজত্ব। নিস্তব্ধতার মধ্যে গাছের পাতা হইতে বৃষ্টির মত কুয়াশা-দীর্ণ শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়ার টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ যেন কোন শোকার্ত্তা নারীর অশ্রুপাতের মতই নব জাগ্রত বাতাসের সঙ্গে শ্রুত হইতেছিল। ষ্টেশনের অফিস-ঘরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে আলো জ্বলিতেছে, বন্ধ শাসির মধ্য দিয়া সে আলো কাঁকর-ফেলা পথের উপর পড়িয়াছে। সেখানটাকে যেন দুঃখীর দীর্ণ পঞ্জরের মতই দেখাইতেছে। দুই একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। একটা কুলী জোরে জোরে ঘড়িতে ঘা দিয়া পাঁচটা বাজাইয়া দিল। কোথা হইতে একটা কলের আহ্বান বাঁশী ঊর্দ্ধ স্বরে বিশ্রাম শয়ান কর্ম্মীদলের জাগরণ-গীতি গাহিয়া উঠিল। শচীকান্ত চোখ রগড়াইয়া একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—সে এখানে কেন ?

একটা লোক অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে কৌতূহল দমন করিতে পারিল না; কাছে আসিয়া ডাকিল, "বাবু!"

শচীকান্ত চমকিয়া উঠিল, এ পৃথিবীতে যে সে ভিন্ন আর কোন মানুষ বাস করিতেছে গতকল্য হইতে সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। লোকটি বলিল—

"আপনি সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন,—কোথায় যাবেন ?" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ কহিল,—"এখনই একটা গাড়ী আসবে, যান ত তৈরী হয়ে নিন্।"

শচীকান্ত এতক্ষনে কথা কহিল। প্রথমটা নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই যেন বিস্ময় বোধ করিল,—এ যেন আর কাহারও অপরিচিত স্বর—"কোন দিকের গাড়ি ?"

"রাণাঘাটের।"

পদতল হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল— "তাতে আমার কি ?"

"আপনি কোন দিকে যাবেন ?"

"আমি ?—কোন দিকে যাব ?"

কুলীটা অবাক্ হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মনে মনে ভাবিল, "এঃ—বাউরা !"

ঘণ্টা বাজিল। টিকিট ঘরের সম্মুখে কয়েকটা লোক টিকিট কিনিতেছে। শচীকান্ত কলের পুতুলের মত সেইখানে গিয়া হাত পাতিল, পরে মণিব্যাগ খুলিয়া কোন্ সময় টাকাও বাহির করিয়া দিল, কিছুই খেয়াল রহিল না। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিট-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথাকার টিকেট ?"

শচীকান্তর শোণিত আবার থমকিয়া থামিতে চাহিল। কিছুক্ষণ নিঃসাড়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—"চাকদা।"

"কোথা বল্লেন ? চাঁদপাড়া ?"

"হাঁ, না,—চাঁদপাড়া নয়।"

"তবে ?"

"চাকদা"

"ওঃ, চাকদা ! এই নে ন্।"

তেমনি কলের পুতুলের মতই পূর্ব্বস্থানে সে ফিরিয়া আসিল। একবার মনে করিল, টিকিটখানা ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পারিল না, সেখানা যেন মন্ত্রবলে হাতের মুষ্টিকে আঁটিয়া ধরিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কোয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া উষালোক নামিতে আরম্ভ করিল, ঝর ঝর করিয়া কোয়াশাকাটা জল ঝরিয়া পথ ঘাট গাছের

তলা ভিজাইয়া দিল। অকস্মাৎ শিহরিয়া শচীকান্ত দেখিল দুইটা জ্বলন্ত রক্ত নেত্র বিস্তৃত করিয়া এক বিকটাকার দানব তারই মুখোমুখী ছুটিয়া আসিতেছে। আতঙ্কে সে পিছু হটিয়া দেওয়ালে পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। দেখিতে দেখিতে সেই দৈত্যটা সহসা একখানা ট্রেনের রূপ ধরিয়া নম্র মূর্ত্তিতে ধীর পদে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেই আসুরী মূর্ত্তির চাইতেও এ মূর্ত্তি আরও ভয়াবহ।

একচল্লিশ

সোণার রংয়ের পাকা ধানের ক্ষেতগুলি ঝলমল করিতেছে। তাদেরই একধার দিয়া শীতের একটি শীর্ণ নদী বহিয়া গিয়াছে। আকাশের অঙ্গে বিবিধ আকারের মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রখব রৌদ্র কিছু পূর্ব্বে তাদের অঙ্গে শোণিত ফুটাইয়া তুলিযাছিল, এখন সে রৌদ্রতাপ নাই, কিন্তু সূর্য্যদেব এখনও জল-তলে লোহিত রোগে হৃদয় ধাবা ঢালিযা রাখিয়াছেন—'জবাকুসুম সঙ্কাশ' যেন জবার মালা দিয়া জলশাযী অনন্তের পূজা সমাধা কবিতেছেন। ইতঃমধ্যে কোথাও ধান কাটা আবম্ভ হইয়াছে, রাশি বাশি খড়েব আঁটি বাঁধিয়া স্তূপাকারে একপ্রান্তে রক্ষিত রহিয়াছে, গরুব গাড়িতে কৃষকপরিবার শস্য বোঝাই দিতে ব্যস্ত হইয়াছে, হিম-সঙ্কুচিত বন বিহঙ্গ পক্ষ বিস্তৃত করিযা দূব পরপার হইতে নীড়-লক্ষ্যে ফিরিতেছে, ক্বচিৎ দু একটা পাখী স্থিব বাতাসে পক্ষ ছাড়িয়া ইচ্ছা-সুখে কোন্ দিগন্তের শেষে ভাসিযা চলিয়াছে।

মণীশ এই শান্ত সন্ধ্যায় মাঠের আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া গ্রাম ছাড়াইযা বট অশ্বত্থের ছায়া-নিবিড় তরুতলে ঘাটের কাছ অবধি আসিযা পড়িল। গ্রাম্য নারীগণ তখন যে যার কলস ভরিয়া ঘবে ফিরিয়াছেন। কৃষাণ তখন শ্রমশেষে কাস্তে হাতে রামপ্রসাদী একতালায় "মন রে কৃষি কাজ জান না"—গাহিয়া ঘবে চলিয়াছে। আকাশের কোলছাড়া পাখীবা বিস্তৃতশাখ মহাবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে করিতে দিবসেব শেষ আলাপ সাঙ্গ করিতেছিল। ভ্রমণ-ক্লান্ত মণীশ একটা গাছের গুঁড়িব উপর বসিয়া পড়িল। এবার এখানে আসিযা আবাব সে তাব কর্ম্মভাব গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীপতিবাবু দরিদ্র সন্তানগণের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিযা এত দিন যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, সেখানে সে বৃথা ক্ষমতা ব্যয় করিতে যায় নাই। পায়রাভাঙ্গায় একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপনার্থ প্রতিদিন সেইখানে সে যাতায়াত করিতেছে। ইহা ব্যতীত অপরাহ্নে কর্ম্ম-পরায়ণ চাষাদের মধ্যে তার উদয় যেন জ্যোতিষ্মান্ গ্রহের মতই পরিকল্পিত হইত। মূর্খ শ্রমজীবী সাগ্রহে দাদাঠাকুরের অমৃত বাণী, বিদেশী শ্রমজীবীগণের বিস্ময়কর ত্যাগশীলতা

স্বদেশে-প্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও ধর্ম্মপ্রাণতার কথা গল্পচ্ছলে শ্রবণ করিত। গৌরবে তখন তাদের জ্যোতিঃহীন নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, বক্ষতলে প্রসুপ্ত মানবাত্মা জাগিযা উঠিযা তাদেব বাহ্যিক ব্যবধান দূর কবিয়া দিত। কেহ দন্তে দন্ত চাপিযা কেহ সহাস্যে কহিযা উঠিত,—"আমরাও তাহলে ভদ্দলোকেব মতন ভাল ভাল কাজ কবতে পাবি—হ্যাঁ, দাদাঠাকুব?"

দাদাঠাকুবও উৎফুল্ল নেত্রে স্নিগ্ধস্বরে উত্তব দিতেন—"স্বভাবেই ভদ্দব অভদ্দব হয বে, নৈলে সব মানুষ তো একই। কেন পাববে না, তোমরা?"

আজও মণীশ সেই প্রাত্যাহিক কার্য্য-ব্যপদেশে এখানে আসিযাছিল; কর্ম্মশেষে বিশ্রাম গ্রহণ করিযাছে।

দেখিতে দেখিতে বিশ্বজগতের দ্বাব বাত্রিব অন্ধকাবে রুদ্ধ হইযা আসিল। সন্ধ্যাতেই বক্র বেখায চাঁদ উঠিযা আলোব বাতাযন মুক্ত কবিয়া দিল, সংশয়িত জগৎ প্রসন্ন চিত্তে হাসিযা উঠিল। মণীশ গৃহে প্রতিগমনার্থ উঠিযা দাঁড়াইল। তাব মনে হইল এই সুন্দর সানন্দ বিশাল জগতেব মধ্যে সে তাব সকল দীনতা এক অবিচ্ছেদেব মধ্যে সমর্পণ কবিতে পাবিতেছে না। কিন্তু হায অমৃতেব পুত্র! সে যে মানুষ, কেমন করিয়া মনুষ্যত্ব ভুলিয়া দেবতা হইবে? মন দেব-প্রসাদ ভোগ করিতেই চাহে দেবতা হইতে চাহে না তো!

ঘবে সন্ধ্যা দীপ জ্বলিতেছে সত্য দ্বাবে দাঁড়াইয়াছিল,—"কে এসেছেন বলতো?"

মণীশেব বক্ষে তীক্ষ্ণ সংশয সজোবে আঘাত কবিযা উঠিল। সলজ্জ সন্দেহে মৃদু স্ববে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বে, সতু?" উত্তব শুনিবার জন্য নিজেবও অজ্ঞাতে সে উৎকর্ণ হইযা বহিল।

"শচী দাদা।"

"শচী!"

"হ্যাঁ,—এই যে—বলিতে বলিতে শচীকান্ত বাহির হইযা আসিল। তাহাকে দেখিয়া মণীশ সাহ্লাদে তার হাত ধরিয়া। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি বে হঠাৎ এ সময়? ভাল আছ?"

"ভাল!—হ্যাঁ,—আছি। তোমায় একবাব দেখতে এলুম। তুমি ভাল তো?"

"হ্যাঁ, আমায় দেখতে এসেছ ত?"

"হ্যাঁ ভাই, তোমাকেই। তুমি বেশ ভাল আছ ত?" মণীশ বন্ধুর এই পুনঃপুনঃ সাগ্রহ কুশল প্রশ্নে বিগলিত হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, তার সহিত শেষটা সে যে একটু বেখাপ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, এ প্রায়শ্চিত্ত তারই! স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল—"আমি খুব ভালই আছি শচী! বসবে এসো, কতক্ষণ এসেছ?"

"এই একটুক্ষণ। শুনলুম, তুমি পায়রাডাঙ্গা গেছ—বিকালে শুনলুম, তুমি এসেই আবার কোথা বেরিয়েছ। কোথায় গেছলে? সত্য বল্লে, মাঠে। কেন? একা সন্ধ্যাবেলা মাঠে কি করছিলে? মন কি ভাল নেই?

ইতঃমধ্যে বন্ধুদ্বয় গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সত্য তাহাদিগকে বিশ্রব্ধালাপের অবসর দিয়া সরিয়া গিয়াছে। মণীশ উদ্ভাসিত আলোকে বন্ধুর মুখের দিকে প্রীতি কোমল নেত্রে চাহিয়া বিস্ময় বোধ করিল। বিবর্ণ মুখে দুই চোখ তীব্র আলো বিকীরণ করিয়া জ্বলিতেছে। বেশভূষা বিশৃঙ্খল, মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা চিহ্ন প্রকটিত। মুখ চোখের ভাবে খুনী আসামীর ভয়াবহ প্রতিকৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। সে বিমূঢ় ভাবে ডাকিল, "শচী—"

শচীকান্ত মণীশের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল। অসহ্য! কি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহে সে তার দিকে চাহিয়া আছে! সে যদি জানিত,—সে যদি বুঝিত, তার বিরুদ্ধে কি ভয়ঙ্কর ঈর্ষা, কি ঘৃণা, কি দারুণ বিদ্বেষ সে মনের মধ্যে পোষণ করিতেছে তার ভিতরটাকে দেখিতে পারিলে এতক্ষণ সে হয় ত তার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া যাইত! এখনও তার সেই আভ্যন্তরিক ঝটিকা নিবৃত্ত হয় নাই। সেই অগ্ন্যুৎপাতের গৈরিক নিঃস্রাব এখনও তার সারা প্রাণ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে।

স্বেচ্ছায় সে এখানে আসে নাই, কে যেন জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। দুইবার খবর লইয়া যখন মণীশের অনুপস্থিতি-সংবাদ পাইল, তখন খুব বড় একটা যুক্তি চিত্তে তার আশার বাণী বহন করিয়া আনে। তবে সে আর কি করিবে? অগত্যা মণীশের সহিত বিনা সাক্ষাতেই ফিরিয়া যাইতে হয়, সে ত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই! কিন্তু সেই দিনই

ফিরিবার কথায় দাদা এমনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং নিজের মনে সে এমন একটা গুরু অপরাধের ভার অনুভব করিল যে যুক্তিটা সম্পূর্ণ অকাট্য হইলেও ব্যর্থ হইয়া পড়িল ।

সন্ধ্যায় আবার সে যখন মণীশের প্রতীক্ষায় তার বসিবার ঘরের টেবিলটার সম্মুখে সেই চিরপরিচিত স্থানটি গ্রহণ করিল, তখন একবার তার চিত্তের রুদ্ধ উত্তাপ হিম হইয়া আসিতে লাগিল। নিজের অপরাধ উপলব্ধি করিয়া সে কেমন যেন একটা আকুল চঞ্চলতা অনুভব করিল। তাদের আবাল্য প্রীতি প্রবাহিনীর মন্দীভূত বেগশীলতা সহসা যেন পূর্ব্বগতি ফিরিয়া পাইল, মনে হইল, সেই কলেজের ছাত্র শচীকান্ত তার অকৃত্রিম বন্ধু মণীশের কাছে যেমন আসিত তেমনি আসিয়াছে, আর কিছু না।

অনেকক্ষণ অবধি মণীশ বাড়ী ফিরিল না। জানালার মধ্য দিয়া শচী পুনঃপুনঃ বাহিরের দিকে চাহিল। গাঢ় মসীবর্ণ আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের জ্যোতি অতি মাত্রায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তাহারই একপার্শ্বে ক্ষয়প্রাপ্ত চক্রার্দ্ধবৎ চন্দ্র রত্নভূষণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। গাছের পাতায় পাতায় চন্দ্রকর লেখা মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। কে একজন দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। শচীকান্ত উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া চাহিল। মণীশ সম্মুখীন হইলেই সে উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবে, প্রাণ খুলিয়া বলিবে, আমি বন্ধু, তোমার প্রকৃত বন্ধু হতেই এসেছি। কিন্তু তার সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ করিয়া আসিল, সত্য! শুভ মুহূর্ত্তকে আবারও বিফল হইতে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা দুর্ব্বলতা সে অনুভব করিল। সাময়িক উত্তেজনার মত্ততাও ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছিল।

শেষে মণীশ আসিল। তার পদধ্বনি কণ্ঠস্বর হাতের স্পর্শ শচীকান্তর সর্ব্বশরীরে সহস্র তাড়িৎ ছুটাইয়া দিল। গূঢ় আনন্দের আভায় সারা মুখ উজ্জ্বল করিয়া আবেগে কম্পিত স্বরে সে যখন তাহাকে সম্বোধন করিতে ছিল, তখনই তার সমস্ত শরীরের স্নায়ু-জাল দারুণ অস্বস্তিতে পীড়িত হইয়া উঠিল।

মণীশ বলিল—"তুমি আমার শরীরের কথা ভাবচো, নিজের চেহারাটা যদি আয়না ধরে দেখ, এমন হয়েচে কেন ? মনে হচ্ছে, যেন কতদিন নাওনি খাওনি, ঘুমোওনি।" বাস্তবিক মানসিক সংগ্রাম ও অনিয়মে শচীকান্তকে চেনা

দুষ্কর। সে বিজড়িত কণ্ঠে কহিল—"একটু অনিয়ম গেছে কি না। কদিন কলকাতায় ওরা যা হুল্লোড় করালে।"

"কলকাতা গেছলে ?"

"হাঁ। সেখানেই ত জানলুম, তুমি বাড়ী এসেছ। হঠাৎ বাড়ী চলে এলে যে ? কোন কারণ আছে না কি ?"

মণীশ বন্ধুর আকস্মিক আগমনের কারণ এতক্ষণে বুঝিয়াছে—ভাবিল, কলিকাতায় মণীশের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে তার কাছে না আসিয়া পারে নাই। সে মহানগরীর অকারণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিল—"হঠাৎ কই ভাই! ছুটির সময় সত্য এলো, আমিও এলাম, আমার নৈশ পাঠশালা চলচে—কিছু শুন্‌লে ?"

শচীকান্ত আবার যেন একটা স্বস্তি বোধ করিল। "হাঁ শুন্‌লুম বই কি, বেশ চলচে। বড় দিনের সময় দুদিন শুধু বন্ধ ছিল। সে দুদিন ওরা ইন্দু-ভূষণকে শুদ্ধ থিয়াটারে ধরে নিযে গিযে ছিল।"

মণীশ হাসিতে লাগিল—"ওদেব সঙ্গে আমি ছাড়া আর কেউ পারে না। তুমি এখন থাকবে ত ? বেশ বই লিখেছ !"

শচীকান্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরের দিকে চাহিযা অপরাধীর ভাবে উত্তর করিল—"আমি কাল সকালেই যাবো—পাঁচটার ট্রেনে, তোমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না—"

মণীশ সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ইস, তাই যেতে দিলুম বলে! এত তাড়া কেন শুনি ?"

শচীকান্তর ফ্যাকাসে মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মাথা নীচু কবিযা ছাড়া ছাড়া ভাবে বলিল—"বড্ড জরুবী কাজ রয়েছে, না গেলে মাসিমা রাগ করতে পারেন।"

মণীশ তাহার হস্ত শিথিল করিয়া কহিয়া উঠিল—"তাহলে ত কথাই চলে না।"

শচীকান্ত একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ছাড়া পাইবার মুহূর্ত্তে হঠাৎ মনে হইল, মণীশ জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল হইত।

কিন্তু এখনও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বাকী আছে,—কিন্তু কিসের পরীক্ষা ? মণীশের মুখে সেই হাসি, কণ্ঠে সেই অক্ষুণ্ণ প্রসন্নতা, দৃষ্টিতে সেই

উদার মহত্ত্ব সুব্যক্ত। আহত হৃদয়ের ক্ষত চিহ্ন কোনখানেই শোণিতক্ষরণ করে নাই! বৃথা ভয়, মিথ্যা এ ভাবনা,—সে এ জগতের অনেক ঊর্দ্ধে। মানব চিত্তের ক্ষুদ্র সুখ, কল্পনা, আশা, দ্বন্দ্বের যুদ্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সে প্রেমিক নহে—প্রেম!

শ্রদ্ধাসংযত হৃদয়ে সে মণীশের হাস্যোজ্জ্বল মুখ চাহিয়া দেখিল। মণীশ উঠিয়া হাসিমুখে সেল্‌ফের উপর হইতে একখানা অতি পরিপাটী বাঁধাই করা পুস্তিকা লইয়া আসিল। সোনার জলের লতাযুক্ত সুন্দর ছাঁদের টানা অক্ষরে বড় বড় করিয়া ইহার উপরে লেখা—"ক্ষণিকের দেখা"—এবং মলাটের নীচের পাতায় কালীর অক্ষরে লেখা,—'চিরস্নেহাস্পদ বন্ধু মণীশকে উপহার, —অকৃত্রিম বন্ধু শচীকান্ত।" মণীশ পাতা উল্টাইয়া শচীর চক্ষের সম্মুখে ধরিল—"লেখাটা চিন্‌তে পার?"

শচীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। কহিল—"মনে ত হচ্ছে না, তোমায় এ রকম বই পাঠিয়েছি। কিন্তু এ লেখা ত আমারই।"

"কি করে হ'ল বল ত?" বলিয়া মণীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "জাল করেছি। কাজটা কিন্তু খুব শক্ত। তোমার চিঠিগুলি দেখে এক একটি অক্ষর কত ধবে ধরে লিখেছি। কিন্তু ঠিক্ তোমার লেখার সঙ্গে মিলে যায়নি শচী? আমার মনে হ'ল এ তুমিই আমায় পাঠিয়েছ!"

"মণীশ!" আহত-তন্ত্রী বীণায় আকস্মিক ক্রন্দন-মূর্চ্ছনার ন্যায় অকস্মাৎ শচীকান্ত ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল,—"মণীশ তুমি আমায় এত ভালবাস?"

মণীশ তার অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্যও করিল না, সম্পূর্ণ আত্মানন্দে বিভোর থাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বারে! তা বাসবো না? আমরা কি আজকের? দুদিনের নাকি?"

ঠাণ্ডা বাতাসে জলসেক-আর্দ্র মাটির গন্ধের সহিত মণীশের স্বহস্ত-রোপিত 'হাসনাহানার' সুবাস বহন করিয়া গৃহ অতিথিকে অর্ঘ্য-রূপে আনিয়া দিল। ক্ষণস্থায়ী চন্দ্রাংশটুকু মসীবর্ণ আকাশের বিশাল উদর-গহ্বরে ডুবিল।

মণীশ কথা শেষ না করিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ভালকথা, আমি খুড়ি-মাকে বলে আসি। আজ তোমায় এখানে খেয়ে যেতে হবে, পুকুরের বেশ

একটা বড় মাছ ধরা হয়েছে।" মণীশ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বন্ধুকে কাছে পাইয়া তার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ফিরিয়া সে তাহাকে দেখিতে পাইল না, ভাবিল, বাহিরে গিয়াছে। কিন্তু না—বাহিরেও ত নাই! অদূরে কামিনী গাছের শাখা পত্র বায়ুভরে স্বন্স্বনিয়া উঠিল। সে ভাবিল, হয়তো সে তাহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য উহারই মধ্যে লুকাইয়া আছে। নিকটে গিয়া ডাকিল,—"হয়েচে হে, হয়েচে—অন্ধকারে এখানে কেন?" কই? কাহার প্রতি এ আহ্বান! কেহ ত নাই। বিস্ময় বিমূঢ় মণীশ তখনও সেই নৈশ অন্ধকারের তলে প্রতীক্ষাপূর্ণ চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। পত্র-মর্ম্মরে, বাতাসের শব্দে সচকিত উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বুঝি কোন গোপন স্থল হইতে বন্ধু তার বাহির হইয়া আসিয়াই কৌতুক হাস্যে চমকিত করিয়া তুলিবে!

আততায়ী যেমন অন্ধকারে নিজের শিকারের বুকে ছুরি মারিয়া আতঙ্ক-স্পন্দিত পদে ফিরিয়া আসে, তেমনি করিয়া শচীকান্ত নির্জন পথ অতি-বাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পল্লীগ্রামে ঘরের দ্বার সন্ধ্যাতেই প্রায় রুদ্ধ। নেপথ্য হইতে কচি ছেলের কান্নার ছেলে ভুলানি ছড়া শুনা যাইতেছিল, কোথাও নামতা পাঠের কলরব, কোনখান হইতে কোন্দলের শব্দ বর্ষণও চলিতেছিল।

দুইখানা চলন্ত ট্রেণে যেমন ক্বচিৎ সংঘর্ষ হইয়া যায়, তেমনই অনেক সময় রাস্তায় চলিতে চলিতে মানুষে মানুষেও সংঘর্ষ হয়, উভয় স্থলেই পরিচালকরাই এজন্য দায়ী। উদ্‌ভ্রান্ত মনে মর্ত্ত্যলোকের কথা স্মরণ থাকে না। পরস্পর বিপরীতমুখী গাড়ির আত্মবিস্মৃত পরিচালক যদি এক পথে বাহির হয়, তাহা হইলে বিপদ ঘটে। শচীকান্ত এইরূপ অন্যমনা অপর পথিকের উপর আপতিত হইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"কে রে! কাণা না কি!"

অপর ব্যক্তিও এই গালি ফিরাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তা করিল না, পতন বেগ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সস্মিতভাবে উত্তর করিল—"কাণা হ'বার সময় হয়ে এলো বটে। কিন্তু বাপু, তুমি ত বৃদ্ধ নও মনে হচ্চে,—বেশী লাগেনি ত?"

"শিবুকাকা?"

"শচীকান্ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—মাপ কর্ব্বেন কাকা, এত অন্ধকারে কেন বেরিয়েছেন ?"

শিবনারায়ণ কহিলেন—"না হে, মনটা বড় উৎকণ্ঠিত রয়েছে কি না! ভাল ত ?"

"ভালই, মন ভাল নেই, কেন ব'ল্‌লেন ?"

"নানান্ ঝঞ্ঝাট সংসারে! আর বলো কেন? ইচ্ছা করে—ছেলেদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে তোমার বাবার চরণতলে আশ্রয় নিই। আমাদের ওখানে গিয়েছিলে? মণীশের সঙ্গে দেখা হ'ল? কেমন দেখ্‌লে তাকে?" শচীকান্ত মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"ভালই ত দেখ্‌লুম। এ কথা ব'ল্‌চেন কেন ?"

শিবনারায়ণ উত্তর ক'রলেন না, তিনি যেন কি ভাবিতেছিলেন। শচী একটু প্রতীক্ষা করিয়া ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—"কিছু ব'ল্‌বেন কি ?"

"তোমায়? কই নাতো, কেন বল দেখি ?"

"এমনি মনে হ'ল। প্রণাম। বড্ড শীত,—আসি তা হ'লে।"

শচীকান্ত প্রায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ বিস্মিতদৃষ্টিতে তরল অন্ধকারে ত্বরিতে অদৃশ্য সেই নিশাচরবৎ অকস্মাৎদৃষ্ট চলমান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া আত্মগতভাবে কহিলেন,—"মদ ধরেচে না কি?—দেবতার সন্তান কি শেষে ভূত হ'ল!"

বিয়াল্লিশ

লাটিমটা যতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার উভয় দিকের লাল কালো রং দুইটাও তার ঘূর্ণন-বেগের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে একাকার হইয়া যায়। শচীকান্তর চিত্ত-বৃত্তির মধ্যেও সেইরূপ লাল কালো অংশ দুইটার সম আবর্ত্তন চলিতেছিল। মধ্য রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া সে কাগজ কলম লইয়া মণীশকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। আর একখানা সংক্ষিপ্ত পত্রে একই ধরণের কথা লিখিয়া লেফাফার উপর শিরোনামা দিল,—"পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু।"

ইহার পর সে একটু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যূষে ভক্তিনাথ প্রাতঃস্নানার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন; দেখিলেন, সে বাহির হইয়া যাইতেছে; ডাকিলেন—"শচি, যাচ্চো কোথা ?"

"আপনি উঠেচেন! তাহ'লে দিদিকে ব'ল্‌বেন—আমি চল্লুম।" ফিরিয়া আসিয়া দাদাকে সে প্রণাম করিল। ভক্তিনাথ কহিলেন—"সে কি! এখন কোথা যাবে? দুদিন থাকো,—বেলা হোক, থাওয়াদাওয়া কর। নেহাৎ যেতে হয়, না হয় তখন যেও,—এমন ক'রে কি যায়!"

অপরাধের কালিমা শচীকান্তর ললাট অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—"কুটুম ত নই, সকাল সকাল যাওযাই ভাল!"

ভক্তিনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কুটুমের যে বাড়া হয়েচ শচি! একখানা চিঠি লিখেও ত খোঁজ নাও না। আসার পাট ত উঠিয়েই দিয়েচ,—এলে যদি তাও একটা দিনও পুরো নয়।"

শচীকান্তর মন বড় অস্থির। সে ভ্রাতার আমন্ত্রণে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল; বিরক্তি দমন করিয়া উত্তর করিল—"এসে কেবল মন খারাপ করা! আপনি তো আসতে বলেন,—কিন্তু বাড়ীর গিন্নি ত দেখি ঠুক ঠাক কথাই শোনান!"

"সে দোষ কি আমার ভাই? একজন পরের মেয়ে যদি আমাদের না মানে, তার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তুমি আমায় দিয়ে কেন করাবে? আমি ত কোন অপরাধ করিনি!"

দাদার বেদনার স্বরে শচী নিজেও ব্যথিত হইল; এবং নিজের উত্তেজনায় লজ্জাও বোধ করিল, কিন্তু দাদা তার প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া এ সময় অনর্থক খুঁটি-নাটি লইয়া মান অভিমান করিতে বসিলেন, ইহা ভাবিয়া সে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া বিরক্তির হাসি হাসিল; বলিল—"আমিই বা ক'রেচি কি? সুবিধা হ'লেই আস্‌চি, আপনাকে অমান্যও করিনি, আর কি ক'র্‌বো বলুন।"

ভক্তিনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। বলিবার মত সত্যই এমন কিছু ছিল না, কেবল মনের একটুখানি ক্ষোভ মাত্র। যাহাকে জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে জীবনের মধ্যে সযত্ন স্নেহাধিকার দিয়া আসিয়াছেন, সে যদি সেটাকে তুচ্ছ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহাতে মনে স্বভাবতঃই ক্লেশ হয়! ইহা ত আইনের দাবী নয়, এ যে বুকের টান। কিন্তু মনকে প্রশ্রয় না দিয়া কহিলেন—"তবে এখনই আস্‌চো? মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও, কল্যাণী সেখানে আছে, বুঝি? আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি, তাকে ব'লো—"

দাদাকে সুর ফিরাইতে দেখিয়া সেও লজ্জাবোধ করিল। দাদা আজন্মই এইরূপে নিজেকে সংযত করিতে অভ্যস্ত, সেকথাও মনে পড়িল।

কহিল—"শীঘ্র আসবো, এখন একটু কাজ আছে। বাবার চিঠি পেয়েছেন?"

এই প্রথম পিতার সংবাদ লইবার কথা মনে পড়িল! "পেয়েছি, ভাল আছেন। এসো তা হ'লে সুবিধা হ'লেই, দূরে থাক, মন তো প'ড়ে থাকে—গিয়ে একখানা পত্র দিও।"

"দেবো"—বলিয়া মুহূর্ত্ত পরেই শচীকান্ত দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া ভক্তিনাথ একটা মৃদু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শিশু ভ্রাতার সৌম্য মূর্ত্তি, জ্যেষ্ঠের প্রতি অসহায় আত্ম-সমর্পণ মনে পড়িল। মানুষ কত বদলাইয়া যায়! তাঁর মনের স্নেহ-নির্ঝর আজও তেমনি ঝরিতেছে; কিন্তু সে ক্ষীরধারা স্পর্শ করিতে শচীকান্ত আর ইচ্ছুক নহে। নাই হোক, সে ভাল থাক—সুখে থাক।

তেতাল্লিশ

মধ্যাহ্নে মাটীর দাওযায় মাদুর পাতিয়া করালীচবণ সমান দরের একটি বন্ধু লইয়া ব'ড়ে টিপিতে ছিল, এমন সময বেড়াব পাশ হইতে একখানা সুন্দর তরুণ মুখ সেদিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। কলাঝাড়ে কদলীপুষ্প দোদুল্যমান, বেড়ার ধারে পালম শীষগুলা বাতাসে ঈষৎ মাথা দুলাইতেছে, মাচায় কচি লাউশাকের মধ্যে সাদা ফুলের বাহার খুলিয়া লাউএর জালি পড়িয়াছিল। খানকযেক উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া কমলা তার দৃষ্ট সেই ফসল ক্ষেতের মধ্য দিয়া ঘাটেব পানে চলিয়াছে। শচীকান্ত অন্তরালে সবিয়া গেল।

তাদের বাড়ী লক্ষ্মীপূজা হয় দেখিযাছিল, অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজায় তার মা "তিল-সোণার" কথা বলিতেন, অনেকবাব শুনিযাছে, সে কাহিনীতে তিলফুল তোলার প্রায়শ্চিত্ত-হেতু বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীকে দরিদ্র-ব্রাহ্মণ গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হইয়াছিল, সেই গল্পটা আজ সার্থকভাবে তাব মনে জাগিয়া উঠিল। কার অভিশাপে লক্ষ্মীস্বরূপা কমলাকে এই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে? তবুও লোকে বলে ঈশ্বর আছে!

পানা খচিত পুষ্করিণীর সোপান হীন মেটে ঘাটে নামিয়া সে বাসন নামাইল। হাত ধুইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর—কোথায় গেল সে? শচীকান্ত তার উৎসুক দৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না, জলে অবগাহন করিয়া থাকিবে ভাবিয়া সেখান হইতে অপসৃত হইল। মধুর স্বপ্ন-উপভোগান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনে যেমন একটা বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়, তেমনই একটা প্রসন্নতার আনন্দ লইয়া সে করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে অগ্রসর হইল। সমস্ত মানসিক সংগ্রাম সেই মুহূর্ত্তে যেন যাদু মন্ত্রে স্মৃতি হইতে মুছিয়া গেল। রাত্রে যে পত্র দুইখানা লিখিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছে, সে দুখানা আর যে কখনও ডাক-বাক্সে পড়িবে, এমন ভরসা তাদের রহিল না। করালীচরণ ব'ড়ের চাল ভুলিয়া সাহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"আসুন, আসুন!—কা'ল থেকে কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। ওহে নৃসিংহ! এখন তা হ'লে তুমি এসো গিয়ে—খেলাটা এখন ত আর হলো না—রাত্তিরে তখন শোধ দেওয়া

দেওয়া যাবে। তার পর শচীকান্তবাবু, কি মনে করে ?” আবার সেই মনের উপর আক্রমণ! শচীকান্তর আললাট-কণ্ঠ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—“বিশেষ কিছু নয়। দেখা হ’য়েছিল, তাই একবার—”

“বটে বটে! আমার এত সৌভাগ্য! বসুন, বসুন। কম্‌লি কোথা গেল ?—দুটো পান এনে দিক্‌ না—”

সঙ্কুচিত শ্রোতা অকস্মাৎ এমন ভাবে চমকিয়া উঠিল, যেন সে গুপ্ত ঘাতকের ছুরির আঘাত পাইয়াছে। আকস্মিক ক্রোধের উচ্ছ্বাসে তার মুখখানা অরুণাচলের মতই রক্তিম হইয়া উঠিল। সে দুই পা পিছাইয়া তীব্র স্বরে কহিয়া উঠিল—“ছিঃ—”

কৰালীচরণ এ আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। বিস্ময়ে সে তার চক্ষু টানিয়া ডাগর করিল, কহিল—“রাগ ক’র্‌লেন কেন ? কিছু অন্যায় ব’লেচি ? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা ও সব ধর্ত্তব্য ক’রবেন না,—আপনারা হয়ংম্যান, ইংরিজি শেখা জেন্টিল—আমরা সেকেলে গাঁইয়া—তা’ যখন দয়া ক’রে পা’র ধুলো দেছেনই তখন এ গরীবের একটি উপকার করুন না, আমি ছা-পোষা গরীব মানুষ কোথা থেকে এর উপর বাইরের লোক পুষি বলুনতো ? শিবনারাণবাবু যখন কম্‌লীকে নিতে চানই না, তখন কাঁহাতক আমি আর তাদের পায়ে তেল ঢালি, অ্যাঁ ? একটি যোগ্যি পাত্তর খুঁজে দিন না, মশাই! মেয়ে ত বড় কম হয়নি, বিয়ে হ’লে দু’টি ছেলের মা হতো। দু-হাত এক ক’রে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।”

কোথায় বিরক্তি—কোথায় ক্রোধ, হৃৎপিণ্ড হইতে সবেগে নির্গত শোণিত নিজ স্থলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আছাড়ি পিছাড়ি করিতে লাগিল, ক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—“সেটা কি উচিত হবে!”

“কেন নয়, মশাই ? বিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে, মাথায় কত বড় ভারটা ? আপনিই বলুন হ্যাঁ কি না ? চিঠির উত্তরটা দেওয়া দরকার বোধ ক’র্‌লেন না, অ্যাঁ! সে দিন ত পষ্টই ব’লে দিয়েচেন—”

অতি কষ্টে শচীকান্ত রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে উচ্চারণ করিল—“কি ?”

“কেন ? ব’লেচেন, তোমার ভাগ্নীকে তুমি নে’যাও, আমরা ওকে চাই নে’।”

শচী ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল ; অস্ফুট স্বরে কহিল—"রাগ ক'রবেই ত ব'লেছেন, সেটা—?"

"রাগ! কিসের রাগ? টাকা খসাতে হ'লে অনেক মশায়েরই রাগ হয়—তা জানি, কিন্তু কেন নে'ব না পনের টাকা? দুশো বার নে'বো। তোমরা কুলীনরা চোখের চামড়া খসিয়ে বেটার বিয়েয় এককাঁড়ি টাকা নিতে পারো—গরীবের ঘর বাড়ী বেচে নাও—মুনিবের ক্যাস ভাঙ্গিয়ে বাপকে জেল খাটাও—তা'তে কিছু এসে যায় না? দোষ হ'লো গরীব আমাদের বেলায়? নিজেরা পথ দেখাতে, তবেই না বুঝ্‌তুম যে, হ্যাঁ।—আমি যেখানে তিন হাজার টাকা পাবো সেইখানেই মেয়ে দেবো। কেন দেব না? তোমরা বড় মানুষের ছান্‌লাতলা থেকে টাকার জন্যে বর ফিরোও নি? হাঁড়ির খবর জানা নেই?"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল, শচীকান্তের চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনরায় নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল, মনে একটা অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার হইতে লাগিল। কিন্তু কাহার প্রতি সে ক্রোধ, তার ঠিকানা ছিল না, সে ঈষৎ ঝাঁঝিয়া বলিল —"কি ক'র্‌তে চাও?"

করালী তার মুর্খচক্ষুর শোচনীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, মনে মনে হাসিল, প্রকাশ্যে একান্ত বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল—"যে ও মেয়ের দর বোঝে তেমন লোকের হাতে ওকে দিতে চাই। বংশজের ঘরে কেউ পায়ে ধ'রে মেয়ে দেয় নি, আমিও দেবো না। তার অমন পরীর মতন মেয়ে আমার লাখে একটা মেলে না।"

"তা হ'লে—তা হ'লে এই-ই স্থির?"

"আলবৎ।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি আবার? মেয়ের অভিভাবক আমি, আমার যাকে খুসী মেয়ে দেবো, কিন্তু কিসের? কার ভয়ে?"

শচীকান্তর বুকের মধ্যে তুমুল তরঙ্গ চলিতেছিল। মন-তরী টলমল করিতেছিল, বুঝি এবার অতলে ভাসিয়া যায়! সে কি একটা বলিতে গেল।

বক্তব্যটা কণ্ঠের মধ্যেই অস্ফুট রহিল। মন বলিল, তুমি আর কি করিবে? তুমি কেন মিথ্যা বঞ্চিত হও! তোমার দোষ কি?"

করালীচরণ চকমকির নিকট সজ্জিত উপকরণ লইয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে একটা ডিবায় দুখিলি পান লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুদ্ধ শচীকান্তর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দোক্তা টোক্তা চলে?" সে নীরবে ঘাড় নাড়িল। ডিবাটা তার হাতে রহিল। "তামাকও তো চলে না?—বেশ, বেশ,—কতদূর পড়া-শোনা হয়েচে? কটা পাশ?"—করালী তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে অপ্রকৃতিস্থমতি অতিথিকে কন্যাকর্ত্তার সুরে পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

শচীকান্তর এসব ভাল লাগিতেছিল না, সে নিজের ভাবনাতেই অস্থির, বাহ্যিক ভদ্রতার খাতিরে কোনমতে জবাব দিল—"এম্ এ।"

"অ্যাঁ! চারটে পাশ! কমলার তপিস্যে ভাল!

শচীকান্তর নিশ্চল হৃৎপিণ্ড প্রতিঘাতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। চোখ মুখ লাল করিয়া একটা রক্তের উচ্ছ্বাস মাথার মধ্যে ছুটিয়া গেল, চমকিয়া কহিল—"কি বলচেন!"

করালী শান্তভাবে ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—"এই কথার কথা বলছিলাম! বিবাহ হয়েচে?"

"না"—বলিয়া ডিবাটা নামাইয়া রাখিয়া শচী উঠিবার চেষ্টা করিল। এখান হইতে পলাইয়া এই মায়াবীর হাস্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায়, কিন্তু সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল—

সজল চরণচিহ্নগুলি ধুলায় অঙ্কিত করিয়া আর্দ্র বসনে ভারাবনত দেহে কে ঐ ঘাটের পথ হইতে ফিরিতেছে! প্রভাতের সেই হাস্যময়ী প্রতিমা নয়—সংসারের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিতা সকরুণ-মূর্ত্তি নারী! শচীকান্ত সরিয়া বসিল—নিজেকে স্থির করিয়া লইবার জন্য একটুক্ষণ নীরব রহিল, তারপর ললাটের স্বেদজড়িত কেশগুচ্ছ ধীরে ধীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার সেই দিকে চাহিল। কোন-দিকে না চাহিয়া কমলা ধীরে পদে খিড়কির দিকে চলিয়া গেল, তার বিষণ্ণ আনত নেত্রের আভাস দ্রষ্টার সকল দ্বিধা ঘুচাইয়া দিয়া গেল। সে অভি-

ভাবকের দিকে অসঙ্কোচে চাহিয়া কহিল—"ওখানের সঙ্গে আপনি তাহ'লে মেটাতে চান না?"

"না।"

"তাহ'লে যদি আব কেউ কমলাকে প্রার্থনা কবে—"

"হ্যাঁ তিনটী হাজার টাকা দিযে অবিশ্যি—তা'হলে তাবই সঙ্গে ওর বিযে দিই—"

ঘৃণাপূর্ণ ক্রোধ-কটাক্ষ নিক্ষেপ কবিযা সে কহিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' জানি।—টাকা দিলে—আপত্তি নেই ত?"

"আজ্ঞে না।—তবে টাকাটা আগাম চাই।"

"বেশ!"

করালীচরণ আবারও মনে মনে হাসিল। টাকা খসাতে হলেই বেনারা চটে যান্। মিনি কডিতে মজা মাববেন! ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দ্যাখনি। সজোবে হুঁকায টান দিল।

কিছু পরে অতিথির দিকে ফিবিল—"তা' ববটি কে?" লোকটাব অনাড়ী পানার প্রতি ভীষণ চটিয়া শচাকান্ত নাববে অধব দংশন কবিল, —"আমি।"

চুয়াল্লিস

"বলি,—আজ যে বড় খুসী খুসী! বেলা ত রেখে এসোনি যে দুটো কথা কইব। সত্যি কমল, তোকে শুধু ঐ হাসিখানিতেই সুন্দর দেখিয়েছে, মনে হচ্চে, ঐ হাসির মূলে বিকিয়ে দিই।"

কমলার নূতন বন্ধু সরোজিনী প্রীতিপূর্ণ নেত্রে তার লজ্জারঞ্জিত মুখের প্রতি চাহিয়া এই কথা বলিল। অপরাহ্নে তখন সায়াহ্নের ছায়াপাত হইয়াছে, ম্লান আলোয় সলিলমধ্য-বর্ত্তিনী কমলাকে জলদেবীর মতই দেখাইতেছিল, তার স্থির দৃষ্টি আজ ক্ষণ চঞ্চল। একটা সলজ্জ রক্তিম আভা তড়িদ্‌বেগে শুভ্র ললাটে, গোলাপি গণ্ডে মিলাইয়া যাইতেছে। সে মৃদু হাসিয়া স্মিত দৃষ্টি নত করিল—গামছা দিয়া রন্ধনের কালী রগড়াইয়া তুলিতে তুলিতে কহিল—"কি যে বল।"

"না ভাই, সত্য বলচি, ঠাট্টা ক'র্‌চিনে,...কি যে নাম, তাও ত বল্লিনি, তবে তোর বরই বলি, তিনি যদি এখানে থাকতেন, এখনই পাগল হয়ে রাঙ্গা পায়ে লুটিয়ে পড়্‌তেন! আচ্ছা ভাই, ফাগুন মাস ত যায়—বিয়ের কি হ'লো? তাঁরা কিছু বলেন নি?"

কমলার রঞ্জিত মুখ সুখের স্মৃতিতে উজ্জ্বল দেখাইল। আনত মুখ অধিক নত করিয়া সে উত্তর দিল—হ্যাঁ ভাই—লিখেছেন।"

"কি? কবে?"

"পরশু।"

"পরশু?"

"হ্যাঁ ভাই!" সরোজিনী বিস্ময়ে—আনন্দে চমকিত হইয়া কহিল—"তাই এত আহ্লাদ!—বটে?—তা' বেশ হ'ল ভাই! যত শীগ্‌গির যমপুরী ত্যাগ ক'র্‌তে পারিস্, ততই ভাল। আমার দুদিন ফাঁকা ঠেক্‌বে—ব'য়ে গেল—তুই ত বর্ত্তাবি। কাল তাহ'লে গায়ে হলুদ? কোন সাড়াটিও ত নেই! ঢের ঢের কিপ্‌টে দেখেচি বাবা, এমন হাড়-কেপ্পন আমার চৌদ্দ পুরুষেও দেখেনি! তা যা হোক, কমল তোর বর দেখ্‌তে, ভাই, যাবই

যাবো, গলাধাক্কা দিলেও সেদিন নড়চিনে। ভয় নেই—পাত পেতে ব'স্‌বো না—সেদিন একাদশী—খুব আহ্লাদ হচ্ছে ত? মরি, লজ্জায় গেলিতে! বুড়ী ধাড়ি কঁনের আবার অত কেন লা! আহা, আহ্লাদ হবে না, বোন! কি সুখেই যে এখানে আছ ঠাকুর মুখ তুলে চান—সুখে থাকো। এস কমল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী যাওয়া যাক্। শীতে হিমে অসুখ কর্‌লেই তো চিত্তির! নিজের বিয়ে ত নিজেকেই দিতে হবে, যেমন একটা কালনেমী মামা জুটেচে?"

কলসী ভরিয়া দুই সখী জল ছাড়িয়া তীরে উঠিল। আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া উভয়েই নীরবে গৃহাভিমুখী হইল। দুইজনেই নিজ নিজ চিন্তায় তন্ময় ছিল। সখীর বিবাহের কথায় সরোজিনীর নিজের বিবাহের সমস্ত কথাই মনে পড়িতেছিল। গাত্র-হরিদ্রা, আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন ভোজন, প্রতিবেশী গৃহে সাদর নিমন্ত্রণ, সানাইয়ের বাদ্য, শঙ্খ-রব ও হুলুধ্বনির কোলাহল কতরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অপরিচিত কুণ্ঠিত দৃষ্টির সহিত তার তন্দ্রা-বিজড়িত চক্ষের ক্ষণিক মিলন—সকল কথাই মনে পড়িল। সবই যেন সেদিনের কথা! শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় মায়ের গলা ধরিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল; পাঁচজনে জোর করিয়া পাল্কীর ভিতর পুরিয়া দিল। কঠিন-চিত্ত বেহারা-গুলা তার কান্নাকাটি অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ অচেনা পুরীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। সেই অজানা গৃহে সেদিন তার কতই আদর! শাশুড়ী কোলে লইয়া "ঘরের লক্ষ্মী" বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, চারিদিকেই স্নেহ মমতার ছড়াছড়ি!

তারপর অল্পে অল্পে নারী জীবনের সার সুখ সে যখন চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সব চুকিয়া গেলে অলক্ষ্মী অপয়া বধূ পিত্রালয়ে পুনঃপ্রেরিত হইল। বৎসরাধিক পূর্ব্বে যে পথ দিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া তাহারাই অথবা অন্য কারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। মাঝখান হইতে শুধু সমস্ত জীবনটা সে শ্মশান-বহ্নির বুকে আহুতি দিয়া আসিল। এখন কেবল সে স্মৃতিটুকু লইয়া প্রতীক্ষা।

কমলা গৃহকর্ম্মের অবসানে ভাল করিয়া শাড়ীখানা গুছাইয়া পারিল, সুগোল মণিবন্ধে করভূষণ দুইখানির প্রতি একটা প্রীতি কটাক্ষ নিক্ষেপ

করিয়া নববধূর সরম-শঙ্কিত চরণে সে পূর্ব্বের মত বাহিরে গাছের তলায় গিয়া বসিল। নূতন একটা ভাবের আলো নবোন্মেষিত হৃদয়-মুকুলে পতিত হইয়া আজ সারাদিন তাহাকে পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। শুধু দয়া কৃতজ্ঞতার আদান-প্রদান মাত্র নয় সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যা আজ তাহাদিগকে এক অবিচ্ছিন্ন মিলনে মিলাইয়া দিবে। কমলা আজ অনাথা নয়, হীনচিত্ত আত্মীয়ের সংস্পর্শে হেয় নয়, সে অকুণ্ঠ কৌমার প্রেমের বৈজয়ন্তী মাল্যধারিণী মহামহিমময়ী নারী; সংযত-চরিত্র মণীশের হৃদয়-রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী সে।

যত বড় কৃপণই হোক, মেয়ের বিয়ে—করালী চরণ উত্ত্যক্ত চিত্তে দুই-চারিটি প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। সত্যকালী বিছানা ছাড়িয়া রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছেন। কমলা যে তাঁর সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ইহাতে মন তাঁর আদৌ ভাল ছিল না। কিন্তু কি করিবেন, উপায় তো নাই। বিমর্ষ মুখে চারি দিকে চোখ ফিরাইয়া আয়োজনের স্বল্পতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার মৃদুস্বরে বলিলেন—"ঐটুকু ঘিয়ে অত ময়দা ত ভাজা যাবে না, আরও সের দু'তিন লাগবে যে।"

"আরও তিন সের! চুমুক দিয়ে ঘি খাবে না কি? ঐ ঢের হয়েচে।"

সত্যকালী কহিলেন—"মিষ্টিতেও কুলোবে না। মোটে ত ঐ এক রকম, ঐ কাঁচা গোল্লা, তাও—"

করালীচরণ মুখ খিঁচাইয়া ধমক দিয়া উঠিল—"থাম্, থাম্, আর সরফরাজি কর্‌তে হবে না! যার কুলুবে সে খাবে, না কুলুবে না খাবে। তুই কি আমায় গলায় পা'দে ডুবুতে চাস্ না কি?"

সন্ধ্যার সময় সরোজিনী আসিয়া কমলাকে রান্নাঘর হইতে টানিয়া বাহির করিল। সে লজ্জায় তাহার গলা ধরিয়া বুকে মুখ গুঁজিয়া বলিল—"সরোজ। যেখানেই থাকি—তোকে কখনও ভুল্‌ব না।"

আসন্ন বিরহ-শঙ্কা-ব্যথিতা সরোজিনী তার রক্তিম গণ্ডে অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া সজল নেত্রে হাসিয়া কহিল—"দেখা যাবে, ভাই! ওমা, চুলটা বাঁধা হয়নি আয়, বোস্।"

সুচারু ছাঁদে কবরী রচনা করিয়া অনেক কষ্টে সরোজিনী চন্দন আল্‌তা আনিয়া কনে সাজাইল। থাটো রাঙ্গা চেলিখানা সে অঙ্গের পরিপূর্ণ লাবণ্যকে হতশ্রী করিতে পারিল না। গহনা নাই, শুনিয়া একবার সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল; পরে চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে প্রভাত-গগনে ঊষার প্রথম উদয় ছটার মতই নব জীবনের মঙ্গল সূচনা স্বরূপ সিন্দুর-বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দুই হাতে মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল—"কিছুই না থাকুক, এম্‌নিতেই এ রূপ ভুলিয়ে দেবে।"

স্নিগ্ধ চোখ দুটি বারেক পূর্ণ-প্রীতিভরে সখীর মুখে স্থাপিত করিয়া মুখখানা ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে কহিল—"যাও।"

কিন্তু স্তুতির বাণী কয়টা বোধ করি মন্দ লাগে নাই, কস্তুরী মৃগ যেমন নিজের গন্ধে নিজেই মোহিত হয়, আজ তার মনটাও তেমনি মাতিয়া উঠিল।

লগ্ন মাথায় লইয়া বর আসিল। বরযাত্রী জনকয়েক মাত্র। বরকর্ত্তা লম্বোদর-তুল্য দেহ গরদ-উত্তরীয়ে আচ্ছাদন করিয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। বরের পার্শ্বে মোটা চেনপরা মিৎবর মৃদু হাস্যে রহস্য-বাণী বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু এ কি বর! নেপথ্যস্থিতা সরোজিনা নিস্পন্দ-নেত্রে বরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর ভূমিকা লইয়া শিক্ষিত নট যেন রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতেছে—এই কমলার বর! সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি—কিন্তু ভস্মের ন্যায় বিবর্ণ,—প্রাণহীনের মত নিস্পন্দ কেন? কে যেন রোগ শয্যা হইতে নামাইয়া তাহাকে বিবাহ বেশে সাজাইয়া দিয়াছে।

পঁয়তাল্লিশ

গিরিজাসুন্দরী অবাক্ হইয়াছেন। কালধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ টিকে না, একথা ভাবিয়া তিনি এখনকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অনেকখানি উদার নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন, আদুরে বোনপো শচীকান্তর অনেক অসঙ্গত চাল-চলন যাহা তার পিতৃগৃহে অচল ছিল, সে সবই তিনি সহিয়া লইয়াছেন, অন্যে বলিলে, সেটা চাপা দিয়া বলিয়াছেন—"চিরকাল কি সমান যায়, কালের ধর্ম্ম একটা নেই ?"

কিন্তু সেই স্নেহময়ী মাসিমাও এবার তাঁর উদার নীতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না, তাঁর জন্মের সাধে ছাই ঢালিয়া বাসন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিল—তারপর সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যার পুনঃপ্রাপ্তির সংবাদ জানাইয়া বলিল—আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন আছে ; সেই শুভ লগ্নেই সে বিবাহ করিতে চায়। তখন সত্যই তাঁহাকে সে বিস্মিত, এবং একান্ত আহতও করিল। হউক কলিকাল তাই বলিয়া এতখানি স্বাধীনতা শোভা পায় না ! গিরিজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"পরশু কেমন ক'রে বিয়ে হবে ? তোমার বাপ ভাইকেও কি জানাতে হবে না ?" বিয়ে-পাগলা ছেলে মুখ এতটুকু করিয়া নত মস্তকে উত্তর দিল—"বিয়ের পরই লিখো। এ দিন ছাড়া হতেই পারে না মাসিমা, এ মাসে আর একটাও দিন নেই।"

"না থাকে বোশেখ মাসেই নাহয় হবে। এতই কি হুড়ো পড়লো ? বিয়ে কখন এত শীগগির হয় বাপু ! খেলাঘরের বিয়ে নাকি ? পাকা দেখা, গায় হলুদ এসবও আছে, সামাজিক ক'রতে হবে, নেমন্তন্ন, কুটুম সজ্জন আনা—বলিস কি তুই ! এ'কি হাড়ি ডোমের ঘর !"

শচীকান্তর মুখ কালী হইয়া গেল, কাতরকণ্ঠে কহিল—"পায়ে পড়ি মাসিমা, ও-সব কিছুই করো না ; কাউকে খবরও দিওনা—শুধু কোনমতে আসল কাজটাই হোক। ওর মামা অত্যন্ত বদ লোক, এদিনে নাহলে যাকে পাবে ধরে বিয়ে দিয়ে দেবেই, তুমি জানো না সে কি সাংঘাতিক লোক।"

ঢের বেহায়া ছেলে দেখা যায়, কিন্তু এত-বড় নির্ল্লজ্জ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কখনও কেহ দেখে নাই ! মাসিমার মনের মধ্যে ক্ষোভ বিরক্তি ও ক্রোধ একসঙ্গে

১৬

উত্তাল হইয়া উঠিল, মুখ রাঙ্গা করিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন—"যা বোঝ কর,—আমি না হয় বিয়ের জোগাড় করেই দিচ্চি এর কোন দায় দায়ীত্ব আমার রৈলো না। যেমন তোমার পিরবিত্তি, বাসন্তীকে ছেড়ে অমন হাবাতে ঘরের মেয়েকেই বা বিয়ে করা কেন। তোমার কথা তুমিই জানো কিন্তু শচী। এও বলি একাজ তুমি ভাল করছো না। এরপর তোমায় ভুগতে হবে।"

নিগূঢ় অভিমানে স্তব্ধ থাকিয়া যথাসম্ভব আয়োজনে মন দিলেন। কাশীতে এবং ভক্তিনাথকে সংবাদ পাঠাইতে শচী বারণ করিয়াছে, তাই রাগ করিয়া একটা খবরও দিলেন না। কহিলেন—"ওর যদি না দরকার থাকে, আমারই বা কি!" তবে বাহিরে মান হারাইবার ভয়ে হরচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন —পরশুর মধ্যে যাতে সামাজিক বিলি হয়, তার ব্যবস্থা কর, বাড়ীতে রসন চৌকির ও নিমন্ত্রণের ফর্দ্দও তৈরি করিবার আদেশ হইল। নায়েব কহিল— "যে আজ্ঞে! কিন্তু এত তাড়া কেন মা? কনে দেখা নিশ্চয়ই হয়েছে, পাকা দেখা হবে না?"

কুট নীতিজ্ঞা গৃহিণী কহিলেন—"ওসব বাছা অনেকদিন আগেই হয়ে গ্যাছে ওর নিজের ঘর থেকেই। দুপক্ষের বাধা পড়েছিল বলে বিয়ে আটকে আছে। পরশু বে'র আগে এগুলো যাতে হয় তুমি একটু উঠে পড়ে লাগো বাপ্!"

"অ্যাঁ, পরশু বে'! এত তাড়াতাড়ি কি হবে!"

"হতেই হবে। এমাসে আর দিন নেই, বোশেখে মেয়ের জন্ম মাস, ওদের নাকি তাতে হয় না নানান্ শত বায়নাক্কা যা বল্‌লুম কর গিয়ে। আর হরি পোদ্দারকে ডেকে পাঠাও যদি বৌভাত নাগাত দু-একখানা গ'ড়ে দিতে পারে।"

কল্যাণী মায়ের গম্ভীর মুখে তাঁর ঘোরতর বিরক্তির লেখা পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিল না। তার ভালবাসাভরা প্রাণ দাদার সুখের অংশ ভাগ করিয়া লইয়াই বিভোর ছিল। পরশ্ব তারিখটা যদি এক মুহূর্ত্তেই অতীত হইয়া যায়, এতটুকু আপত্তি নাই। কমলাকে কতক্ষণে দেখিবে সেই আগ্রহেই ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

গায় হলুদের ব্যাপারও সংক্ষেপ। বরের ইচ্ছায় হরিদ্রাটুকু ও লালপাড় একটি শাড়ী মাত্র পাঠানো হইয়াছে। তত্ত্ব-তাবাসের সাধ মনে মারিয়া গৃহিণী গম্ভীর মুখে একটা রূপার বাটীতে হলুদ ও একটী তাঁতের শাড়ী নাপিতের হাতে পাঠাইয়া দিলেন। শচীকান্ত যাত্রাকালে তাহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া গোপনে কি উপদেশ দিয়া দিল, হাতে অবশ্য কিছু ঘুষও গুঁজিয়া দিয়া।

বরযাত্রার পূর্ব্বে শচীকান্ত একবার গিরিজাকে নিরালায় ডাকিয়া বলিয়াছিল—"বিয়ে না হয় এখন বন্ধই থাক মাসিমা! এখন আমি বিয়ে ক'র্‌ব না।"

"কি বলিস, শচী! তোর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে।"

"মাসিমা এখন সব কথা ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না, পরে ব'ল্‌বো,—মনে হচ্চে সত্য এত তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে করা উচিত হচ্চে না।"

গিরিজা অনুতপ্ত হইয়া ভাবিলেন,—তিনি রাগ করিয়া আছেন তাই শচীর অভিমান হইয়াছে! মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া তার হাত ধরিলেন, হাসিয়া কহিলেন—"পাগ্‌লা ছেলে! কি যে করিস, কি যে বলিস, মাথা ঠাণ্ডা কর।"

"না মাসিমা, থাক্‌গে।"

"তুই না পৌঁছুলে সেখানে কি কাণ্ডটা হবে, তা ভাব্‌চিস? সেই যে বলেছিলি, সত্যি করেই তাই হবে যে! রাত্রের মধ্যে যাকে পাবে, তাকে ধ'রেই মেয়ে সম্প্রদান ক'র্‌তে হবে। হয়ত কোন্ থুড়্থুড়ে বুড়োর হাতে পড়ে মেয়েটা আজন্ম জ্বলে খুন হবে। বাপরে!—এত বড় শত্রুতা কি করতে আছে! ঐ জন্যেই ত অত করে তখন বলেছিলুম শচী সব কাজ ভেবে চিন্তেই করতে হয়। তা যাকগে এখন আর ক্ষ্যাপামী করো না আর সময় নেই।

বড় লোকের বাড়ীর বিবাহ, তার উপর গিরিজাসুন্দরীর ঘরে এপর্য্যন্ত বধূ আসে নাই,—পল্লীগ্রামে উৎসবের গন্ধে একেই ফুলবনে মধুমক্ষিকাবৎ পাড়া মাতিয়া উঠে, তার উপর এমন সুযোগ? এ গৃহের দ্বার এখন অবারিত। যে আসিতেছে পাতা পাতিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া যাইতেছে। পরিবেষণের ঘটায় উঠান দধি-কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া উঠিয়াছে—"দেরে, আয়রে শব্দের সঙ্গে জয় জয়কার মিশিয়া সর্ব্বক্ষণই কোলাহল জাগাইয়া রাখিয়াছে। দাসী চাকর প্রজা পড়্‌শী রঙ্গীন কাপড়ে সাজিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে ত্রুটি করিতেছিল না, গিরিজার গৃহ যেন অন্নদার যজ্ঞশালা। নিজে তিনি সকল চিন্তা ভুলিয়া

বর-বধূর কল্যাণে সকলকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁধিয়া দিয়া যে যাহাতে সুখী তাহাই সম্পন্ন করিতে ছিলেন,—এই তাঁর রীতি, এতেই তাঁর সুখ।

ভিয়ানকররা মিঠাই মুড়কি ফেনি বাতাসা প্রস্তুত করিতেছে, নূতন পিতলের হাঁড়িতে তাহা সাজাইনো হইতেছে—পল্লীগ্রামের প্রথা মত বৌ দেখিয়া প্রতিজনে একটি করিয়া সমিষ্টান্ন হাঁড়ি ঘরে লইয়া যাইবেন। এই দিকেই বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেরা এবং রাজ্যের মাছি ঝাঁক বাঁধিয়াছে। গৃহিণী কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও আদেশ দিতেছেন,—"ছেলেদের হাতে দুটো দুটো মিষ্টি দিস্‌রে! ভিয়েন বন্ধ রেখে বামুন ঠাকুরদের একটু জল খেতে দে'না। মতে মাছ এনেছে, ওকে এক সরা মুড়কির ওপর গণ্ডা দুই মেঠাই দিয়ে বিদেয় কর্‌।"

গ্রামের শেষে ষ্টেশনের নিকট বাজনদাররা অপেক্ষামান হইয়া আছে। চতুর্দ্দোল, মহাপায়া, লোক লস্কর সবই সেখানে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হঠাৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল। উৎকর্ণ পুরবাসী মহারোলে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ বর আস্‌চে!"—চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মলের ঝম্‌-ঝম্‌, বাজু ও খোঁপার গুঁজিকাঠির ঘুঙ্গুরের ঝিন্‌ঝিনানি তার মধ্যে আশ্রয় লইল। শশব্যস্ত গৃহিণী হাঁকিলেন—'পূর্ণকুম্ভু ঠিক আছে ত? দুধের কড়ায় ভাল করে জ্বাল দিতে থাক্‌,—ওরে ও কল্যাণি! ধানের কাঠাটা? ধানের কাঠা বরণ-পিঁড়ির কাছে দেখ্‌চিনে যে, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়,—ন্যাঠা মাছটা কোথায় রেখেছিস?" মহাশব্দে যুগল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গন্ধহীন পদ্ম ও জীবন-শূন্য ভ্রমর-অঙ্কিত পথের দুইপার্শ্বে নারীবাহিনী উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল। ছেলেরা অসহিষ্ণু হইয়া রাস্তায় ছুটিল।

বর-কন্যার যান আসিয়া দ্বারে থামিল। "ওমা এ কি গো! এ'কি ক'নে! এ যে সাত ব্যাটার মা লো! ধেড়ে মাগী! সব্বরক্ষে, মা! হরি বল! এই ক'নে তুলে কে কোমর ভাঙ্গবে?—ওলো ও কল্যাণি! হাত ধ'রে নে আয়—ক'নে তোর মতন সাতটাকে চেপে মেরে ফেলতে পারে!—একে ত এই বুড় ক'নে, তার ওপর হাঁটু ঢেকে একখানা বস্তরও জোটেনি গা! পায়ে দুগাছ মলও দ্যায়নি! অবাক্‌—!"

গিরিজাসুন্দরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই বধূ ঘরে আসিল! কার মুখে তিনি হাত চাপা দিবেন? শচী এ করিল কি?

শুধু কল্যাণীই কোন বাধা মানিল না, দ্বিধাহীন চিত্তে বধূর হাত ধরিল। বিলম্ব সহিতে না পারিয়া সেইখানেই সে বধূর মুখের আবরণ তুলিয়া তার মুখে সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্মিত হাস্যে কহিল—"এসো,—লক্ষ্মী এসো!" কিন্তু গিরিজা সেই উন্মোচিতাবগুণ্ঠন বধূর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁর মনে হইল, কবর খুঁড়িয়া শচীকান্ত বহুদিন মৃতা কোন নারীকে যাদুমন্ত্র প্রভাবে তুলিয়া আনিয়াছে! কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁর বক্ষ সঘনে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি সভয়ে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, দৃষ্টি নত করিলেন। সুযোগমত শিশির কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"এ বিয়ের সবই যেন হেঁয়ালি! বউ কেমন দেখলে?"

কল্যাণী অকপটে উত্তর দিল—"চমৎকার! দাদা সাধে কি পাগল হয়েছিল।"

শিশির এই সরলতার প্রতিমাকে তার সংশয়াকুল চিত্ত ভারে আক্রান্ত করিতে চাহিল না, শুধু কহিল,—কে' জানে, এ-সব কি রকম!"

'কি আবার রকম?"

"ওরা বল্লে হিষ্টিরিয়া, কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েটীর মৃগী রোগ আছে। সাবধানে রেখো। সম্প্রদান-টান তো মূর্চ্ছার মধ্যেই হয়েচে।"

গিরিজাসুন্দরীও কন্যাকে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন—"শচী কি কাণ্ডই ক'র্‌লে দেখ্ দেখিনি—লোকের কাছে মুখ পাওয়া দায়! তার ওপোর এত সৃষ্টি করে একটা বদ্ধ পাগল জোটালে। আমার মাথামুড় খুঁড়ে ম'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে!"

কমলার অসামান্য সৌন্দর্য্য কল্যাণীর সংসার অনভিজ্ঞ চিত্ত মায়া-যষ্টি স্পর্শ করিয়াছিল, সে ব্যথিত হইয়া কহিল—"না, মা, বউ খুব ভাল হয়েচে—পথের কষ্টে নিশ্চয় ও রকম হয়ে আছে কা'ল দেখো, সহজ হয়ে যাবে।"

কিন্তু পূর্ণ একটা দিন চলিয়া গেলেও নববধূর মধ্যে পরিবর্ত্তনের লেশ দেখা গেল না, একই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব,—অর্থহীন দৃষ্টি। বর্ণ-লালিত্য ঘুচিয়া গিয়া একটা শুভ্র বিবর্ণতা ক্রমেই তার ললাটে গণ্ডে দ্রুত বিস্তৃত হইতেছিল, তাহা বিস্তৃতি লাভই করিতে লাগিল। পাড়ার ও বাড়ীর বধূ কন্যাগণ নানা উপায়েও যখন সেই পাংশু ওষ্ঠ হইতে একটিও শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন

সকলেই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইল। কেহ কেহ অপমানিত বোধে চলিয়াও গেল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীময় পাড়াময় দেশময় রাষ্ট্র হইল, 'জমিদার-গৃহিণীর বোনপো রূপসী দেখিয়া এক ত্রিশ বর্ষীয়া মূক-উন্মাদকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে।' একালের ছেলেদের রূপ-তৃষ্ণায় শত ধিক্ দিয়া দেশ জুড়িয়া তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। শিশির জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি কল্যাণী ?"

কল্যাণী কহিল—"হতেও পারে।"

"তোমার দাদাও দেখছি এতক্ষণে বুঝেচেন ! তিনিও ত ওদিকে শয্যাগত। বেচারা ঐ জন্যই বিয়ে ক'রতে বসেও সাত বার পেছিয়েছিল, আগে, তখন কি জানি, যে এই কাণ্ড !"

কল্যাণী কহিল- "কে জানে, এ আবার কি হল, কিন্তু আমার এখনও মনে হচ্চে বউ বোবা নয় অমন সুন্দর যার চেহারা সে বোবা হতে পারে না !"

ছয়চল্লিশ

অত্যন্ত উত্তেজনার পরেই একটা সুগভীর অবসাদের আক্রমণ অনিবার্য্য। যে উদ্দীপনা সৈনিককে যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাখে, যুদ্ধ-জয়েব পর তাহা আর থাকে না। হয়ত তখন শোণিত প্লাবিত রণভূমির ভয়ানক দৃশ্য তার আকাঙ্ক্ষিত জয়োল্লাসের মধ্যে তীব্র অনুশোচনা জাগাইয়া তুলে। শচীকান্তব অবস্থাও প্রায় এইরূপ দাঁড়াইল।

বর-বেশে গাড়ীতে বসিয়া সে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে গতিশীল বহির্জগতের দিকে চাহিয়া ছিল। পৃথিবীটা যেন প্রলয়েব সূচনা লইয়া মহাবেগে ছুটিতেছে, পথ ঘাট গাছ ধূনাবিষ্ট জলাভূমি সমস্তই সেই গতিবেগের সহিত সমতালে যেন ছুটিয়া চলিযাছে। চমকিয়া সে চোক মুদিল। নিজে যেন সে কাহার কঠিন মুষ্টি-বদ্ধ হইয়া তেমনি বেগে আকৃষ্ট হইতেছে—থামিবার শক্তি নাই। নিজেকে বড অসহায় বোধ হইল। এ কি! এ'কে এমন করিয়া মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত করে? এই কি মানবের অদৃষ্ট-নামধেয় ভাগ্যচক্র? কে ইহার অদৃশ্য চালক? সেই কি ঈশ্বর? এতবড় প্রবল শক্তিসম্পন্ন হস্ত তদ্ভিন্ন আর কাহার? সব যেন হেঁয়ালির মতই বোধ হইতেছে, সে যেন কোন্ অদৃশ্য হস্ত ধৃত একটা কলের পুতুল, কল টেপা হইয়া গিয়াছে, থামিবার উপায় নাই, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় চলিতেই হইবে। গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার সময় দুইটা পুলিশের লোককে তার দিকে চাহিতে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তারা যেন তাকে ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! মনে করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলেও এইরূপই তার মনে হইল। একটি গোযান বরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—উহাতে না উঠিয়া সরিয়া আসিয়া ষ্টেশনের একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইল। হিমে থামটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, স্পর্শ করিবামাত্র তার ললাটের ঘর্ম্ম সেই শীতল স্পর্শে যেন জমিয়া আসিল। শিশির প্রফুল্লমনে গান ধরিয়াছে অশ্ব গজ পলাইল—চতুর্দ্দোল নাহি এল,—গরুরগাড়ি দিল দরশন, ভূপতি! আরোহি' কর সার্থক জীবন!· ·পালাও কেন?—এসো হে বর!"

শচীকান্ত অসহায় দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইল, কহিল,—"এখনও এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না—শিশির ?"

"পাগল নাকি! এখন ঘাব্ড়ালে চল্বে কেন? জানতেই ত, এরা গরীব।"

"আহা, তা নয়—শোন শিশির।—না, ভাই,—কি উচিত বুঝতে পারছিনে।"

শিশির তামাসা করিতে গিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইল, সবিস্ময়ে শুধু তার হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল—"অসুস্থ বোধ কর ত এসে গাড়িতে একটু শুয়ে পড়—সেরে যাবে। কবি-মানুষদের বিরহও যেমন—মিলনও তথৈবচ! কিছুতেই সুখ নেই!"

দুর্ব্বল শিশুর মত সে নীরবে আজ্ঞা পালন করিল। শরীরে বা মনে এতটুকু এমন বল ছিল না যে বিপরীত কিছু করিতে পারে।

শিশির পাশে বসিয়া কত কথা বলিল, সভয় প্রশ্নে বারবার কুশল জিজ্ঞাসা করিল, সে কোন জবাব দিতে পারিল না। তার মনে হইতেছিল কে যেন তাকে অন্ধকারের ছায়ায় অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তার অদৃশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে লাগিল এবং একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল।

তারপর বাধাবিপত্তি ঠেলিয়া বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু শুভ দৃষ্টি হইল না, কন্যার সলজ্জ নেত্র বরের পিপাসু নেত্রে তড়িৎ স্ফুরণ করিল না,—এতই সে আত্মহারা হইয়াছিল যে, পাছে তার আকুল আকুতি ধরা পড়িয়া যায় তাই সাহস করিয়া চাহিতে পারে নাই, কিন্তু বিবাহের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইতেই সর্পদষ্টবৎ কন্যা অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিয়া মুখের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিল, তারপর পার্শ্ববর্ত্তীর পানে দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিল এবং অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বিবাহ যখন শেষ হইল লগ্নের একটু শেষও ছিল না, শুকতারা তখন নিবিয়া গিয়াছে, গোলাপী সাড়ীর ঘোমটা তুলিয়া উষা তাঁর বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া রক্তবসনা কন্যার চন্দন-চর্চ্চিত মুখের মৃত্যু-বিবর্ণতা দর্শনে সহানুভূতির শিশিরাশ্রু মোচন করিতেছিলেন। যখন করালীচরণ বীতসংজ্ঞা কমলার

হিম হস্ত টানিয়া বরের শিথিল করে স্থাপন করিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ শিহরিয়া বর সেই হাতখানা নিজের হাত হইতে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল—"শিশির !"

"কি ক'রচো শচী !"

"তোমরা জানো না, আমি—"

"ক্ষ্যাপা না পাগল ! ব'সো,—ব'সো, সূর্য্য ওঠে ব'লে।" তাহাকে প্রায় চাপিয়া ধরিয়া শিশির তাহার পাশে বসিল, অস্ফুট স্বরে কহিল—"কি পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে ! মেয়ের চিরকেলে হিষ্টিরিয়া আছে শুন্‌লে ত ?—ভয় পাচ্চো কেন ? চিকিৎসা করলে সেরে যাবে।"

ঘরে ফিরিয়াও সে দ্বিধা কাটিল না। নববধূর কথা ভাবিতে গেলেই একখানা রক্তহীন অচেতন মুখ ও তার হিম-শীতল স্পর্শ মনে পড়িয়া দারুণ অস্বস্তির সঞ্চার করে, তথাপি মনের নিভৃতে একটুখানি সুখের আলোও যে ফোটে না তা' বলা যায় না।

ফাল্গুনের শীতোষ্ণ বাতাসে মুকুলদাম শিহরিয়া উঠিয়াছে, আম্রমুকুলের মদগন্ধলুব্ধ মধুকর গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে, বসন্তের চিরসখাও সে দিন নীরব ছিল না। প্রকৃতির মধ্যে একটা হাসি-খেলা মাতামাতিরই চিহ্ন, আকাশের নীলটাও সেদিন রূপালি কাজ করা পুঞ্জ মেঘে বিচিত্র রূপ ধরিয়াছিল। জানালার নিকট বসিয়া শচীকান্ত এক দৃষ্টে-সেই শোভাময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া আছে। বহুদিন পরে আজ যেন আবার প্রাণের মধ্যে এই কুহকিনীর উন্মাদ-কারী মূর্ত্তি ছায়াপাত করিয়াছে। বাহিরে মাঠে মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিতেছে—বাতাসে বিবিধ গন্ধ ভাসিতেছে, অন্য মনে গুন্‌গুন্‌ করিয়া সে একটা সঙ্গীতের একটা চরণ ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল—"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন ন তিরপিত ভেল।"

তরল রজত-ধারা ঢালিয়া চাঁদ উঠিল। জানালার ঠিক সম্মুখেই একটা বড় নক্ষত্র কাহার দীপ্ত নেত্রের মতই জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল, অল্প শীত অনুভব করিয়া শচীকান্ত একখানা র‍্যাপার টানিয়া গায়ে দিল—তারপর আবার সেই জানালাটার কাছে আসিয়াই দাঁড়াইল। সুবর্ণোজ্জ্বল হরিৎক্ষেত্র জ্যোৎস্না-তরঙ্গে ঈষৎ তরঙ্গিত হইতেছে—চাঁপা গাছের ডাল নাড়া দিয়া মৃদু বাতাস

বহিতেছে—অগণ্য নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রালোকে ম্রিয়মাণ—প্রলোভন অদম্য হইল।

ধীরে ধীরে ঘর দালান পার হইল; সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতে নামিতে দেখিল, কল্যাণী উপবে উঠিতেছে, সে দাঁড়াইল, দ্বিধা-কুণ্ঠিতভাবে নত মুখে কহিল—"তোকেই খুঁজছিলাম!"

"ওঃ—" কল্যাণী যেন আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার মুখ একান্ত ম্লান, এইমাত্র সে মায়েব কাছে বকুনি খাইয়া আসিয়াছে। আজকাল গিরিজাসুন্দরী সর্ব্বদাই সপ্তমে চড়িয়া আছেন, কাবণে অকাবণে তিরস্কৃত হওয়া এখন এ বাড়ীতে অনিবার্য্য, বিশেষতঃ কল্যাণীব পক্ষে।

শচীকান্ত সঙ্কোচ বোধ কবিতেছিল, নিজে হইতে কিছু বলিতে পাবিল না, দাঁড়াইয়া রহিল। কল্যাণীব মনে হইল, হযত তাঁব কিছু বলিবাব আছে। নিরুৎসুকে প্রশ্ন করিল—"কি দাদা?"

"এমন কিছু না। ফুলশয্যাব দিন বদলানোর জন্যে মাসিমা চটেচেন না?'

"তা' চটেচেন বৈ কি।"

"তা হ'লে—আজই না হয—"

কল্যাণী গাল-ভরা হাসিব সহিত কহিয়া উঠিল—"বেশ ত! মাকে বলি।"

শচীকান্ত জোর করিয়া সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে চাহিল। এই পাঁচদিন ধরিয়া কেবলই সে মনে মনে পিছাইয়াছে, কেবলই মনে হইয়াছে, যেন গূঢ় অভিচার-ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক শবসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সিদ্ধির শবটা মাত্র তার লাভ হইয়াছে, ষড়ৈশ্বর্য্যের কিছুই যে তার নাই! আজ সবলে সমস্ত বাধা কাটাইয়া চিত্তকে সে উন্মুখ করিয়া তুলিল। সেই হিম-হস্ত আর তেমন করিয়া তার পা চাপিয়া ধরিল না। সহজভাবেই সে জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে অগ্রসর হইয়া বধূর সম্মুখে দাঁড়াইল। নূতন ভাবের আলোড়নে বক্ষ তখন শুধু কাঁপিতেছিল।

কমলা কোনদিকে চাহিয়া দেখে নাই। যে অবস্থায় তাহাকে কল্যাণী ফুলসাজ পরাইয়া বসাইয়া দিয়া গিয়াছে, মাটির প্রতীমার মত সেই অবস্থাতেই সে বসিয়াছিল।

জানালার ঠিক সম্মুখেই সবুজ বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া শিশু চন্দ্র প্রসন্ন মুখে দেখা দিলেন, সেই আলো কমলার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, যার নিজের মন নিজের কাছে পাথর হইয়া গিয়াছে, অপরে তার প্রতি কেনই এত সহানুভূতি দেখাইতে আসে কে জানে !

শচীকান্ত অগ্রসর হইয়া মৃদু স্বরে ডাকিল—"কমলা !"

কমলা তাড়িতাহতের মত একবার মাত্র চমকিয়া আশাপূর্ণ নেত্র পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল, পরক্ষণে ঘোর হতাশার বজ্র যেন তার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এমনি তাহাকে অসহায় দেখাইল। বুঝি, শেষ সংশয়টুকুরও সমাধি হইয়া গেল।

সে দৃষ্টিতে কি ছিল, কে জানে, সে চোখের বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে শচীকান্তর গুরুভারগ্রস্ত অপরাধী চিত্ত বর্ষণ-ক্ষ্যান্ত মেঘের মত একেবারে লঘু হইয়া গেল। দূর অতীত নিকট হইয়া নিকটকে যেন সুদূরে ঠেলিয়া দিল, সে কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিল—"কমলা। এ জীবনে এ দিন যে ফিরে পাব, সে আশা আমার ফুরিয়ে গেছল। এ সুখের ঋণ কা'র কাছে শোধ করবো ? আমায় তুমি বলে দাও তিন বৎসর কেটে গেছে—কত খুঁজে ফিরেছি—কোন্ অতলে তলিয়ে ছিলে—কোথাও তোমায় খুঁজে পাইনি—"

আবেগ-ভরে সে আরও কত কথাই বলিয়া গেল, কিন্তু নববধূ বোধ হয় একটা কথাও তার বুঝিল না, সে তেমনই নিস্পন্দ-লোচনে চাহিয়া রহিল। তার শরীরে বুঝি ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা চোখ দুটায় একটা ভাবও ত থাকিত !

রাত্রি বাড়িতেছে, কর্ম্মগৃহের কোলাহল মন্দীভূত হইতেছিল, বাতাস শীতল হইয়া আসিল। বিশ্ব-বিস্মৃত শচীকান্ত মুগ্ধ নেত্রে অনবগুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল কোথায় ক্ষোভ—কিসের লজ্জা, এ মুখের যে তুলনা নেই !

সরিয়া আসিয়া মুগ্ধ স্বরে ডাকিল—"কমলা !" কমলার হাতখানি হাতে তুলিয়া লইল—"আমার কমল !"

আগ্নেয়-গিরির ধাতু-নিঃস্রাবের মত জ্বালাদিগ্ধ কঠিন স্বরে কমলা সহসা চিৎকার করিয়া উঠিল,—"না, না, না,"—সবেগে হাত টানিয়া লইয়া বিদ্যুৎ বেগে সে দূরে সরিয়া গেল।

ভোরের বেলা বাহিরে আসিতেই কৌতুকময়ী কল্যাণী আসিয়া প্রশ্ন করিল—"বউ কথা কয়েচে—দাদা?" সে প্রায় সারারাত্রি দ্বারের ফুটায় চোখ রাখিয়া কাণ পাতিয়া নিঃসাড়া কক্ষে আড়ি পাতিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। শচী এ প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ হাসিয়া উত্তর করিল—"তোদেব বউকে জিজ্ঞেস করিস্।" দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মনে হইতেছিল, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া গলা ছাড়িয়া মেয়েমানুষের মত খানিক কাঁদিতে পাইলে বুঝি বাঁচিত!

কল্যাণী পাশের স্নানাগার হইতে বধূকে টানিয়া বাহিব করিল। সেই উদাস দৃষ্টি, সেই একই ভাব! বুঝিল, তাব দাদা এইজন্যই তেমন বিষাদেব হাসি হাসিয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—"কি তোমার রকম ভাই?"

কমলা অর্থহীন দৃষ্টিতে কেবল একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। সে দৃষ্টিতে কিছুই ছিল না—তথাপি যেন অনেক কিছুই ছিল। কল্যাণী সভযে দুই পদ পিছাইয়া গেল।

মনের ঝাল মনে মারিয়া গিরিজাসুন্দরী যথাকৃত্য সম্পাদন করিতেছিলেন। বুঝিলেন, এইজন্যই শচী বাপ-ভাইকে জানাতে দেয়নি। একে তো ডোমের চুপড়ি ধুইয়া তোলা,—তায় অমন ধেড়ে মেয়ে। ওরা কি এ অনাচার ঘটেত দিতেন? তা যা হবার হয়ে গেছে, তাই বলিয়া আমি কেন ওদের একটা খবরও না দিই? ভক্তিনাথকে পত্রে যথাসম্ভব সংবাদ পাঠাইয়া বৌভাতের মধ্যে সপরিবারে আসিতে লিখিলেন। বলিলেন—"আমার ত দুজনই সমান। আমি কেন তার সঙ্গে এতটা তফাৎ করবো?"

বড়বধূ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। মাসির এতখানি দৌলত ভোগ করিতে লাগিল ছোটবাবু, আর তাদের অবস্থা সেই যথাপূর্ব্বং! অভিমানে কাহারও সহিত ভালরূপে কথাও তিনি কহিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন—"একেই বলে কলিকাল! যে দেবতা বামুন মান্‌লে না, সেই হলো রাজ্যেশ্বর, আর আমরা যে ভিটেয় সাঁজ

সন্ধ্যে জ্বালাচ্চি,—বার মাসে তের পার্ব্বণ বাদ দিচ্চিনে,—একচোখো ঠাকুর কি চোখের মাথা খেয়েছে এ সব দেখ্‌তে পায় না?"

কল্যাণীর কাছে পরিচয়ের আবশ্যক করে না, সে হাসি মুখে ভ্রাতৃজায়াকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—"কেমন জা' হয়েচে দেখসে বৌদি—এমন কখনও দেখনি।"

বড়বধূর কানে শচীকান্তর স্ত্রীর এতটা প্রশংসা সহিল না, তিনি মুখ ঘুরাইয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলেন—"রূপ যদি বল্লে ত বলি, আমাদের ওখানে মণীশ ঠাকুরপোর বাগ্‌দত্তা একটি মেয়ের যেমন রূপটি দেখেছি, আর কোথাও তেমনটি দেখব না। তা তোমায় বলে দিলুম। মেয়েটির নাম কমলা।—তা নামেও যা, কর্ত্তব্যেও ঠিক কি তাই! একেবারে যেন লক্ষ্মীর—ও মা! এ'কি? এই তোমাদের বউ নাকি? অ্যাঁ! সে কি? এ ত সেই কমলাই।"

সাতচল্লিশ

মস্ত বড় একটা ফাঁড়া আসিয়া কাটিয়া গেলে মনের মধ্যে কিছুক্ষণ বড় একটা উদারতার হাওয়া বহিতে থাকে, ছোটখাট অশান্তি সেই বড় বিপদের মধ্যে লীন হইয়া যায়, নূতন স্বাস্থ্য লাভের মত হৃদয়ে নবীন শান্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া নবজীবন গঠিত করে, কোন বিক্ষোভ যেন আর সে চিত্তে স্থান পায় না।

নন্দকিশোর প্রবল ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পূর্ব্বের সকল আঘাত ভুলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে ইন্দুভূষণের সহিত বোঝা পড়া চুকাইয়া বিন্ধ্যবাসিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"ইন্দু ছেলেটির জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল, বড় চমৎকার ছেলেটি! যাহোক, যা হবার নয়, তার জন্যে আপ্‌শোস করা বৃথা। আমি তাকে অবশ্য ছেড়ে দেবো না, তার সকল ভার নিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দেবো। এখন তুমি কি বল, বিন্ধ্য? গৌরীর বিয়ে বন্ধ হবে—না, এই সময়েই দিয়ে ফেলা হবে?"

বিন্ধ্যবাসিনীও এই কথা ভাবিতেছিলেন, উত্তর করিলেন—"বর কোথায় পাবেন?"

নন্দকিশোর কহিলেন—"বর ঠিক আছে। তোমায় একটি কাজ ক'রতে হবে, সত্যর মাকে একখানি চিঠি লিখে সব কথা জানাও। তাঁদের মত জিজ্ঞাসা কর। এই দিনেই বিয়ে হ'লে বাইরে আর অতটা গোল হবে না, আর দিতেই ত হবে এক দিন।"

এ ইচ্ছা বিন্ধ্যর মনেও উঁকি দিয়াছিল; কিন্তু তিনি ইহাকে আমল দিতে সাহস পান নাই, ভগ্নিপতির কথার উত্তরে কহিলেন—"সত্যর সঙ্গে বিয়ে দেবেন?"

"ক্ষতি কি? তারা যদি দেয়।"

"তা দিতে পারে। শিবনারায়ণ বাবু চমৎকার লোক—ধ'র্‌লে 'না' ব'ল্‌তে পা'র্‌বেন বোধ হয় না। কিন্তু—"

"কি?"

"তাঁরা যে বউকে বাপের বাড়ী বার মাস রাখেন, এমন ত মনে হয় না, অবস্থাপন্ন লোক তাঁরা—তাতে পাঁচটা নেই।"

"কার না সাধ মেয়ে শ্বশুর ঘর করে ?"

বিন্ধ্যবাসিনী বিস্ময় বোধ করিলেন; কহিলেন—"আপনার যখন আর কোন অবলম্বন নেই, তখন—"

অন্ধকার রাত্রে ঘন মেঘের বুক চিরিয়া ক্ষণপ্রভা যেমন চমকিত হয় তেমনি এক ফোঁটা শুষ্ক হাসি নন্দকিশোরের ওষ্ঠ প্রান্তে চকিতে মিলাইয়া গেল, কহিলেন—"আমি কে,—বিন্ধ্য! চির আবর্ত্তনশীল সংসারচক্রের আবর্ত্তন-বেগের বিরুদ্ধে বাধা দেবার আমার কি শক্তি আছে? দেখ, কোথা থেকে কোথায় ব্যাপারটা গড়াল। বিধাতার খেলা তুমি আমি উপলক্ষ হয়ে খেলে যাই বই ত নয়, কেন খেলি? ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন যাই? কে নিয়ে যায়? আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হাত আমাদের টেনে নিয়ে যায়, তাই না যাই। কি হবে সে বেগবান তরঙ্গের বেগে বাধা দিয়ে? যা বিধাতার বিধান তারই সাহায্য চেষ্টা করা ভাল। এর মধ্যে ভাগ্যের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছো না?"

নন্দকিশোর চুপ করিলেন। তাঁর কণ্ঠের মৃদু কম্পনে মনের আঘাত সুব্যক্ত হইল। গৌরী যে তাঁর কন্যা নয়—এ আকস্মিক সংবাদের বিহ্বলতা ও ব্যথা এখনও তাঁর মন হইতে কাটিয়া যায় নাই। নিজের মনকে তিনি নিজেই কতবার প্রশ্ন করিতেছিলেন, আমি যে তার মুখে কাদম্বিনীর মুখ দেখিতে পাই, তাও কি আমার মনের ভ্রান্তি? হবে—এ হয়ত মায়া মরীচিকা? গৌরীর মনে যে তাঁর প্রতি ভালবাসার কোথাও এক একটা অভাব রহিয়াছে, আর তার প্রকৃত কারণ যে তাঁদের নিঃসম্পর্কতা, ইহা ভাবিয়া চিত্ত তাঁর দারুণ বেদনা বোধ করিল। তাই শেষে নিজেকে তার সুখের কাছে উৎসর্গ করাই স্থির করিলেন। বিন্ধ্যও কি এ ঘটনায় ব্যথা পান নাই? পাইয়াছিলেন বৈ কি। কিন্তু এই অনাথার জন্য তাঁর ব্রহ্মচর্য্যপূত নিষ্কাম চিত্তে যে বাৎসল্য আজীবন সঞ্চিত রহিয়াছে, সেখানে তিনি কোন দিনই প্রতিদানের আশা তো রাখেন নাই, তাই তাঁর স্নেহ-উৎসের

বেগ যেমন তেমনই রহিল, মনে মনে বলিলেন—"না হোক আমার বোন্‌ঝি,—তবু সে আমাব সেই গৌরীই ত।"

একটু নীরব থাকিয়া নন্দকিশোর পুনরায় বিষণ্ণ-স্বরে কহিলেন—"অন্তর্য্যামী বুঝি অন্তরের অপরাধের এই দণ্ড পাঠিয়ে ছিলেন! আমার ব'লে আমি একেবারে মোহে অন্ধ হ'চ্ছিলাম, তাই বুঝিয়ে দিলেন, যাকে নিজের ব'লে কাছ-ছাড়া ক'রতে ভয় পাচ্ছ, সে তোমারই নয়! আর না বিন্ধ্য, যা জড়িয়ে ফেলেচি, তা আর খুল্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু এর বেশী আব কাজ নেই! আমার সুখ দুঃখ এ জগতের নিয়মেব কাছে কতটুকু? নিজেকে আর বাড়াতে চাইনে।"

কথা কয়টার মধ্যে ত্যাগশীল পিতৃ-হৃদয়ের যে মর্ম্মব্যথা নিহিত, স্নেহময়ী বিধাতার বক্ষে তাহা বাজিল। তিনি একটা অছিলায় আত্মদমন প্রয়াসে উঠিয়া গেলেন।

গৌরী এ খবর পাইয়া খুসী হইল কি না সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। এ কি রকম? সত্যদা আমার—ওমা, এ যে বড় বিশ্রী! ছি, ছি, না—সে ভাল না, বরকে ত সব্বাই লজ্জা করে—ঘোমটা দেয়—আমি মরে গেলেও তা' পারব না। ও সব কর্‌'তেই আমার লজ্জা কর্‌বে—আর হাসি পাবে, কি যে ওঁরা সব ঠিক করেন! মাসিমাকে গিয়া বলিল—"বিয়ে না হলেই ত হয় মাসিমা,—হয় না?"

বিন্ধ্য তাহাকে কোলে টানিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া মনের ভার কাটাইয়া ফেলিলেন; হাসিয়া কহিলেন—"তা কি হয় রে পাগলি? হিন্দুর ঘরে বিয়ে না হলে যে হয় না।" গৌরীর পক্ষে আর কিছু বলা কঠিন হইয়া উঠিল, শুধু বলিল—"ধেৎ!"

আটচল্লিশ

পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনই ঘটিতেছে। দেড় বৎসরে শিবনারায়ণের সংসারে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াগিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন শিবনারায়ণকে অকাল বৃদ্ধ ও করুণাময়ীকে নিষ্পেষিত এবং সত্যকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল। কেবল একমাত্র মণীশকে দেখিলে লোকে ভাবে সেই একমাত্র যেন অপরিবর্ত্তিত আছে। পঠন, পাঠন, গুরুজনে সেবা স্নেহাস্পদে প্রীতি, সেই হাসিমুখ, সবই যেন সেই একই ভাব। এত বড় একটা বিবর্ত্তন তাহাকে যেন এতটুকু বদলাইয়া দিতে পারে নাই। তাহাকে দেখিয়া শিবনারায়ণ নিজের অনুতাপ-লাঞ্ছিত চিত্তে বিস্ময়াভিভূত হইয়া ভাবিতেন—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ,—তোমাতেই দেখলাম!"

কমলার স্মৃতি করুণাময়ীকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, কোন কোন মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে দুদিনেই চিরপরিচিত করিয়া তোলে; আবার দুজন চিরপরিচিতের মধ্যেও এমন একটা কিছু থাকে যাহাতে আজন্মের সহবাসেও নৈকট্যানুভূত হয় না। করুণাময়ী অনাথা সখী পুত্রীকে গৃহলক্ষ্মী রূপে কন্যাহীন গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া এতই সুখী হইয়াছিলেন; পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ মণীশের বধূরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে এতবেশী ভালবাসিয়াছিলেন, করালীচরণের হীনতায় স্বামীর উচিত কোপকেও তিনি সে জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিতে না পারিয়া গোপনে তাহার সহিত রফা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যত সক্ষম হইতে পারেন নাই, কমলা তাঁর বক্ষচ্যুত হইয়া গেল।

শিবনারায়ণ অত্যধিক অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। অত বড় হীনচিত্ততার সংস্রব মহৎ চিত্ত তাঁর সহিতে পারে নাই; তাই এত বড় ঘৃণিত অভিনয়ের আভঘাত তাঁহাকে তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অল্প পরেই ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন—"মেয়েটাকে নিয়ে যেতে দিলুম—এ ভাল হ'ল কি? একবার যাই না হয়।" করুণাময়ী ত তাহাই চাহিতেছিলেন, সহর্ষে কহিলেন—"তাই যাও—যে রকম লোক হয় ত টাকা পেলে আর কোথাও মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

"সে ভয় করিনে, বংশজের ঘরে অত বড় খাঁই কে' মেটাবে? অবস্থাপন্ন ঘরে কেউ আর টাকা দিয়ে ছেলের বিয়ে দেয় না; যত সুন্দরী মেয়েই হোক, তারা মেয়ে পণ দেবে না, 'তা ছাড়া মেয়েও ত ছোট্টটী নয়, আর বোধ হয় সেয়ানাও আছে, সে কি আর সে-রকম দেখ্‌লে তোমায় খবর না দেবে?"

পরদিন শিবনারায়ণ ত্রিবেণী গিয়া করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন—"যা চেয়েছিলে, দেবো তাই, কমলাকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দাও।"

করালীচরণেব ক্রমেই চোখ ফুটিতেছিল, লোভেই লোভ বাড়ায়, সে জবাব দিল—"তিনটি হাজার টাকা চাই, তা-ছাড়া আমার বাড়ীতেই বিয়ে হবে, সে খরচটাও আগাম দেবেন, এর এক কড়া কড়ি কমে চলবে না।"

অপমানিত শিবনারায়ণ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, বুঝিলেন—দর বাড়ীতেই থাকিবে। মনে মনে বলিলেন—"তবে দেখ, আমিও তোমায় জব্দ করি কিনা, দিন কতক চুপ করে থাক্‌বো—গরজ না দেখ্‌লেই সেধে এসে মেয়ে ফিরিয়ে দিতেই হবে।"

শ্বশুর বাড়ীর লোকদের তিনি বলিয়া আসিলেন সেখান হইতে সর্ব্বদাই কমলার তত্ত্ব যেন লওয়া হয়। কিন্তু একদিন যখন সংবাদ আসিল—করালীচরণ সপবিবারে হঠাৎ কোথায় চলিযা গিযাছে, তখন তাঁহাব মস্তকে যেন বাজ পড়িল। করুণাময়ীকে সংবাদটা তিনি জানাইতেই পারিলেন না, নিজেই চারিদিকে সংবাদ লইতে লাগিলেন; কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল—কিন্তু কোন ফলই ফলিল না, করালী আসিল না। শিবনারায়ণ ক্রমেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে সহসা সকল সংবাদই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভক্তিনাথ মর্ম্মাহত-চিত্তে রত্নপুকুব হইতে ফিরিয়া অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন। বড়বধূ ছেলে-কাঁখে পাড়ার প্রতিগৃহে ঘুরিয়া ছোট কর্ত্তার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাষ্ট্র করিয়া মনের ঝাল মিটাইতে লাগিলেন—"কেমন, মুখে চুণকালী প'ড়েচে ত? ভাই ব'ল্‌তে ঠাকুর মশাই দিশেহারা হয়ে যান, মনে করেন, কুঁদুলে মাগীরই যত দোষ;—ওঁর লক্ষ্মণ ভাই পাকা ফলটি ধরেই থাকেন—মুখে ছোঁয়ান না! দর্পহারী মধুসূদন কেমন দর্প চূর্ণ করেচেন! ভাই যে ওঁর কত ভাল—এখন দেখুন!"

সংবাদটা অত্যন্ত কঠোর ভাবে গাঙ্গুলী পরিবারের উপর পড়িল। করুণাময়ী এ দুর্দ্দৈবে স্তম্ভিত হইলেন। শিবনারায়ণ মরমে মরিয়া গেলেন? সহস্রবার তাঁর মন নীরব বিস্ময়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—"কা'র দোষে এমন হইল? মণীশের ও কমলার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বুঝিয়া আত্মধিক্কারে তাঁর চিত্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। কেন তিনি করালীচরণের উপর রাগ করিয়া কমলাকে ছাড়িয়া দিলেন মণীশ যদি মনে করে, টাকাটাই কাকার বড় হইল?"

সাপে ছুঁচা ধরার যে উপমাটা চিরদিন প্রচলিত আছে, এ পরিবারের অবস্থা এখন ঠিক সেইরূপই হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে সবটাই চাপা থাকিল। এই অভূতপূর্ব্ব নাটকের নায়ক এ পরিবারের ইষ্ট-গুরু তুল্য সার্ব্বভৌম মহাশয়েরই আত্মজ! তাই চাকদার প্রতি গৃহে যে সময় সেই ঋষি সন্তানের উদ্দেশ্যে কুৎসা গ্লানি বিদ্রূপ-অভিসম্পাত-বর্ষণ চলিতেছিল, এ গৃহে তখন ঝটিকা পূর্ব্বেকার স্তব্ধ সমুদ্রের মত একটা ভীতি-সঞ্চারিণী স্তব্ধতা মাত্র বিরাজ করিতেছে। সত্য পর্য্যন্ত এ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছে।

যেদিন নন্দকিশোর কন্যা বিবাহের উমেদারী লইয়া গাঙ্গুলী বাড়ী আসিলেন, সেদিন সদ্যো-বর্ষণের সজীবতায় দেশটা যেন তাজা হইয়া উঠিয়াছে। মেঘমুক্ত আকাশখানা অনন্তের বিশাল বক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, গাছপালার জল-ধৌত শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল, কে যেন এই মাত্র রং ফলাইয়া তাদের চিত্রিত করিয়া গেল! আম-বাগানের ছায়াস্নিগ্ধ স্নেহরাশি মাখিয়া সজল শীতল বাতাস ঘরে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এবং সেই চির-পরিচিত গৃহে টেবিলটির নিকট পূর্ব্বের মতই প্রীতিপূর্ণ কৌতূহলে মণীশ সেই ধৌত-ধূলি গৃহোদ্যানের দিকে চাহিয়াছিল। এর ধূসর কাণ্ডটি হইতে গাঢ় সবুজ পত্ররাজি পর্য্যন্ত যেন একটি নয়ন-লোভন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, সারি সারি কুন্দ বৃক্ষের আপ্রান্ত শ্বেত মুকুলে খচিত; ভক্ত-হৃদয়ের রক্তরাগে রাঙ্গা জবা বিশ্ব-লক্ষ্মীর পদতলে যেন আত্ম-নিবেদন করিয়াছে। মণীশ সেইদিকে চাহিতেই একটা অতি সুন্দর উপমা তার মনে পড়িল। একদিন এমনই বর্ষণ-ক্ষ্যান্ত মেঘের স্তিমিত আলোকে বসিয়া এক মহাকবি লিখিয়া

গিয়াছেন, "বিশ্রান্তঃ সন ব্রজ নব নদীতীরজাতানি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।"

বিশ্ব-রচনার আগাগোড়াই সৌন্দর্য্যপূর্ণ; ইহার কোথাও যেন কোন দৈন্য নাই। শুধু যত কিছু অভাব দিয়াই কি বিধাতা মানব-চিত্ত গড়িয়াছেন? এই সামান্য বৃষ্টিটুকু জগতের কতখানি তৃপ্তি সাধন করিয়া গেল—কতখানি শোভা-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিল। কিন্তু এ জীবনের মধ্যে উহার ক্ষীণধারা ত কই কোন পরিতৃপ্তিই দিতে পারিল না। মণীশ আপনার মধ্যে অন্বেষণ করিল, মনে তার ক্ষোভ নাই সত্য, কিন্তু আনন্দই বা কোথায়? ওই ছোট পাখীটির মত ওই জলধৌত লতাটির মত নম্র শান্ত চিত্ত তাঁরই জয়-গানে ত প্রাণ তার ভরিয়া নাই? কিন্তু কেন থাকে না? কিসের এ অতৃপ্তি? অমনই নির্ম্মল অম্লান হৃদয় লইয়া সে ত এ সংসারে এত দিন কাটাইয়া দিয়াছে, তবে এত দিনে মনের মধ্যে এই কুয়াশার সূক্ষ্ম জাল কোন্ সুযোগে প্রবেশ করিল? সে মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া কপিশবর্ণ আকাশের পানে চাহিল। অসীম বিশ্বেশ্বরের সন্তান হইয়া হৃদয়ে এই অসীম সঙ্কীর্ণতা বহন করিয়া বেড়ানো, মানব জীবের পক্ষে এ যে একান্তই লজ্জাকর। আপনার সত্তাকে সত্য মঙ্গলে শান্ত সুন্দরে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারিলে সকল দৈন্যই ঘুচিয়া যায়, ক্ষুদ্র স্ব বিশাল হইয়া উঠে, কেন মুহূর্ত্তের জন্যও মনে সঙ্কীর্ণ চিন্তা স্থান পায়? ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। অন্যের তৃপ্তিতে সে তৃপ্ত হইবে,—অপরের আনন্দে আনন্দপূর্ণ রহিবে, অভাব বোধকে স্বভাব করিবে না।

শিবনারায়ণ ডাকিলেন—"মণীশ!"

"আজ্ঞে!"—বলিয়া মণীশ ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিল। শিবনারায়ণের মুখ অত্যন্ত ম্লান, মনের মধ্যে যেন তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। কথা উচ্চারণ করিতে বাধিয়া গেল। আত্মদমন করিয়া কহিলেন—"নন্দবাবুর পালিতা কন্যার সঙ্গে সত্যর বিয়ে দিতে তুমি মত দিলে মণীশ? তুমি যাতে সুখী হবে, তা'তে বাধা দিতে আমার সাধ্য নেই। কিন্তু এ আমার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, মণীশ! তোমার চিরকৌমার্য্যে আমার বুকে শেল বিঁধবে—সতুর বউয়ের দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌তেই পা'রব না।"

মণীশ কাতর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"কাকাবাবু!"

"তুমি আমায় কি বলবে মণীশ! আমি কি জানিনে, আমি কি অন্যায় করেছি! তোমার বাগ্‌দত্তা বধূকে কেন আমি তুচ্ছ মান গর্ব্বে অন্ধ হয়ে পাষণ্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় ক'র্‌তে হবে না? তুমি ব'ল্‌ছো, তোমার মনে ক্ষোভ নেই। তাতেই কি আমি সান্ত্বনা পাচ্ছি—তোমার মনে মায়া নেই এ কথা আমায় কে' বিশ্বাস করাবে? আমার এ যন্ত্রণা যাবার নয়—এ আমায় ভুগ্‌তে হবে।

মণীশ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কমলার জন্য তার মনে কি কোন ক্ষোভ ছিল না সত্য? ছিল বই কি! তবে শচীকান্তের কমলা সংক্রান্ত সমস্ত কথাই ত সে জানে তাকে খুব বেশী অপরাধী সে করিতে পারে না। ভুল, ভুল, আগাগোড়াই এর মধ্যে একটা অসতর্ক ভ্রান্তির খেলা চলিয়া ছিল যে, সে যদি নিখিলনাথের নাম পূর্ব্বে শুনিত তবে এত বড় ব্যাপারটাই ত ঘটিতে পাইত না। খুড়িমাকে সে বলিয়াছে, হয় ত ভালই হইয়াছে, শচীকে তার ভাই বাগ্‌দত্তা করিয়াছিলেন—সে হিসাবে তাদের সংযুক্ত হওয়াই ত ন্যায়ত উচিত। শচীর মুখে নিখিলনাথের নাম যদি তার শোনা থাকিত; তাহা হইলে এ ভুল ঘটিতেই পারিত না। একথাও সে তাঁদের বুঝাইয়াছে। নিজের মনকেও সে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিলে, সে নয়—তথাপি কি যেন একটা সংশয় জাগিতে থাকে—সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেই জন্মান্তর-রহস্য-সংবাদ মনে পড়ে, মণিকর্ণিকার দৃশ্য চোখের সম্মুখে ভাস্বররূপে ফুটিয়া উঠে। নিজের কঠোর শপথ নিজের কানেই আঘাত হানে, কিন্তু তার এ সব কথা ভাবিবার অবসর নাই। যে চোখগুলির অনিমেষ স্নেহ-সজাগ দৃষ্টি তার মুখের উপর চাহিয়া আছে, তারা তার হাসি মুখে ছায়া পাত হইতে দেখিলেই শিহরিয়া উঠিবেন; তাই নিজের কথা আমল দিতে সে সাহসই করে না—তথাপি।

সে কহিল—"আমায় কি আদেশ ক'র্‌বেন, বলুন? আমি ত কখনও আপনার অবাধ্য হই নি।"

শিবনারায়ণ আর্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"সেইজন্যই ত কষ্ট মণীশ! যদি তুমি আধুনিক কালের ছেলেদের মত হ'তে, আমার পক্ষেও কৈফিয়ৎ খুঁজে পাবার হয় ত কিছু থাক্‌ত, কিন্তু তা'নও ব'লেই যে আমার অসহ্য হয়েছে। তুমি সংসারী হবে না—সন্ন্যাসীর জীবন কাটাবে, কেমন ক'রে আমি দেখ্‌ব, মণীশ?"

"তবে আমায় আদেশ করুন,—যাতে আপনি সুখী হন, তাই বলুন"

শিবনারায়ণ এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আসন গ্রহণে সক্ষম হইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঈষৎ শান্ত স্বরে কহিলেন—"সেদিন কাশীতে দৌড়ে গেলাম, সার্ব্বভৌম মশায় যা বল্লেন, তার উপর তোমায় আর আমি কি বল্‌ব? একবার আমাদেরই জন্য তুমি নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়েছিলে তার ফলে এই মনস্তাপ! আবার জোর ক'রে পাছে তোমায় অধিক অসুখের মধ্যে টেনে আনি—সেই ভয় হয়! তাঁর কাছে তুমি বলেছ, আমাদের আদেশে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ, কিন্তু যদি সে আদেশ না পেতে হয়, তা'তেই সুখী হবে। বিবাহ তোমার আদর্শ কোনদিনই ছিল না, আজও নেই।' আমি তোমায় প্রকৃত সুখীই ত দেখতে চাই—আমার সুখের কথা ছেড়ে দিই—তুমি কিসে সুখী হবে, সেই আমার প্রয়োজন! লোকে আমায় নিন্দা করবে, কিন্তু লোকের কথা তো বড় নয়, তোমার সুখই বড়। সত্যিই কি মণীশ, বিয়ে তুমি করবে না? করতে চাও না? ভাল করে ভেবে বুঝেই কি এই স্থির করেছ? আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে ত কেউ কারুকে কোনদিন কোন সঙ্কোচ করিনি, তুমি শুধু আমার সন্তানই নও, উপযুক্ত সন্তান, শাস্ত্রমতে বন্ধু—"

মণীশ নত নেত্র তুলিয়া চাহিল। স্থির গাম্ভীর্য্যের সহিত সুদৃঢ়স্বরে কহিল—"আপনি আর খুড়িমা যদি অনুমতি দেন, চিরকৌমার ব্রতই আমি নিতে চাই—সত্যর সন্তান আমাদের বংশ রক্ষা করবে। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মচারী সন্তান স্থানীয় বহু শিষ্যের উন্নতি বিধান দ্বারা গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালনের ফললাভ করতে পারেন—পার্ব্বো কিনা জানি না, তবে এইরূপেই গৃহধর্ম্ম রক্ষা করবার ইচ্ছাই আমার আছে এবং এর পূর্ব্বেও সেই আদেশই আমার ছিল, গুরুদেবও সে কথা জানতেন।"

"তবে তাই হোক—তোমার ইচ্ছায় আর ব্যাঘাত হবো না, কিন্তু তোমার খুড়িমা যে কখনও এ দুঃখ ভুলতে পারবেন, তা মনে হয় না! সত্যর বিয়ের কথা শুনে আরও কাতর হয়েছেন।"

শিবনারায়ণ চলিয়া যাইতে না যাইতে সত্য আসিয়া কহিল—"দাদা আমার উপর এ কি অবিচার করচ তুমি—সে হবে না।"

"কি করেছি রে?"

"তুমি ত জানো সবই—সে হবে না, বলে রাখলাম! বেশ মজা ত! নিজে আইবুড় থাকবে, আর আমায় বুঝি এম্‌নি করবে,—না যাও কখ্‌খনো আমি তা শুন্‌চি নে।"

মণীশ হাসিয়া সত্যকে কাছে টানিয়া লইল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"বলিস্ কিরে? গোঁবা যে সেই গোঃ—গাবৌ—"

"হোক্‌গে,—হোক্‌গে আমার দরকার নেই তাকে, আমি বিয়ে করবো না। তুমি যা করবে, আমি কি জন্যে তা করতে পাব না?"

সত্যর চোখ দুইটা আর্দ্র হইল ও ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। মণীশেরও দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, সেটা সামলাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আমরা বল্‌চি বলে করবি, স্বয়ম্বর তো আর হচ্চিস না।"

"তোমায় বুঝি কেউ বলেনি?—বেশ ত, আমি ত তোমায় বিয়ে করতে বলচিনে, তুমি আমি দুইজনেই এক রকমে জীবন কাটাব সেই বেশ হবে। আমি কি তোমার কোন কাজেই লাগতে পারিনে?"

আর সামলানো যায় না। এবার দুজনের রুদ্ধ অশ্রুই দুই দিক হইতে ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। অবরুদ্ধবাক্ সত্য কাঁদিয়া দাদার কোলে মুখ গুঁজিল কহিল—"দাদা, আমি কি শুধু তোমার পড়ানোর ছাত্র? আর কিছুই নই? তবে কেন তুমি যে পথ নিজের জন্য ঠিক করেচ, সে পথে আমায় স্থান দেবে না?"

গভীর আনন্দে মণীশের চিত্ত জোয়ারের সমুদ্রের মতই স্ফীত হইয়া উঠিল। সে পরমানন্দে ভাইটীর মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সকরুণ স্নেহে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল,—"তা' যে হ'তে পারে না

—শক্তি! তুমি যদি এ দায়িত্ব বহন কর, তবেই আমার মুক্তি হয়। পিতৃপুরুষের কথাও ত ভুললে চলবে না ভাই। তুমি তোমার দাদাকে সুখী করবার জন্য নিশ্চয়ই তার আদেশ পালন করবে—কি বল?"

ক্ষণপরে অস্ফুটস্বরে সেই উদ্ধত অবাধ্য বালক উত্তর দিল—"তুমি যদি সুখী হও তাহ'লে তাই করো।"

ঊনপঞ্চাশ

সত্যর বিবাহ। বিবাহে সমারোহ যথেষ্ট হইল; কিন্তু সুখ হইল না। শিবনারায়ণ চেষ্টা করিয়াও মানসিক গ্লানির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না, কমলার প্রত্যেক স্মৃতি আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়া করুণাময়ীকে দগ্ধাইতে লাগিল, সকল উদ্যোগ-আয়োজন যেন শোভাহীন নিরানন্দ ঠেকিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতেছিল, কাহাকে না আনিয়া এ যেন কাহাকে আনা হইতেছে! উঠিতে বসিতে গভীর নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে যন্ত্রণা ধ্বনি করিয়া বলিতেছিল—"মা আমার কমল রে! দুদিনের জন্যে এসে আমার এ'কি করে গেলি!"

কিন্তু যার জন্য এ পরিবারের সকলে অসুখী, তার আজ সুখের সীমা নাই। সে যেন দশটা হইয়া খাটিতেছে। যত চাষা-ভূষা, দরিদ্র, আতুর, আজ সে তাদের সবাইকার অভিভাবক, কলিকাতারই নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসিয়াছে, পায়রা-ডাঙ্গার ছেলেরা জমায়েৎ হইয়াছে, প্রতিবাসীদের ত কথাই নাই। এই প্রকাণ্ড দলটি খাইতেছে যত—খাটিতেছে ততোধিক। মণীশের একটি অঙ্গুলি হেলনে ইহারা বোধ হয় আগুনে জলে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কত বিষয়ে তার কাছে যে তারা ঋণী। বিবাহের বরও কোমর বাঁধিয়া সকলের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কেহ তামাসা করিলে বলে দাদা খাটবেন আর আমি বসে থাকবো কি? বারে!

দাদার সুখ-দুঃখে সত্য এখন নিজের সুখ-দুঃখ নিমজ্জিত করিয়াছে, নদী যেন পারাবারে মিলিয়াছে।

এ বিবাহে ব্রাহ্মণসজ্জন, অনাথ-অতিথের উপর যতটা খরচ করা হইল, বাহ্যিক ধূমধাম ততটা হইল না।

গাত্র হরিদ্রা হইয়া গেল, বরানুগমনের উদ্যোগ প্রস্তুত—রাত্রি-শেষে নান্দীমুখ,—সহসা নন্দকিশোর বাবু আসিয়া উপস্থিত, তাঁর মুখে অপরাধ সূচিত হইতেছিল।' শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যে?"

নন্দকিশোরের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল। কোন মতে কহিলেন—"কি আর বলবো! আপনাদের কাছে মুখ দেখাইতেই লজ্জা হচ্চে—এই দেখুন না, আজই এই পত্র পেলাম—"

সে পত্র এইরূপ:—

"মিরাট—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নিকট হইতে এখানে আসিয়া একটা কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠে—যে মেয়েকে আপনার নিকট দেখিলাম, সেটি বিশেষ রূপেই সুন্দরী; কিন্তু আমার স্ত্রী শ্যামাঙ্গিনীই ছিলেন, আমি ত কৃষ্ণাঙ্গই, হয়ত কিছু ভ্রম ঘটিতেও পারে, এই সন্দেহে আমি আপনার গৃহের দাস-দাসীদের অনুসন্ধান আরম্ভ করি—রুক্‌নিয়া নামের এক দাসীকে আমি চিনিতাম—সে আমার মেয়েটিকে পালন করিতেছিল। অনেক অনুসন্ধানে তাহার সংবাদ পাই। সে এখন এখান হইতে সাত ক্রোশ দূরে দেহাতে ঘরে থাকে, সেখানে গিয়া তার মুখে যাহা শুনিলাম, সে কথা লিখিতেও লজ্জা করিতেছে অথচ সে কথা না জানাইলেও ত নয়! গৌরী বলিয়া আপনারা যাহাকে জানেন, সে যথার্থ গৌরী নয়, সে বাস্তবিক আপনারই কন্যা। আমার কন্যা গৌরী মারা গিয়াছিল। কাপড়গুলা বোধ হয় তাহারই ব্যবহৃত। তাই এই ভয়ঙ্কর ভ্রমে আমি আপনার শান্তিপূর্ণ গৃহে বিপ্লব বাধাইয়া আসিলাম!—কি আর বলিব?—আপনি সুখী ব্যক্তি—এ ঘটনায় নীর ত্যাগ করিবেন।

কুশলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষাল।"

পত্র পাঠান্তে শিবনারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—"উপায়?"

নন্দকিশোর নতশিরে বসিয়া রহিলেন। লজ্জায় তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। কি বিশ্রী কাণ্ডটাই তিনি হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় ঘটাইয়া বসিলেন! দুদিন ভাল করিয়া ভাবিলে খবর বার্ত্তা লইলেও তো হইত!

কিন্তু বিধাতা যেখানে ঘটক, সেখানে বিবাহ বন্ধ করা যায় না। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হইতে সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম আসিলে কর্ত্তব্য-বিমূঢ় বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার মুখে রক্ত ফিরিয়া আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—"রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ চলিত না থাকায় সমাজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইতেছে না, প্রজাপতি আপনি আসিয়া সেই বাধা সমাজ হইতে বিদূরিত করিবার জন্যই হয়ত এই নাট্যাভিনয়টী করিলেন। এর চেয়ে সুস্পষ্ট দৈবাদেশ আর কে পায়? গৌরী সত্য পরস্পরের জন্য সৃষ্ট, এদের পবিত্র বন্ধনে সামাজিক অকল্যাণ দূর হবার পথ প্রশস্ত হোক।"

দুজনেই প্রসন্ন চিত্তে কহিলেন—"ওর চেয়ে শাস্ত্রাচার কি আমরা বেশী বুঝি? ঋষি-প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ধর্ম্ম ঋষিদ্বারাই সংস্কৃত হ'তে বাধ্য—আমরা একে গড়িও নাই, ভাঙ্গবেও না। যা' করবার ওরাই কচ্চেন।"

বিবাহ হইয়া গেল। নন্দকিশোর অবশ্য তেমন করিয়া মেয়েলি কান্না কাঁদিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁর মন তেমনি সুখে দুঃখে একটা অব্যক্ত কান্নাই কাঁদিতেছিল। মণীশকে বলিলেন—"মেয়েটি আমার চঞ্চল, তুমি ওর সব ত্রুটি শুধরে নিও।"

মণীশ হাসিয়া কহিল—"আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, আমরা ওকে আপনার চেয়ে অনেক বেশী জানি।" কত দিন ছিপ কাড়িয়া লইয়া ভর্ৎসনা করিয়াছে; কত দিন অপক্ক ফল হাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, সব কথা স্মরণ করিয়া সে নবদম্পতীর পানে চাহিয়া স্নেহের হাসি হাসিল। সেই দুরন্ত বাল্যসঙ্গী দুটি আজ নম্র শিরে লজ্জাবনত মুখে চিরসঙ্গীরূপে পরস্পর আশ্রয় করিল! মণীশের দৃষ্টি গভীর আনন্দে ঈষৎ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

ফুলশয্যার রাত্রে নিদ্রিতা বধূকে জাগাইয়া সত্য কহিল—"তোমায় একটা কথা বলবো গৌরি—সব চাইতে দরকারী কথা—তাই সবার আগেই বলচি,—আমার দাদাকে তুমি অন্তরের সঙ্গে ভক্তি করো, তিনি যেন কখনও তোমার ব্যবহারে আঘাত না পান।"

গৌরী অন্ধকারে তার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু কথাগুলার ভাবে ও স্বরে সে চমকিয়া গেল, অনুভব করিল, যে সত্যর জন্য তার প্রাণ কাঁদিয়া ফিরিতেছিল এ সত্য যেন সে সত্যই নয়!—একটু ভীতও হইল বিস্ময়ও বোধ

করিল—মানুষ নাকি এত বদল হয়! নিজেও যে সে কত বদলাইয়া গিয়াছে সেতো তা বুঝিতে পারে নাই।—এ গম্ভীর প্রতিজ্ঞার অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলেও মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল—"আচ্ছা!"

মণীশের ত্যাগ মণীশের মহত্ত্ব মণীশের স্নেহ তার পরম স্নেহাধারের মধ্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। পুত্রের মধ্যে শিবনারায়ণই পুনর্জাত হইতে-ছিলেন। এমনই করিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করে, ইহাই বংশ-গৌরব, তাই ইহাই জাতির মেরুদণ্ড, তাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বংশধারাকে নিষ্কলুষিত রাখার জন্য বহু উপদেশ দিয়াছেন, বহু প্রচেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, এ জিনিষকে জীয়াইয়া রাখিতে শোণিত শুদ্ধির একান্ত রূপই প্রয়োজন।

পঞ্চাশ

গাছ পুঁতিয়া সারা বৎসর জল ঢালিয়া তাহাতে ফুল ফুটাইলে সেই ফুলে গাঁথা মালা কণ্ঠে ধারণমাত্র যদি তার মধ্য হইতে অতি বিষাক্ত কীট বাহির হইয়া বক্ষে দংশন করে, তাহাতে মনে যেমন বিস্ময়-বিমূঢ়তার সঙ্গে ক্ষোভের ধিক্কার জাগিয়া উঠে, ফুলশয্যার রাত্রে নবপরিণীতার ব্যবহারে শচীকান্তর চিত্তেও ঠিক তেমনি ভাবের উদয় হইয়াছিল। বাহিরের ঘরে চৌকিতে বসিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া যতই সে এ ভাবনাকে প্রতিকূল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছে, ততোই যেন সে যুক্তিগুলাকে ক্ষুরধারে কাটিয়া এই মর্ম্মদাহ-কারী দুশ্চিন্তাকে অক্ষয় করিয়া তুলিতেছিল। পাষাণে প্রাণ সঁপিয়াছিল, এমনই মূর্খ সে!—এই তার কল্পনার স্বর্গ? এই তার কমলা? হায় সুন্দর তোমার অন্তরে বাহিরে কি এতই প্রভেদ?

মনকে বাঁধিবার কোন সূত্র ছিল না, তথাপি হাল ছাড়িলেও চলে না, অপ্রিয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা সংবাদ-পত্র টানিয়া লইল এবং তার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু হায়—মনকে কে কবে ফিরাইতে পারিয়াছে? সে দেশের ছোটলাট, বড়লাট, কাউন্সিল, সসাগরা ভারতের একচ্ছত্রা অধীশ্বরীরও কোন ভাল-মন্দের সংবাদ আমলে না আনিয়া নিজের কান্নাই কাঁদিতে চায়! সহসা—এ কি! এ কি সংবাদ!—সে কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। ইহাও কি একটা ইন্দ্রজাল, না অপর সকল ঘটনার মতই বাস্তব? বড় বড় অক্ষরে ভিতরের দিকে শেষ কলমে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে—"করালীচরণ,—কমলাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনো—যাহা চাহ দিব, অঙ্গীকার করিলাম।" নীচে সাঙ্কেতিক অক্ষর যা লেখা আছে, 'শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া আহত কাতর দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল! একে একে সকল সান্ত্বনাই কি তার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে—মাথার উপর অপরাধের গুরুভার স্বতই যেন নামিয়া আসিতেছে—এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল—"মাঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।"

"এখন ?—এ সময়ে ?—কি জন্য এ আহ্বান ?"

গিরিজাসুন্দরী গৃহমধ্যে একাই ছিলেন, প্রবেশ-পথে অধোদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিনাথ। বজ্রপাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই শচী গৃহে প্রবেশ করিল। এ সময় যে একদিন আসিবে ইহা সে জানিত এবং এই সময়টা যত বিলম্বে আসে তারই জন্য মনের মধ্যে প্রার্থনা থাকিলেও যতক্ষণ না আসিতেছে ততোক্ষণ শান্তিও পাইতেছিল না।

ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশে বাতাসে নদীতে যে ভাব ব্যক্ত হয়, মানুষের মনের মধ্যে ঝড় যখন আসন্ন হইয়া উঠে তাহাকেও তেমনি নিষ্কম্প দেখায়, মাসিমা কহিলেন—"তুমি যাকে বিয়ে করেছ, সে মেয়ে চাকদায় থাকত ?" তাঁর স্বর স্থির, এবং ধর্ম্মাধিকরণের বিচার-পতির স্বরের মতই গম্ভীরও। অপরাধী কহিল—"হ্যাঁ শুনেছি।"

"সে গাঙ্গুলীদের মণীশের বাগ্‌দত্তা মেয়ে ?"

"বহু পূর্ব্বে এর বড় ভাই আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে বাগ্‌দত্ত হয়েছিলেন, এ বাগ্‌দান সিদ্ধ নয়।"

"ও মেয়ে রাঢ়ীশ্রেণীর—তুমি এতো স্বীকার করবে ?"

পতনোন্মুখ অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল, মাসিমা ঊর্দ্ধস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"হতভাগা ছেলে। এই করতে তুই আমার কাছে এসেছিলি ? দেশের দশের মধ্যে মুখ আমার পুড়িয়ে দিলি !"

আত্মসম্মানে পূর্ণদৃষ্টি জমিদার-গৃহিণীর দুই নেত্রে আগুনের হল্‌কা ছুটিয়া গেল।—কত বড় বংশের বংশধর তুই—কি মহাপুরুষের সন্তান—একবার ভাবলি নে, এত বড় একটা কাণ্ড ছেলেখেলার মত করে গেলি—তুই আমাদের সেই শচী ? দুধের ছেলে তুই, তোর মধ্যে এত বড় প্রবঞ্চনা—এ কি ভাবা যায় !"

রুদ্ধকণ্ঠে সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। মাতৃহৃদয়ের, নারী-হৃদয়ের সমস্ত বেদনা হতাশা এককালে ব্যাকুল বেগে তাঁর রোষানল উত্তপ্ত বুকের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে শুদ্ধ করিয়া দিল। নির্ব্বাক্ অভিমানে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন রত্নপুকুরের অবস্থা বলিবার নয়। সে সব দিনের পল্লীগ্রামের দলাদলি যাঁহাদের জানা আছে, এমন একটা কাণ্ডে সেখানকার অবস্থা যে কেমন হইতে পারে, কেবল তাঁরাই তা' বুঝিবেন। বৌভাতের যজ্ঞি দক্ষ যজ্ঞের রূপ ধারণ করিল। বহু চেষ্টা যত্নেও ইহা রোধ করা গেল না।

ভোজন-রতগণ ভোজ্য দ্রব্য ছড়াইয়া দিয়া ঘোর রোলে উঠিয়া পড়িল, রান্না ঘরে বড় বড় হাণ্ডায় ডাল ভাত পুড়িয়া দিক ভরাইয়া তুলিলেও তাহা নামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হইল না। অনেকে সহর্ষে লুণ্ঠন-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিয়া গেল—দেখিবার লোক নাই! ভদ্র, অভদ্র, বালক, বৃদ্ধ, মেয়ে, পুরুষ একসঙ্গে একই ঘোট, একই কথা! দেখিতে দেখিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে কমিটি বসিল, ছড়া বাঁধা হইল—রাস্তায় রাস্তায় এই উদ্ভট মিলন সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল—ও বাড়ীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একঘরে করা এক-বাক্যে সাব্যস্ত হইয়া গেল।

দেশটা যখন হাস্যে রহস্যে কুৎসায় ভাসিতেছিল, কর্ম্মগৃহের মধ্যে তখন অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতার অন্তরালে এ নির্ম্মম এক বিচ্ছেদের সূচনা জাগিয়া উঠিতেছিল। ক্ষীর, দধি, মৎস্য, পায়স, ব্যঞ্জন টকিয়া পচিয়া অসহনীয় গন্ধে সারা বাড়ী ভরিয়া তুলিতেছে—যাদুমন্ত্রে পাষাণে পরিণত উৎসবানন্দময় গৃহ শুদ্ধ, যে যেখানে আছে যেন মূর্ত্তিবৎ জমিয়া আছে, প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে অথচ প্রাণের যে ক্রিয়া নাই—সকলেই যেন রুদ্ধশ্বাসে কা'র মৃত্যুশয্যা ঘেরিয়া শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে—এমনি মনে হইতেছিল।

গিরিজাসুন্দরী হরচন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন—"দোষ সব্বারই—শুধু ওকে দুষলেই বা হবে কেন, বিয়ে দিয়ে আনলে কোন্ ঘর থেকে, তার বার্ত্তাটুকুও নিলে না—এইজন্যই বলে বুড়ো হ'লে সংসারে থাকতে নেই! এখন এর বিহিত কি স্থির করলে কেউ?"

এই বিষয়েই পরামর্শ চলিতেছিল, উপায় স্থির না করিযাও কেহ নিশ্চিন্ত ছিল না, কেবল মুখ ফুটিতেই যা' বাধিতেছে, ভরসা পাইয়া পুরাতন কর্ম্মচারী মাথা চুলকাইয়া বলিল—"ব্যাপারটি ত সোজা নয়!—গড়িয়েও গেল অনেক দূর—"

"ভূমিকা করোনা বাছা! যা হয়েচে, তা' তুমিও দেখছ—আমিও দেখতে পাচ্চি!—যা' করতে হবে তাই ভাবো না।"

"—হ্যাঁ,—তাই তো ভাবা হচ্ছে—তা' আমি ওঁদের কে ও ঘরে ডেকে আনচি।"

হরচন্দ্র সরিয়া পড়িল। বাড়ীর গৃহিণীর সম্মুখে থাকা এখন যে নিরাপদ নয়, এতদিনের অভিজ্ঞতায় ভাল করিযাই জানা আছে। পরক্ষণে বাসন্তীর মাতামহ শিশিরের পিতা ও দেশের গণমান্য দলপতি ও পরামর্শদাতাগণ বিবিধ ছন্দোবন্ধে অন্তরালে সমাগতা গৃহিণীকে জানাইলেন তাঁর ঘরের কলঙ্ক নিজেদেরই মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁরা নীরব আছেন, কিন্তু এতবড় সমাজ বিগর্হিত কাণ্ডটাকে ত তাই বলিয়া চাপিয়া যাওয়া চলে না, যথেচ্ছাচারে সমাজ যে একেবারে উৎসন্ন যাইবে তাই তারা ঘটিতে দেন কিরূপে? যত শীঘ্র-সম্ভব এই কলঙ্কের দাগ ধুইয়া নির্ম্মল হওয়া চাই। বিধান দিলেন, "খুবই সহজ পথ রয়েছে পড়ে! ঐ কন্যাকে পরিত্যাগ করে শচীকান্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত-পূর্ব্বক—একটি কন্যাকে স্বঘরে বিবাহ করুন,—সমস্ত গোল মিটে যাবে।"

গিরিজা একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটার দশা কি হবে?"

"ঐ রাঢ়ীর মেয়ের?—কি আর হবে—বাপের না মামার ঘরে থাকুক গিয়ে।—কোন্ ভাল কুলীনের ঘরের মেয়ে রাঢ়ী-বারেন্দ্রের ঘরে কবেই বা শ্বশুর-ঘর করেছে বলুন তো?" হায় শচি? অভাগিনীর জন্মটাই খুইয়ে দিলি!—এ'কি করলি রে!—কিন্তু এ-ভিন্ন উপায়ই বা কি? গোপনে খোরাপোষের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, কিন্তু ঘরে ত আর নেওয়া চলে না—সমাজ তো আগে।

বাসন্তীর মাতামহ এ দলের অগ্রণী। শচীকান্তর উপর ক্রুদ্ধ হইবার তাঁর কারণ যথোচিতরূপেই আছে। মনের মত বর যখন স্বঘরে পাওয়া যাইতেছে না, তখন এই বর্জ্জন-কার্য্যটা সমাধা করাইয়া ছাদ্‌নাতলার বন্দীশালায় এই অবাধ্য যুবকটাকে বাঁধিতে পারিলেই তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।—প্রস্তাব করিলেন—"এ সব কাজে বিলম্ব করা চলবেনা, প্রত্যুষেই

ঐ রাঢ়ী-কন্যাকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করতেই হবে। ইতিমধ্যে শচীকে ডেকে কথাটা পাকা করা হোক।"

এ যুক্তি সমীচীন।

পদশব্দ শুনা গেল, শচী প্রবেশ করিল—ঘৃণায় লজ্জায় তার মনের মধ্যে কি না জানি হইতেছে—গিরিজা কপাটের কাছে সরিয়া আসিলেন।

ও যে বড় অভিমানী। এত লোকের বিচার-দৃষ্টি কেমন করিয়া সহিবে!

সুবিজ্ঞ বিচারপতিগণ যথেষ্ট ভূমিকা-সহ বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিলেন—বলিলেন, "তুমি যা' করেছ, এমন কেউ কখনও এ তল্লাটে করেনি,—কানেও কখনও এমন বার্ত্তা শোনা যায় না—কিন্তু 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' হা-হুতোস্মি করলেও যা করে ফেলেছ, তার তো বদল হবে না,—এখন এর একমাত্র উপায়—অন্যায়টা শুধরে ফেলা। ঐ কন্যাটিকে পরিত্যাগ করে রীতিমত প্রায়শ্চিত্তের পর পুনর্ব্বার স্ব-ঘরে দার পরিগ্রহ করলেই সকল দোষের খণ্ডন হয়ে যাবে, আর এ ঘটনা যত শীঘ্র ঘটে, ততই মঙ্গল, ঐ কন্যার সংস্পর্শ করা আর তো চলতে পারে না, এই ভোরের ট্রেনেই হরচন্দ্র ঐ রাঢ়ী কন্যাকে যথাস্থানে রেখে আসুক, এই সঙ্গেই পুরোহিত ডেকে পঞ্জিকায় প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহের দিন দুটীও দেখা যাক। এ পুণ্যাহ মাস—শুভদিনের অভাব এ মাসে হবে না,—কি আর হবে—ছেলেমানুষ—বয়সের গরমে একটা অন্যায় কাজ করে যখন ফেলেইছে, এক রকম করে শুধরে তো নিতে হবে—পরের ঘরের ব্যাপার তো নয়—'আকাশে থুতু ছুঁড়লে নিজের গায়েই পড়ে।"

গিরিজা উত্তর শুনিবার জন্য ছটফট করিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন—"না।"

চমকিয়া উঠিয়া তিনি গৃহ প্রাচীরে দেহ রক্ষা করিলেন। সমস্বরে কঠোর প্রশ্ন উঠিল—"কি-ই—না?—ত্যাগ করবে না?"

"না।" শচীকান্ত কহিল—"কি অপরাধে ত্যাগ করব, বলে দিন।"

"অপরাধ? প্রথম অপরাধ রাঢ়ীশ্রেণীর মেয়ে, দ্বিতীয় অন্যের যথারীতি বাগ্‌দত্তা—তৃতীয় উন্মাদগ্রস্তা—এর প্রত্যেকটিই ত্যাগের প্রকৃষ্ট এক একটা কারণ—শাস্ত্র এবং আইন-সঙ্গত।"

শচী কহিল—"আমি ভালরূপে জানি—সে উন্মাদ নয়, দ্বিতীয়তঃ সে আমারই নিকট বাগ্‌দত্তা—এ প্রমাণ আমার বাবাকে পত্র লিখলেই জানতে পার্ব্বেন,'—প্রথম বাগ্‌দান আমার বাবার অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গেই হয়েছিল। আর রাঢ়ী বারেন্দ্রের বিবাহ? সেটাত একেবারেই অবান্তর। শাস্ত্রবিরুদ্ধই নয়। পথের দুর্গমতার জন্যে যে ভেদ তৈরি হয়েছিল, সে বাধা ঘুচাবার সঙ্গে সঙ্গে এ ভেদবাধা কেনই বা না দূর হবে, বলতে পারেন?"

"তুমি ঘোচাবে না কি হে? অত বড় ভট্টনারাণই যা পাবলেন না—তুমি ত তুমি! শাস্ত্রে আর দেশাচাবে সর্ব্বত্র মিল থাকে না, শাস্ত্রেব চেয়েও দেশাচার এবং কুলপ্রথাকে এ দেশে বড় করেই দেখা হয়ে থাকে, রাঢীবারেন্দ্রে বিবাহ দোষের নাও হতে পারে, কিন্তু তা' অপ্রচলিত।"

তর্ক চড়িতেছে দেখিয়া শচীব জিদও চড়িল। সে কহিল, "প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে ছেলেকে কেউ বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে চাইত না, ট্রেন চলবার পর ট্রেনে চাপতো না, কলকাতায় যেত না—ডাক্তারী শিখত না—এখন এ সবই তো দেশাচার হয়ে গিয়েছে।—যা অন্যায় নয়, পাপ নয়, বরং সমাজের পক্ষে শুভ,—তা' প্রচলিত করবার জন্যে প্রথম দিকে দু-এক জনেই তো চেষ্টা করে,—আর তার জন্য, পীড়িতও হয়ে থাকে, এ তো অনিবার্য্যই—আমি জানি, আমি ঠিক কাজই করেছি, কমলা আমারই প্রথম বাগ্‌দত্তা—দত্তা কন্যার পুনর্বাগদান কি শাস্ত্র সম্মত?" কি নির্লজ্জ! হা রে শিক্ষাভিমানী আধুনিক ছেলে! গুরু লঘু জ্ঞানও কি বিধাতা তোদের নিকট হতে হরে নিয়েছেন? এতগুলো বুড়োকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে একটু সঙ্কোচেও কি বাধলো না! ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা'হলে তুমি তোমার এই অসিদ্ধ-বিয়ের পত্নীকে ত্যাগ করবে না?"

"সে আমার শাস্ত্র সম্মত ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ কর্ব্বার কথাই ওঠে না।"

"বাঃ ধর্ম্মের অর্থ টা ভালই হৃদয়ঙ্গম করেছে!"—গৃহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল।

শচী এবার সুবিনীত স্বরে কহিল—"আমাকে আর কিছু বলবার আছে কি?'

"তোমায় আর কি বলবো!—তোমার মাসিমাকে এই বলবার আছে, যে, যদি তিনি তোমার 'ধর্ম্মপত্নী' সমেত তোমার সঙ্গে কোনরূপ সংস্রব

রাখেন, তাহলে এ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্তই শেষ! আমরা শাস্ত্র সমাজ লোকাচার সবই মেনে থাকি, তোমাদের মতন আলোকপ্রাপ্ত হই নি কিনা।"

অপরাধীর আহত বক্ষ ফাটিয়া স্বর বাহির হইল—"তবে তাই হোক্।"

রাত্রি গভীর হইয়া আসিলেও বাহিরের ও ভিতরের গণ্ডগোল কিছুই কমিল না। আপন গৃহের মধ্যে বহুক্ষণ পদচারণা করিয়া শচীকান্ত এই কিছুক্ষণ-মাত্র একটা কোচের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। ঘুমাইবার জন্য নয়, চলৎশক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। যে প্রতীক্ষিত কালের জন্য প্রভাতে মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সে ব্যাকুলতা আর নাই। মন এখন জ্যোৎস্না-মধুরা যামিনীর সুখ-স্বপ্ন ছাড়িয়া বন্ধুহীন প্রবাসের অসহায় অবস্থা স্মরণে শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল।

ইহার মধ্যে অনেকখানি ঘটিয়া গিয়াছে। মাসিমার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, কথাবার্ত্তাও যা' হইবার তা'ও হইয়াছে—উপসংহার অবশ্য ভালরূপে হয় নাই। কমলাকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা সে-ও বুঝে। কিন্তু ইহার মীমাংসা মাসিমাও যে ঐ একই রূপে করিতে চাহেন! শুধু ভরণ পোষণ-ভারটা লইয়া। হায়, তাঁরা যদি বুঝিতেন! শেষকালে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন, বলিলেন—"তুই যদি এমন করে আমার মায়া কাটাতে পারিস্, তবে আমিই কি আর পারিনে শচী? বড়লোভ করে ছেলের সাধে তোকে টেনে এনেছিলুম মায়ের বুক থেকে, তারই এই শাস্তি? আমার এ পোড়া প্রাণে সবই সইবে। যা' তোর ধর্ম্ম হয়, কর্। আমার বলবার কিছুই নেই।"

সে এ বেদনা-দিগ্ধ অভিযোগের উত্তর দিতে পারে নাই। প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে। মাসিমার স্নেহ—তাঁর অপরিসীম করুণা মঙ্গল-কবচের মতই এতদিন তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এতখানি স্নেহমায়া সুখ ঐশ্বর্য্য সে আর কোথায় পাইত?—সেই মাসিমা আজ কাঁদিয়া তাহাকে বুকে টানিতে চাহিতেছেন, তবু সে অচ্ছেদ্য বাহুপাশ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতেই হইবে। বড় কঠিন, বড় অকৃতজ্ঞতার এ কাজ!

অতি ধীরে কে' গৃহে প্রবেশ করিল। শচী চাহিয়া দেখিল, কল্যাণী!—

"দাদা!" মুহূর্ত্তে সে ছুটিয়া আসিয়া তার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল, কাঁদিয়া বলিল—"দাদা! আমাদের সকলের মায়া কাটাবে, দাদা?"

এবার পাষাণ টলিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া তার মস্তকে পতিত হইল। সহানুভূতিহীন এ সংসারে এই একটি মাত্র প্রকৃত করুণার উৎস, কঠোর বিচার-দৃষ্টির বহির্ভূত একটিমাত্র স্নেহ-শীতল দৃষ্টি,—এ যে অপার্থিব ধন! ছোটবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত তার চিরসৌহার্দ্দের কত কথাই না তার তরঙ্গ উদ্বেল বক্ষের মধ্যে উঠিতে পড়িতে লাগিল। ক্রন্দন-জড়িত স্বরে কল্যাণী কহিল—"দাদা! সত্যি চলে যাবে তুমি? পারবে যেতে? মার কথা ভাববে না?"

"কি করি, বলে দে'না কল্যাণ?"

"দাদা!"

"কলি। তুইও কি ওই কথা বলবি? ও ছাড়া আর কি কোন দণ্ড তোরা আমায় দিতে পারিস্‌নে? খুব কঠিন দণ্ড?"

কল্যাণী মুখ তুলিল, কহিল—"না দাদা! ও কথা আমি একবারও বলবো না, কিন্তু কেন এমন হ'ল, দাদা! এ কি করলে তুমি?"

"আমায় আর বকিস্‌নে—কল্যাণি। আমি আর সইতে পারচিনে রে। সব্বাই মিলে আর বলিস্‌নে,—আমি অন্যায় করেচি, পাপ করেচি। এর আর একটা দিকও কি নেই? সমাজে কুপ্রথাচ্ছেদ, নিজের সত্যপালন,—অনাথার প্রতি নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের প্রতিকার, এগুলো কি এতই তুচ্ছ?—সেই দিক দিয়েই না হয় বিচার কর্‌ না তোরা? আমি ত মণীশের বাড়ী থেকে কেড়ে আনি নি, তারাইত বিদায় করে দিয়েছিল। আর যে যা বলে বলুক—শুধু তুই বল, না তুমি পাপ করনি, তোমার বাগ্‌দত্তা-বউ ও তোমারই।"

ঘরে আকস্মিক আগুন লাগিলে বিহ্বলতা আনে—কিন্তু সে যখন লোল-রসনা বিস্তৃত করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে; তখন মুহূর্ত্তেই জড়তা ঘুচিয়া যায়। কমলা নীরবে বসিয়া সবই দেখিল, কানের কাছে যাহা পৌঁছিল, সে সবও শুনিল, কিন্তু ইহাতে তার কোন ভাবান্তর ঘটিল না। সে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে—ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তি তার কোথায়? এ বাড়ীতে এই রহস্যময় অভিনয়ের অভিনেত্রীরূপে আজ সে সহস্র কৌতুক দৃষ্টি ও ব্যঙ্গপূর্ণ রসনার লক্ষ্য। বিদ্রূপ, কুৎসা, অভিশাপ ধারাকারে তার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইতেছিল, তার এতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিসের?

যখন আশপাশের লোকেরা ঘটনার পরিচয় দান করিতেছিল, তখন সহসা সে চমকিয়া উঠিল। কি যে ঘটিয়া গিয়াছে, এতদিন পরে সে যেন তাহা প্রথম উপলব্ধি করিল। তার লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া বহু পূর্ব্বেকার কি যেন একটা ঘটনাকে স্মৃতিপথে টানিয়া আনিতে চাহিল। আবার ভক্তি-নাথের গৃহে, নৈহাটি ষ্টেশনে—সেই অর্দ্ধোচ্চারিত তারই নাম—এ সবই যেন একটা ধারাবাহিক ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, আর কে এই তার জীবনের শনিগ্রহ! সে কাশীর সেই সার্ব্বভৌম মহাশয়েরই পুত্র।

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে কল্যাণী আসিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল,—"বউ!"—এ কি সম্বোধন! কমলার মনে হইল, এত বড় পরিহাস তাহাকে আর কেহ কখনও করে নাই। সে কোন্ গৃহের বধূ? উত্তর না পাইয়া ননন্দা অধিকতর স্নেহে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল, মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া কহিল—"বুঝেছি বউ, তুমি কেন যে অমন—আজ তা' বুঝেছি,—তোমার জন্যে আমারও প্রাণ কাঁদচে, ভাই!"

এবার আর সহিল না। সেই সহানুভূতিপূর্ণ বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে প্রাণ-ফাটা কান্না কাঁদিল।

গভীর রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে উষ্ণ প্রস্রবণের বন্যা-ধারায় জড়তা কাটাইয়া লুপ্ত চেতনা সুপ্ত স্মৃতিকে লইয়া হাহাকার সম্বলে জীবন আবার জাগিয়া উঠিল।

দিনের আলো না জাগিতে বিজয়ার আয়োজন হইযাছে। নহবতের সানাই সারাদিনই বন্ধ, গাছের পাখীরা তখনও ডাকে নাই। কল্যাণী ডাকিল,—"বউ!" কি জানি, সহানুভূতিপূর্ণ নারী-চিত্তে কি আছে, পাষাণকেও বুঝি সে প্রাণ দিতে পারে।—পাষাণী কহিল—"আর কিছু বল, আমি কমলা—"

"না, তুমি আমার বড় আদরের বউ। ভাই! অনেক ত বুঝালুম, হিন্দুর মেয়ের স্বামীই সব - স্বামিদ্বেষিণী হয়ো না বউ। অতীতের কথা ভুলে যাও—ঈশ্বর-সাক্ষ্যে যাকে বরণ করেছ, কাযমনে তাঁকে গ্রহণ কর।"

বিদায়ের অশুভ মুহূর্ত্ত দেখা দিল। কমলা যখন শুনিল, এখানেও সে স্থান পাইবে না, যার সঙ্গ তার পক্ষে হিংস্র শ্বাপদের চাইতেও ভয়াবহ, একমাত্র তারই বাহু তার একক অবলম্বন—তখন তার বজ্রাহত প্রাণও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কল্যাণী অজস্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া যখন তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লইয়া চলিল, সে তখন আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, তার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"তোমার মনে দয়া আছে, আমায় এমন করে তোমরা তাড়িয়ে দিও না। তোমার মাকে ডাকো, তাঁর পাযে ধরে একটু আশ্রয আমি ভিক্ষা চাইবো।"

কল্যাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া গেল, ক্ষণপরে স্তব্ধ গম্ভীর মুখে গিরিজা সুন্দরী আসিলেন। সে আর দেখা দিল না। কমলা তাঁর পায়ে পড়িয়া সকাতরে বলিল,—"আমায় আপনার এই বাড়ীর একটা কোণে পড়ে থাকতে দিন, আপনার পায়ে ধরচি, আমায় বিদায় করবেন না। আমার এ জগতে কোথাও স্থান নেই।"

গিরিজার স্ফীত নাসা, আরক্ত নেত্র, সজল জলদ-তুল্য মুখ তাঁহাকে যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কোন মতে পা সরাইয়া লইয়া পুরুষ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—"কেন বাছা, মিথ্যে মায়া বাড়াও! তোমার আবার স্থানের অভাব কি? মুখ্যুর হাতে পড়নি।—আমারই যা হোক, সর্ব্বনাশটা করলে। বাছাকে আমার—" বলিতে বলিতে অশ্রুজলের কম্পনে গলা

ধরিয়া ক্ষোভে ক্রোধে হতাশায় অধীর হইয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন—"এমন করে তোকে বিদায় দিতে হলো, বাবা আমার !"

দাসী আসিয়া সহানুভূতিহীন কঠিন হস্তে একপ্রকার টানিয়াই গাড়ির মধ্যে তাহাকে পূরিয়া দিলে গাড়ির কপাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধ কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে কমলার শ্রুতিশক্তিহীনপ্রায় কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, "তোমারও কেউ নেই,—আমিও আজ নির্ব্বান্ধব—আজ থেকে শুধু আমরা পরস্পরের—আর সেই আমাদের যথেষ্ট !"

তিপান্ন

বিবাহের এক বৎসর পরে শচীকান্ত ডেপুটি কলেক্টরের পদ লইয়া সদর হইতে দরিয়াপুর সবডিবিসনে বদলি হইয়া আসিল। এই পদ লাভ করিতে তাহাকে অমানুষীক শ্রম করিতে হইয়াছে, নিজের সমস্ত শক্তি জাগ্রত করিয়া সে প্রাণপণে খাটিয়াছে, নিজের প্রতি তিলমাত্র মমতা করে নাই, তাই সে শ্রমের পুরস্কারও সে পাইয়াছে। একটা স্থান লাভ করিয়াছে।

এতদিনে অবসর মিলিল। এইবার রণশ্রান্ত জীবনকে অনাবিল শান্তি-বারি পান করাইয়া শুধু তাহাকে উপভোগ করিয়া যাওয়া। বকুলপুকুর ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় বন্ধু নলিনাক্ষের আন্তরিক সহায়তা না পাইলে বোধ করি তার এই উচ্চ পদ প্রাপ্তি ঘটিত না। এতদিন তার মায়ের কাছে কমলাকে রাখিয়া সে মেসে থাকিয়া এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পরীক্ষায় সফল প্রযত্ন হইয়া এইবার তার গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া আনিল। এ পর্য্যন্ত কমলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে নাই—বন্ধুগৃহে কোনদিন সে তার সহিত দেখা করিতে সাহসও করে নাই—পাছে বন্ধুর সাক্ষাতে কমলার অনাগ্রহ প্রকাশ হইয়া পড়ে,—কিন্তু ভক্ত-বন্ধু ইহাকে খুব বড় চোখেই দেখিয়াছে, তার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া সকলের কাছে সে বলিয়াছে, এত বড় মনের বল ক'জনের থাকে শচী? শচী সব বিষয়েই দৃষ্টান্ত-স্থল! কর্ত্তব্যের কাছে কমলাও কিছু নয়—এমনই মনোবল তার।

দরিয়াপুরের সবডিবিসন-অফিসারের বাংলো ঠিক বাংলোপাটানের নয়, অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। চারিদিকে সবুজ শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে শুভ্র গৃহটি চিত্রবৎ সুশোভন। এ গৃহের সাজসজ্জাতেও ক্রটি ছিল না, সাধ্যাতীত ব্যয়ে গৃহস্বামী তার যেখানে যা থাকা উচিত, সেইরূপেই সাজাইয়া ছিলেন। এই নূতন সংসারে শচীকান্ত তার বধূকে প্রতিষ্ঠা করিল। তার পর এতদিনকার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—"এই তোমার ঘর-সংসার—দেখে নাও, আর আজ থেকে আমাকেও তোমার কাছে টেনে নাও,—কমলা একটুখানি

কাছে নাও! বড় দূরে পড়ে রয়েছি—আর পারি না, এবার কাছে এস।”

তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নবীন গৃহস্বামী গৃহে ফিরিল। সিঁড়ির পথে বারান্দায় ঘরে কৈ? কেহ ত নাই! ছাদে—না—ছাদের সিঁড়ি নাই ত! ওই যে একটা ছোট্ট ঘরের কপাট রুদ্ধ না! কমল! দোর খোল—কমলা! ঘর নিঃসাড়া দ্বার ছিদ্র-হীন। তার শরীরমন ভয়ে অবসন্ন হইয়া আসিল। নীচে আসিয়া নব-নিযুক্তা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, দ্বিপ্রহর হইতেই দ্বার রুদ্ধ, অভুক্ত আহার্য্য নীচেই পড়িয়া আছে।—তবে? দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—“কমলা কমলা দোর খোল,—শোন।”

পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া দ্বারের খিল ভাঙ্গিয়া খুলিয়া গেল। উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকিয়া ভীত নেত্রে চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল—ঐ না,—কমলা একটা কোণে দাঁড়াইয়া আছে? ছুটিয়া কাছে আসিল—কই—না কিছু ত পরিবর্ত্তন হয় নাই! উদ্বেলিত বক্ষে কহিল—“কিছু করনি ত?”—উত্তর না পাইয়া সবলে তার হাত চাপিয়া ধরিল; ‘বল, বল, ভাবনায় আমি ম’রে যাচ্চি!”

হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া কমলা স্থিরকণ্ঠে কহিল—“না।”—যথেষ্ট!—“কমলা! এ রকম কেন করচ তুমি?” কমলা দূরে সরিয়া গেল। সে নেত্রে সূক্ষ্ম একটা দাহিকা শক্তি বিদ্যমান ছিল। শচীকান্ত হাত ছাড়িয়া দিল, একান্ত ক্ষোভের সহিত কহিল—“কমলা আমার সঙ্গে তুমি অন্যায় ব্যবহার ক’রচো—ব’লে দাও, তোমার কাছে আমার কি অপরাধ? তেমন নিষ্ঠুর মামার হাত থেকে উদ্ধার করায় কৃতজ্ঞতাও কি তোমার মনে একটু নেই? একদিন ত তুমি এ কৃতজ্ঞতা স্বীকারও ক’রেছিলে?—সেদিন ওই জড় বালা দুগাছা যে আদর পেয়েছিল, তার একটু কণাও কি আজ আমি পেতে পারিনে? শুধু অবহেলাই ক’রবে? কেন? তোমার তো কোন ক্ষতি আমি করিনি!”

এত কথা বুঝি তার কানেও পৌঁছে নাই, সাপে কামড়াইলে যেমন অবস্থা হয়, কমলাকে ঠিক তেমনি দেখাইল। সে যে এতদিন কি ভুল স্বপ্ন দেখিতে-ছিল—কি মন্ত্রে কাহাকে পূজা করিয়াছে, আজ তাহা ধরা পড়িয়া গেল—মুহূর্ত্তে সে হাতের কঙ্কণ দুইগাছা খুলিয়া সবেগে ভূমে নিক্ষেপ করিল। সেই সঙ্গে

এমনই করিয়া নিজেকেও আছড়াইয়া চূর্ণ করিবার বাসনা মনে তার গর্জ্জিয়া উঠিল।—সকলই তার তবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে? আড়াগোড়া সবটাই ভুল! মণীশের প্রতিও একটা অসহায় ক্রোধ বুকের মধ্যে ধূ-ধূ করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! এতটুকু শেষ স্মৃতির সুখও তুমি তাহাকে দিলে না!

শচীকান্ত এ ব্যবহার দেখিল—তার মর্ম্মে এবার প্রচণ্ড একটা ঘা লাগিল, সে কিছুক্ষণ সেই অনাদৃত উপহারের পানে তাকাইয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক মুখ তুলিল, স্থির স্বরে কহিল—"বুঝেছি,—তুমি ভুল বুঝেছিলে,—মনে ক'রেছিলে এ মণীশের উপহার,—তাই তার অত আদর! তখন আমি নিজের স্বপ্নে ভোর—তাই ভেবে দেখিনি এর অন্য অর্থ থাকা সম্ভব।—হরি! হরি! মণীশ কি না সেই রকমই—তোমার জন্য তার তো কোনই উদ্বেগ দেখতে পেলাম না! সে—তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি, জিজ্ঞাসা করি?—তোমার দাদা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন। অন্যে সে কথা না জেনে—ভুল ক'রে যদি অপর কোন সম্বন্ধ ক'রে থাকে, তা' ধর্ত্তব্য নয়।—তারপর মণীশের কাকা তোমার মামার সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁদের বাগদান ফিরিয়ে নে'ন তুমি এখন ধর্ম্মতঃ এবং লোকতঃ আমারই স্ত্রী! অতীত ডুবে যাক। ভুল ভ্রান্তি মিটিয়ে ফেল— কমলা! কমলা! বারে বারে আর আমায় আঘাত করো না। প্রাণে আমার বড় জ্বালা, তুমি যদি একটা মিষ্টি কথা বল—সব জুড়িয়ে যাবে। এ জগতে তুমি ভিন্ন আর আজ আমার নিজের ব'ল্‌তে কেউ নেই—তোমায় পাবার দাম দিতে সমাজ আত্মীয় সব আমি হারিয়েছি, কিন্তু তোমায় যদি পাই, তার জন্যে আমার মনে ক্ষোভ থাকবে না।"

কে' কোথায়? পাষাণী উপেক্ষার বাণে তার এতবড় ব্যাকুল আত্মনিবেদন তুচ্ছ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন শচীকান্ত কমলার সহিত দেখা করিয়া বলিল—"ভয় নেই—আজ তোমায় আমি কোন অপ্রিয় কথা শোনাতে আসিনি, আমার মধ্যেও একটা মানুষের প্রাণ আছে—তুমি সেইখানে বিষম আঘাত হেনেছ। বল্‌তে এসেছি, অনাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পাবার দরকার নেই, আমি তোমার উপর সকল দাবী ছেড়ে দিলাম। যেদিন তুমি নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হবে,

সেইদিন আবার তোমার কাছে এসে দাঁড়াব। সে দিন যত দেরীতেই হোক, এক দিন আসবে,—এ কথা আমি বলে রাখছি। আমি তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে অসহিষ্ণু হ'ব না—একদিন এ ব্যবহারে অনুতপ্ত তোমায় হতেই হবে;—সে দিন তুমি বুঝতে পারবে—তুমি মণীশের নও—তুমি আমার।"

মানুষের সুখ দুঃখ দিয়া নিয়মের ব্যত্যয় করা যায় না। এই আকর্ষণহীন, নিরানন্দ নির্ব্বান্ধব গৃহ-পিঞ্জরে কমলারও দিন কাটিতে লাগিল। আশাহীন, প্রতীক্ষাহীন কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসর যদিও কাটিতে বাকী থাকে না, তথাপি তাহা একান্ত অসহনীয় একটা কিছু অবলম্বন চাই;—কিন্তু তার কি আছে? ঘর-সংসার আছে, কাজ-কর্ম্মও যে নাই এমন নয়, করিলে সবই আছে, কিন্তু করিবার ইচ্ছাই যে নাই। আছে শুধু নিঃসীম চিন্তাসমুদ্র,—সেই সীমা পরিশূন্য চিন্তা সাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় লুণ্ঠিত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই! গভীর অভিমানে সারা প্রাণ পুড়িতে থাকে—বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলে, 'এই তোমার দয়া! এই বিচার তোমার? কে'বলে, তুমি দয়াময়। নিষ্ঠুর, পাষাণ তুমি! কি পাপে আমার এ দুর্গতি করলে? এমন কি দোষ আমি করেছিলাম?'—আবার মধ্যে মধ্যে নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে অতীত আসিয়া আলো হাতে দেখা দেয়, সে দিনের সেই আশ্বাসবাণী কানে বাজিয়া উঠে, দৃঢ় চিত্তে ভাবিতে থাকে, এ জীবনের শেষে কি আর কিছুই নেই?—সারা জীবনের পূজায় সেখানেও কি আমি পাবো না? পণ্ডিত-মশাই যে বলেছিলেন, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ জন্মান্তরের সম্বন্ধ—শুধু এক জন্মেই তা' শেষ হয় না, সেকি মিথ্যে?'—করুণাময়ীর কথা মনে পড়ে অশ্রু আর রুদ্ধ থাকে না। আকুল অশ্রুজলের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে করযোড়ে বলে, যেন পাই ঠাকুর? আর যেন পেয়ে হারাই না! এমন করিয়া এই সূত্রটুকু ধরিয়া তার দিনের পর দিন কাটিতে থাকে।

শচীকান্তরও দিন কাটে। সারা দিন অফিসের কাজে হাঁফ ছাড়িবারও সে অবসর লয় না। চারিদিকের কর্ম্মোদ্দীপনার মধ্যে সুখ-দুঃখ ডুবাইয়া দিয়া অবিশ্রামে কাজই করিয়া যায়। অবিশ্রাম কলম চালাইয়া তাড়া-বন্দি কাগজ লেখা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যখন উঠিয়া দাঁড়ায়, মাতালের

মত পা টলিতে থাকে। কপালের ঘাম মুছিয়া টমটমে চড়িয়া যখন বাড়ীর দিকে ঘোড়ার রাশটা টানিয়া ধরে, তখন মনের রাশখানাও যেন তেমান করিয়াই সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, পরিশ্রমের সকল ক্লান্তি অপনীত হইয়া হৃদয় যেন উৎসাহের হাওয়ায় তাজা হইয়া উঠে, কোনমতে পথটা কাটাইয়া বাড়ীর যত কাছাকাছি হয় মন আবার সঙ্কুচিত হইতে থাকে। প্রতিদিন নিরাশ হইয়াও প্রত্যহ একবার উপরের ঝিলমিলির দিকে চাহিয়া দেখার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারে না, কিন্তু সেখান হইতে তীব্র ব্যর্থতার লেখা চোখের উপর জ্বলজ্বলিয়া উঠে মাত্র! নীচের ঘরেই কাপড় ছাড়িয়া একখানা আরাম চৌকির উপর হাত পা মেলিয়া শুইয়া পড়ে। তার পর? হায়, তার পর বুঝি আর নাই!—চিন্তা অনুতাপ, আত্মগ্লানি আরও কত কি—তা' কে বলিবে; তবুও অন্তরের গোপন গহ্বরে একটা ক্ষীণ আশা একটু মুগ্ধ প্রতীক্ষা জাগিতে ছাড়ে না, একদিন যে তার নীরব সহিষ্ণুতা কমলার বিমুখী চিত্তকে তার দিকে ফিরাইতে বাধ্য হইবে, এ সম্বন্ধে সে দৃঢ় নিশ্চিত, তবে সে দিন কবে আসিবে? কত দূরে—কত দূরে সেই মধুর ভবিষ্যৎ? হে ঈপ্সিত! হে প্রার্থিত! হে দয়িত! এসো,—এসো,—কাছে এস, আর যে পারি না আমি, আর যে সহে না—প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে মন যে নিত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাকে এইবার আশা দিয়া বাঁচাও, বাঁচাও।

চুয়ান্ন

সেরাত্রে তাল-পল্লবে ঘন মর্ম্মর তুলিয়া ঝড়ের হাওয়া বহিতেছিল। আকাশে ইতস্ততঃ খণ্ড মেঘ অন্ধকারে চলন্ত পর্ব্বতের মত উদ্দেশ্যহীন-ভাবে পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছে। বর্ষণের আয়োজনেই যে তারা ব্যস্ত আছে, তাদের গতি হইতেই তা' জানা যায়। কমলা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া খোলা ছাদে আসিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল। ইতঃস্তত দৃষ্ট পরিম্লান নক্ষত্রের পানে তাদেরই মত নিষ্প্রভ দৃষ্টি উন্নমিত করিল, তারপর একটা ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধকারের দিকে অনির্দ্দেশ্য নেত্রে তাকাইয়া রহিল। অবসাদে চিত্ত প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, বুকের মধ্যে কে যেন নিপীড়িত হইয়া বলিতে থাকে, 'আর যে পারি না,—আর যে পারি না!'—এ প্রবল অস্বীকারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই, সান্ত্বনা নাই, সারা চিত্ত যেন এই আত্মদ্রোহের উত্তপ্ত তাপে তাতিয়া উঠিয়াছে, শরীরও এদের সঙ্গে যোগ দিয়া সমান তালে কহে—"আমিও আর এ ব্যর্থ ভার বহিতে অক্ষম! নিদ্রাহীন কণ্টক শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাই সে মুক্ত আকাশের তলায় জ্বালা জুড়াইতে আসিয়াছে।

কিন্তু অভাগার ভাগ্যর মত অভিশপ্ত বস্তু জগতে দ্বিতীয় নাই। কমলা যে দুইদণ্ড জুড়াইতে আসিল, সেটুকু যেন ভাগ্য-বিধাতার প্রাণে সহিল না, সেই ঘন অন্ধকারের বুক চিরিয়া তার একটা প্রান্তকে দীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ ঊষা-প্রকাশের আলো আকাশ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল নাকি? নিশাচর প্রাণীর মত এ আলোর সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইতে সে সাহস করে না, হয়ত এখনই চোখো-চোখি হইয়া যাইবে। সে ফিরিতে গেল।

কিন্তু—না, এ আলো ত দিবাগমের সুস্মিত সুন্দর স্নিগ্ধলোক নয়! এ যে ঘোর অমঙ্গল বার্ত্তা-বহক বিপদ-নিশানের মত গাঢ় লোলিতাভায় দক্ষিণে পশ্চিমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আতসবাজির মত এর বিচিত্র ফুলঝুরি ঊর্দ্ধে তারকা ফুটাইয়া কেন্দ্রচ্যুত গ্রহাংশের মতই মর্ত্ত্যের দিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। কমলা সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল। ঐ শ্মশান-বহ্নি না জানি এই নিস্মৃতি

মধ্যরাত্রে কত দগ্ধ গৃহে চিতাশয্যা সাজাইয়া দিতে আসিয়াছে! ভাবিল যদি সে আজ ঐ ঘরগুলার একখানায় থাকিতে পারিত!

অগ্নি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তার সংহার মূর্ত্তির ভয়ালরূপদৃষ্টে অন্ধকার সভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, বজ্র-শব্দে বড় বড় বাঁশ ফাটিতে ছিল অকস্মাৎ নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া সদ্য জাগরিত ভীত নরনারী, শিশু, পশুর, আর্ত্তরব দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে 'আগুন'—'জল'—'গায় গাব'—রবে ঘুমন্ত প্রকৃতি দারুণ আতঙ্কে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

মানুষের বিরাট দুঃখ উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়া ঝড়ের বাতাস অট্টহাস্যে পুনঃপুনঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমকে একাকার করিয়া দাপা দাপি ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহারই প্রশ্রয় প্রাপ্ত গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মাথা নাড়িয়া প্রলয়ের গর্জ্জন-গান উল্লাসভরে গাহিতে লাগিল। সুষুপ্ত রাজপথ মুহূর্ত্তে বন্যা-তাড়িত জলস্রোতের মতই জনস্রোতে ভরিয়া গেল! কলরব-কোলাহলে সকলেই সেই সর্ব্বনাশিনী অগ্নিক্রীড়া দেখিতে ছুটিয়াছে। সর্ব্বনাশের মধ্যে বোধ করি বা একটা সুতীব্র আনন্দের বিকট স্বাদ আছে! বজ্রধ্বনি মুহুর্মুহুঃ যখন বিদ্যুতের তীব্র আলো ঝলকিয়া উঠে, তখন থরকম্পিত গৃহ মধ্যে ভীত শিশু সভয়ে মাকে জড়াইয়া ধরে কিন্তু সেই ধ্বনির দিকেই পাতিয়া রাখে তার কান। কমলার অন্তরের মধ্যেও যেন নৈশ মৃত্যু-উৎসব তেমনি একটা সর্ব্বনাশী আনন্দের দোলা দিতেছিল! মুগ্ধ পতঙ্গের মত তার মনটা সেই অগ্নি পর্ব্বতের দিকে ক্ষণে ক্ষণে বাহু বিস্তৃত করিয়া ছুটিতে চাহিতেছিল, পিপাসী যেমন শীতল নির্ঝরের পানে তাকাইয়া থাকে—এমনি করিয়াই তার লুব্ধ নেত্র নির্নিমেষে নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

রাজপথে লোকের ভিড় বর্দ্ধিততর হইতেছে, একজন "আগুনের তামাসা" দেখিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেছে, যাত্রীর দল তাহার নিকট সংবাদ চাহিলে সে ঔদাস্যের সহিত কহিল—"বাজারের প্রায় সকল ঘরেই আগুন ধরেছে—কোথাও দেবতার অকৃপা নেই!" আরও একটা খবর সে দিয়া গেল—যার নির্ঘাত ধ্বনি কমলাকেও বিঁধিতে ছাড়িল না'—সে শুনিল, ওরই ভিতর এক দ্বিতল গৃহে ডাক্তার বাবুর নব-প্রসূত শিশু ও শিশু-জননী অগ্নিবেষ্টিত।—

গৃহস্বামী গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছেন, দাস-দাসীরা কে' কোথায় কে বলিবে? কাঠের সিঁড়ি জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে,—এতক্ষণে হয় ত ভস্ম হইয়া গেল! অপরজন আকুল কণ্ঠে কহিল—অসহায়া জননীর আর্ত্তধ্বনি চারিদিকের তুমুল শব্দ ডুবিয়েও শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, শিশুকে বুকে নিয়ে ঘরে ঘরে বেড়াচ্ছেন।—আর কেঁদে কেঁদে বলছেন—"আমার ছেলেটীকে বাঁচাও গো, বাঁচাও। কিন্তু কার এত সাহস আছে যে, ঐ আগুনের মধ্যে ঢুকে ওদের বাঁচাতে ছুটবে!" আহারে অবোলা জীব—আর একটা মেয়েমানুষ!"

কমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। পুত্রস্নেহাতুরা মায়ের আকুল আর্ত্তনাদ যেন তার দুই কর্ণে বজ্র-গর্জ্জনের মত বাজিয়া উঠিল—এদের রক্ষা করার কেউ কি এ দেশে নেই?—ওগো, কেউ কি ওদের বাঁচাতে চেষ্টাও কর্বে না?—অগ্নি ও বায়ুর আস্ফালন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। শূন্যবৎ ছুটিয়া গিয়া সে শচীকান্তের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল। তার তখন কোন কথাই মনে ছিল না, শুধু সেই অগ্নিবেষ্টিত গৃহে শিশু-বক্ষা জননীর মর্ম্মবিদরী যন্ত্রণা তার নারী-চিত্তকে করুণার প্লাবনে প্লাবিত করিতেছে। প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণে অকস্মাৎ জমাট-বাঁধা বরফের স্তূপ গলিয়া যেন মন্দাকিনীর ধারা বহিয়াছে! সে যে চিরদিনই আর্ত্তের দুঃখে প্রাণের উত্তপ্ত সহানুভূতি ঢালিয়া দিতেই অভ্যস্থ ছিল এ নহিলে কি করালীচরণের বাড়ী তিষ্ঠিতে পারিত? আজ তার সর্ব্বহারা এই স্বভাবজাত মমতা তো ভুলিতে পারে না। এ যে সহজাত জন্মান্তরের ধন—নিজের রচিত তো নয়, ইচ্ছামত জমা-খরচ করিবে!

শব্দহীন রুদ্ধকক্ষে অতল অন্ধকারের আশ্রয়ে শচীকান্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল। শান্তিহীনের পরমারাধ্যা নিদ্রাদেবী তাহাকে মায়ের মতই গভীর স্নেহে কোলে লইয়া আরামে শুইয়া আছেন। সুখস্বপ্নের আভাষে অধর প্রান্ত ঈষৎ হাস্যে বিকশিত। এমন আরামে সে বুঝি রত্নপুকুর হইতে আসিয়া একদিনও ঘুমায় নাই! সে তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল কল্পনালোকের।

আকস্মিক উত্তেজনা বশে কমলা যখন ঘরের দ্বার ঠেলিয়া স্বহস্তঘাতী আত্মার মত এর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন একেবারে অর্দ্ধ অন্ধকারে সে

ঘরের দৃশ্য তার চক্ষে মৃত্যুপুরীর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ অদূরে মরণের যে নিষ্করুণ নির্দ্দয় ভেরী সঘনে বাজিয়া উঠিতেছে, সেই কম্পিত আর্ত্তরব যে বিশ্বজগৎকে ছাপাইয়া উঠে, এতক্ষণে অসহায়া জননীও সদ্যজাত ক্ষুদ্র শিশু হয়ত জ্বলিয়া গেল! কমলার সর্ব্বশরীরে আগুনের শিখা যেন তাহাকে লেহন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া শয্যা শায়িত শচীকান্তর নিকট ছুটিয়া আসিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"শোন!" আবার ডাকিল—"ওঠো।" নিদ্রিত তখন বড় সুখে বিভোর ছিল। স্বপ্নে সে অপ্সরা-সেবিত নন্দনের চারু উপবনে দাঁড়াইয়া। অদূরে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র শোভা, পারিজাতের অপূর্ব্ব গন্ধ সম্ভার! কিন্নর ললিত রাগিণীতে চিরবসন্তের বন্দনাগান—সার্থক—প্রেমের পুলক আকাশে বাতাসে স্বর্ণসলিল-কম্পিত নদী বক্ষে এবং শচীকান্তর সর্ব্বশরীরে মৃদু শিহরণ আনিতেছে, মুগ্ধ চিত্তে প্রীতিবিহ্বল নেত্রে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল—উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ—ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না, এমন সময় কোথা হইতে অপূর্ব্ব সুরে যেন কোন্ নারী কণ্ঠের মধুর আহ্বান তার কর্ণকুহরে সমস্ত সঙ্গীতের তাল-মান খর্ব্ব করিয়া দিয়া ঝঙ্কৃত হইল। পুলক-স্পন্দিত বক্ষে সে শুনিল—দিব্যাঙ্গনা বলিতেছে—"এসো, আমি দ্বার খুলে দিচ্ছি!"—চকিতে ঘুম ভাঙা চোখে চাহিয়া দেখিল—সে দিব্যাঙ্গনা কমলা! ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুক্ত দ্বার পথে সেই সর্ব্বনাশা আলোর আভাস আসিয়া বাজিয়াছে। তার বাহু ঠেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিতেছে—"ওঠো—ওঠো শোন—একবার শোন!"

ও'কে কা'কে ডাকে? এ কার কণ্ঠ স্বর?—চোখ মুছিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সে অস্ফুট আলোকে চাহিয়া দেখিল—অমরালয় হইতে কোন দেবকন্যা এই অন্ধকার মর্ত্ত্যগৃহে আবির্ভূতা হ'ন নাই তবে আসিয়াছে সে তদপেক্ষাও অপ্রত্যাশিত, যে সে! বিস্ময়ে রুদ্ধ কণ্ঠে মৃদু উচ্চারণ করিল—"কমলা!"

কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে অধীরতর হইয়া উঠিতেছিল, পলে পলে মৃত্যুর রুদ্র হস্ত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সময় নাই সময় নাই—তাহাদের মধ্যকার পাশ সে শিথিল করিয়া দিয়াছে। সে আকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"হ্যাঁ—আমি কমলা—ওদের তুমি রক্ষা কর।"

শচীকান্ত বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বসিল—"কাদের ? কাদের আমি রক্ষা করব, কমলা ?"

কমলা জানালার নিকট ছুটিয়া গিয়া সশব্দে তার কপাট খুলিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল নেত্রে বাহিরে চাহিল, অন্ধকার ঘর মুহূর্ত্তে দিবালোকিতবৎ তীব্র আলোক ছটায় ভরিয়া উঠিল। শচীকান্ত ইতিমধ্যে উঠিয়া আসিয়া জানালার নিকট কমলার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। অগ্নি-পর্ব্বতের ভয়াল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া কহিয়া উঠিল—"বাজারে আগুন লেগেছে !"

কমলা তার কম্পিত অধরের মধ্যে হইতে আর্ত্ত স্বরে কহিয়া উঠিল—"ওই আগুনে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাঁর ছেলে নিয়ে উপরের ঘরে আছেন—ডাক্তার বাবু বাড়ী নেই। তাদের কি বাঁচানো যায় না ?"

শচীকান্ত অগ্নির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল, কহিল—"সম্ভব হবে না।" বায়ু ঘোর রোলে গর্জ্জিতেছিল অগ্নি যেন সাগর-তরঙ্গের মত লহরে লহরে গর্জ্জিয়া উর্দ্ধ পথে ছুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। কমলার বক্ষ-শোণিত স্তব্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধশ্বাসে সে তার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী শচীকান্তর একখানা হাত সবলে দুহাতে চাপিয়া ধরিল এক নিশ্বাসে কহিল—"তুমি ওদের বাঁচাও, ওদের বাঁচাও, বাঁচাও !"

এই যে ব্যাকুল আবেদনের নির্ভরতা-পূর্ণ আত্মনিবেদন, ইহার যে কত বড় তাড়িৎ শক্তি, সে শুধু সেই লাঞ্ছিত পীড়িত অবমানিত হৃদয়ই জানে। ব্যথা জড়তায় যে চিত্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুমূর্ষুর মত শীতল গৃহকোণের শয্যায় লুটাইয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছে, সেই অস্তের মুমূর্ষু সূর্য্যে যেন উদয়ের প্রদীপ আলোচ্ছটা আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নেত্রে সে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় কমলার দিকে ফিরিল। তার শরীরে পলকে বিদ্যুৎ শিখা খেলিয়া গেল, এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—"তুমি যখন আদেশ করেছ, তখন আমি নিশ্চয়ই যাবো—কমলা ! যে অধিকার এক মুহূর্ত্তের জন্যও গ্রহণ করেছ, যে দাবী এক নিমেষের জন্যও তোমার মনে আমার কথা জাগিয়ে দিয়েছে, সে অধিকার আমি প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে চেষ্টা

করবো বৈ কি।” তার কণ্ঠ স্বর সঘনে কম্পিত হইতেছিল। একটা উদ্দাম পুলকে যুদ্ধাভিমুখী বীরের স্থায় তার সারা চিত্ত নাচিয়া উঠিতেছিল, ওঃ কি আনন্দ! আজ এই নৈশ-নরমেধ-যজ্ঞে এ'কি আনন্দ! মৃত্যুর এই আকস্মিক আহ্বানে আজ কি বিপুল গৌরব, কি অসীম তৃপ্তি! সে সেই দহনের আলো দিয়া পূর্ণনেত্রে অকথ্য ভয়ে বিবর্ণ কমলার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। কমলাও সেই সময় অগ্নিরাশি সহিতে অসমর্থ চক্ষু সরাইয়া আনিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিল—চারি চক্ষে এতদিনে মিলিত হইল। শচীকান্তর হস্ত ত্যাগ করিয়া মিনতি পূর্ণ আদেশের স্বরে আকুল হইয়া কহিল—“তবে এখনি যাও।”

“যাই কমলা।” শচীকান্ত কমলার মুখের উপর হইতে অতৃপ্ত দৃষ্টি সবলে ছিনাইয়া, আনিল। একটা সুগভীর আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রাখিয়াই নিজেকে সে সবলে টানিয়া সরাইয়া লইল। না—ছিন্ন পক্ষ ভীত পক্ষী আশ্রয় বোধে যখন তার বক্ষ-নীড়ে উড়িয়া আসিয়াছে, তখন তাহাকে পিঁজরায় পুরিবার কথা মনের কোণে আনাও কাপুরুষতা। সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। “কমলা! একটা কথা—হয় ত এই আমার শেষ কথা—তোমায় বলে যেতে চাই—” শচীকান্ত কমলার দিকে আবার দুই পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তার সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইল—“আমি যাচ্চি—তুমি যাদের বাঁচাতে আদেশ দিয়েছ, তাদের রক্ষা করবার জন্য ঐ আগুনের মধ্যে ঢুকতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবো না জেনে রেখো—তবু যদি না পারি—ক্ষমা করো।—এই যে যাচ্চি, হয় ত ফিরে আর না'ও আসতে পারি, যদি আসি ফুরিয়ে গেল—কিছুই আমার বলবার নেই—কিন্তু যদি না আসি, যদি এই-ই আমাদের মধ্যের শেষ হয়—আমায় একটু দয়ার সঙ্গে বিচার করো। ঐ বেড়া-আগুনের লোকেদের জন্যে তোমার প্রাণে যে অসীম করুণা রয়েছে তারই একটি বিন্দু আমার জন্যে খরচ করো—মনে করো—আমি যা'করেচি, সব তোমারই জন্যে—তোমায় অত্যন্ত ভালবেসে—তোমায় আমারই বাগ্‌দত্তা পত্নী মনে করে। তোমায় ভাল না বাসলে আজ আমার এত বড় দুর্দ্দশা হতো না।—তুমি আমার নও—আমার হবে না জানলে, এ পাপ আমি কর্‌তুম না—বোঝবার ভুলই আমার একমাত্র পাপ।

আর একটা কথা বলে যাই, আমার দেবতুল্য পিতাকে না চিনে তাঁর পথ না ধরেই আমার এই অবস্থা। যদি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয় বলো—তাঁকে আমি চিনতে পারিনি। "আর তুমি"—অদূরে ভীষণ রবে গৃহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইল—অগ্নি গর্জ্জিল, হু-হু-হু!—শচীকান্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কমলার শরীরে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল—অর্থাৎ তার বোধ-শক্তি স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল প্রথমেই তার মনে হইল, এ গৃহে সে কোন্ অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে? এ গৃহের অধিকারী নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল, তাহাকে কিসের অধিকারে সে ডাকিয়া তুলিয়া কঠিন কণ্ঠে মৃত্যু-গহনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ঠেলিয়া পাঠাইল? এ ক্ষমতা তাহাকে কে দিয়াছে? কেন সে এমন কাজ করিল?—যাহাকে এ পর্য্যন্ত নেত্রেঙ্গিতের এতটুকু কম্পনেও বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন সে করে নাই, যার সাজানো অর্ঘ্য দু'পা দিয়া ঘৃণায় সে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, তার জীবনের উপর এত বড় দাবী আসিল কোথা হইতে? একটা সম্বন্ধের দাবী পর্য্যন্ত যার সঙ্গে সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, তাহাকেই অনায়াসে নিতান্ত আপনার জনের মত মৃত্যুপণে বিদায় দিল! এ সে কি করিল?—কেন এমন কাজ করিল?—কেন, কেন, কেন করিল? দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ডাকিল—"যেয়ো না—যেও না—ফিরে এসো, শুনে যাও!—" কিন্তু হায়! কাহাকে এ বৃথা আহ্বান? বহির্দ্বারের কপাট সজোরে বন্ধ হইবার শব্দ শুনিল মাত্র! জনহীন গৃহ উচ্চ গভীর নাদে প্রতিধ্বনি করিল—"ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে—"

কমলা পাগলের মত খোলা ছাদে ছুটিয়া গেল। এখনও হয় ত সে তাহাকে ফিরাইতে পাবে! স্পন্দিত নর্ত্তিত আলোকে দূরে চঞ্চল-গতি চলমান মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, বৃথা ডাকা—ফিরাইবার আর উপায় নাই!

সে আবার সেই ঘরেই ফিরিয়া আসিল—পরক্ষণে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল—বহির্দ্বার খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল—ছুটিয়া গিয়া সে তাহাকে ফিরাইবে!—পরক্ষণে এ চেষ্টা বাতুলের চেষ্টা মাত্র বুঝিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। জানালায় দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ লোচনে কিছুক্ষণ সেই ভীষণ অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। স্বেদজলে অঙ্গ বস্ত্র ভিজিয়া গেল। সবেগে ভূমে বসিয়া

পড়িয়া অধীর উচ্ছ্বাসে সে কহিয়া উঠিল—"ওকে ফিরিয়ে আনো আনো, ওগো ঠাকুর—ফিরিয়ে আনো!"

সারারাত্রি প্রবল বেগে ঝড় বহিল। প্রকাণ্ড তালগাছের প্রকাণ্ড মাথা সে-বাতাসে খসিয়া পড়িল। অদূরে অগ্নির প্রলঙ্কর মূর্ত্তি আরো ভীষণতর রূপ ধারণ করিল। ঝড়েরও শেষ নাই! আকাশে সাঁ সাঁ করিয়া মেঘের দল ছুটিয়া চলিয়াছে, ধ্বংসালোকের পশ্চাতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ভীষণাকৃতি যমদূত সংবের মত উদ্যত দণ্ডে দাঁড়াইয়াছে, যেন কাহার সঙ্কেতের মাত্র প্রতীক্ষা করিতেছে—আদেশ পাইলেই সৃষ্টি নাশে উদ্যত হইবে। কমলার বুকের মধ্যেও এমনই প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল, আগুনের হল্কা এমনি বেগে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তার চারিদিকে প্রবলবেগে ভূমিকম্প হইতেছিল, আর্ত্তস্বরে তার সারা প্রাণ কাঁদিয়া বলিল—"এ আমি কি করেছি—এ' আমি কি করেছি!"

ভোরের আলো না ফুটিতে চলন্ত মেঘ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আকাশ পথের কোনখানেই এতটুকু ফাঁক ছিল না, বজ্র বিদ্যুৎবাহিনী মেঘ পর্ব্বত দীর্ণ করিয়া দেখিতে দেখিতে ধরণী বক্ষে মূষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। উর্দ্ধ-শির অগ্নি আহত অজগরের ন্যায় মাথা নত করিল, ধূমরাশি সবেগে আকাশের মেঘে মিশিতে ছুটিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে—বাতাসের আকুল আর্ত্তনাদও যেন কোন যন্ত্রণা-কাতর চিত্তের গুমরিয়া ওঠা কান্নার মতই হা-হা করিয়া উঠিতে লাগিল। সহৃদয় দর্শকের অশ্রুধারা যেন অশ্রান্ত বর্ষণের আকারে পৃথিবীর তপ্ত গণ্ডে ঝরিতে লাগিল, কাল এই বর্ষণের কিছুটা পাইলে হয় ত কত রক্ষাই পাইত, কত হতভাগ্য গৃহহীন হইত না—সময়ে সহানুভূতিলাভ বড় একটা ঘটে না, নির্ব্বাণ দীপে তৈল নিষেকই হয়!

ঝিয়ের সঙ্গে রাঁধুনীর কোন্দল বাধিয়াছে, ভৃত্য মধ্যস্থতা করিতে গিয়া গালি খাইয়া তাহা প্রত্যর্পণের চেষ্টায় কোলাহল বর্দ্ধিততর করিতেছিল—কার যেন পদ-শব্দশু নিয়া সকলেই এক সঙ্গে চুপ করিল, কমলার বক্ষ-শোণিতও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হইয়া গেল, এইবার কি সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে?—কিন্তু উঠিতে গিয়া পা' তো আজ আর উঠিল না! গতরাত্রের ঘটনা একটা বিরাট

তার সর্ব্বশরীরকে এই ঘরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া আছে। এখান তার নড়িবার শক্তি কে' যেন হরণ করিয়া লইয়াছে!—হয় ত এতক্ষণ সে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে,—দালান পার হইল—এইবার হয়ত এই ঘরেই প্রবিষ্ট হইবে—এখনই হয়ত—হয়ত—শুনিবে—"কমলা আমি ফিরে এলাম!"

সে এখন কি করিবে—সে এখন করিবে কি? সেকি বলিবে—"তুমি যাও!—কেন তুমি ফিরে এলে?—তুমি যাও—যাও!"—যদি সে তেমনই করিয়া আজও বলিতে আসে—"আমার কমল!" উদ্যত রোষে বজ্র হানিয়া আজও কি সে বলিবে—"তুমি আমার কেউ নও!"—কিন্তু কেমন করিয়া আজ সে কথা বলা চলে? হে হরি! এ'কি হ'ল?

কেহ সে কক্ষে প্রবেশ করিল না। কেবল জল স্থল কম্পিত করিয়া বারেক বজ্র হাঁকিয়া উঠিল—বিদ্যুতের লোলজিহ্বা লেলিহান হইয়া আকাশের বক্ষটাকে দীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল, বায়ু ঘোর রোলে কাঁদিয়া উঠিয়া শোকের নিশ্বাস মুহুর্ম্মুহুঃ পরিত্যাগ করিল, বলিল—"হায়! হায়! হায়!"

ঐ না কে যেন সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতেছে! পাশের ঘরে ঐ না কে' দাঁড়াইয়া!—এখনই ত এই ঘরেই ঢুকিবে!—স্বেদজলে কমলার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেল। হৃৎপিণ্ড দম ফুরানো ঘড়ির মতই চলিতে গিয়া চলিল না। প্রাণবায়ু এই চাপে রুদ্ধ হইয়া যাইবে নাকি? ঘরে কেহই প্রবেশ করিল না। খোলা দরজার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র সেই কক্ষ দেখা যাইতেছে, আনলায় ঝুলানো সার্ট, কোট, প্যাণ্ট, কলার, টাই বাতাসে ফুলিয়া দুলিয়া স্থানচ্যুত হইতেছে। উহাদের মধ্য হইতে একটা অস্ফুট চামেলি গন্ধ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এ ঘরেও আসিতেছে! কমলা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

নীচে একসঙ্গে বহু লোকের জুতার শব্দ শুনা গেল—কমলা চমকিয়া উঠিয়া পড়িল—এবার নিশ্চয় সে ফিরিয়া আসিয়াছে! এবার আর তার মনের ভ্রান্তি নয়!—সে একবার অসহায় নেত্রে লোহার-শিক ঘেরা জানালার দিকে চাহিল, পাশের ঘরের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল—আবার তখনি কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—সম্মুখে চাহিতে তার সাহস ছিল না, যে কোন মুহূর্ত্তে সেখান দিয়া কেহ প্রবেশ করিয়া ডাকিয়া উঠিবে—"কমল! আমার কমল!"—

মানুষ যখন জলে পড়িয়া অতলে তলাইতে থাকে, ক্বচিৎ একটা বিপরীত ঢেউ আসিয়া তার চেষ্টাহীন সল্পসংজ্ঞ দেহকে ধাক্কা দিয়া পাতালের দিক হইতে মর্ত্ত্যের পানে বারেক ঠেলিয়া দেয়, কিন্তু প্রকৃতির সে চেষ্টা তা'র একটা ক্ষণিকের খেলা মাত্র—ক্ষণপরে নিমজ্জমান অভাগা আলোকময়ী পৃথিবীব বক্ষে নয়, অন্ধ তামস জলতলেই স্বাভাবিক ক্রমে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

নীচের উত্তেজনাপূর্ণ বিলাপধ্বনি কমলার নিশ্চল বক্ষ-শোণিতে বারেকের জন্য সেইরূপই একটা তরঙ্গ তুলিল। চকিত-উদ্বেগে শুনিল—"ওরে বাবারে! এ কি সর্ব্বনেশে কথাবে অ্যাঁ! ওঁরা এ কি বলচে!" সে—কী কথা?—কে' কী বলিতেছে?—কমলার মনে হইল—যেন সে ধীরে ধীরে আবার কোন্ অতলে তলাইয়া যাইতেছে!

"মাইজি!"—নিঝুম কমলা কপাটের অবলম্বন ছাড়িয়া এই সসঙ্কোচ আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া চোখ তুলিল। বিষণ্ণ মুখে এবাড়ীর আর্দ্দালিটা যুক্তকরে দাঁড়াইয়া।—সে সাশ্রুনেত্র নত করিয়া তেমনি সঙ্কুচিত স্বরে কহিল—"গাড়ি খাড়া রয়েছে—আপিকে যেতে হোবে মা-জী।"

সে কোন প্রশ্নই করিল না, এতটুকু দ্বিধামাত্র না করিয়া যেমন ছিল তেমনি বেশেই তার অনুগমন করিল। কেমন করিয়া সিঁড়ি নামিল, কখন ঘর দ্বার পার হইল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না—কেন যাইতেছে—কোথা যাইতেছে—তাও জানিল না, ভাবে নাই—ভাবিবার সাধ্যও ছিল না, শক্তিও ছিল না—পরিচালকের পশ্চাতে কলের পুতুলের মত গাড়িতে উঠিল। বাড়ীর ঝিটা সঙ্গে আসিয়াছিল, সে সম্মুখের আসনে বসিয়া অনবরত চোখ মুছিতেছে, বিলাপ-পূর্ণ স্বরে কত কিই যে বকিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কঠিন কণ্ঠে কহিতেছে—"ভ্যালা মেয়ে তুমি—যা হোক বাছা! এক-দিনের তরে এতটুকু যত্ন নেই—আত্তি নেই—অমন যে রাজা স্বোয়ামি,—

তাকে এত হেনস্তা!—ওরে বাপ্‌রে!—এত তাচ্ছুল্যি!—কি করে আগুনের মধ্যে যেতে দিলে গা?—আমরা হলে কখনো পারতুম না।—ধন্যি প্রাণ তোমার যাহোক!"

কমলা শূন্যনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। পথের দুই পাশে শস্যক্ষেত্র জলে ভরিয়া গিয়াছে, রাস্তায় লোক তেমন নাই, জল কাদা ঠেলিয়া ঘোড়া দুইটা অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না, পুনঃ পুনঃ চাবুকের আঘাতে তাদের পরিচালিত করিতে হইতেছিল। অন্য সময়ে সে আঘাত কমলার বক্ষে বাজিত আজ সে জানিতেও পারিল না। গত রাত্রের বিরাট দগ্ধ স্তূপ দিনের আলোয় ভীষণতর মূর্ত্তি ধরিয়াছে, কোথাও গুমিয়া গুমিয়া শস্যের বস্তা তখনও পুড়িতেছিল, কোথাও আবরণের নিম্নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধোঁয়াইয়া উঠিতে চাহিতেছিল, ঊর্দ্ধগামী সর্পের মত ধূমকুণ্ডল ঘুরিতেছিল, এবং সেই বিশাল ধ্বংস প্রাণের মধ্যে বিভীষিকা ও জগতের নশ্বরতার কথা যেন জাগাইয়া তুলিতেছিল। বৈশ্বানরের লীলাক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া বৃষ্টি মাথায় লইয়া অসংখ্য গৃহহীন ও দর্শকের দল কোলাহল করিতেছে—হাহাকার করিতেছে—ভাগ্য—ভগবান ও অজ্ঞাত অগ্নিসংযোগ-কর্ত্তাকে অভিসম্পাত করিতেছে।—প্রকৃতি বৃষ্টি ঢালিয়া নিজে রক্ষা করিয়াছেন, তা-ভিন্ন মানুষের হাত একখানি পাটের বা চালের বস্তা সরাইয়াও তো সে রাত্রে উপকার করে নাই; জনতা করিয়া মজা দেখিতেই আসিয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা—"একা আমি কি কর্‌বো?"

অনেক পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ি আসিয়া একখানা বড় বাড়ীর গাড়ি-বারান্দায় থামিল। বাড়ীখানা গৃহস্থ বাড়ী নয় তার আকারে এবং প্রকারেই তা' বুঝা যায়। দ্বারের নিকট দু তিনজন পুলিশ এবং সাধারণ লোক বিষণ্ণভাবে কি কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল, তারা কমলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। সকলের কণ্ঠ হইতে যেন একটা প্রবল সহানুভূতিপূর্ণ গভীর নিশ্বাস এক-সঙ্গেই বহির্গত হইল। কমলা কোন দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া পথ-প্রদর্শকের অনুসরণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া দ্বারের পিতলের বাঘমুখো হাতলটার দিকে চোখ পড়িতে অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল। ব্যাঘ্র-নেত্রের মত দুর্ভেদ্য দৃষ্টিতে যেন তারই দিকে তারা জ্বলন্ত ভর্ৎসনা ভরা চক্ষে চাহিয়া আছে! তখনি অনুভব করিল কে' তাকে ভিতরে টানিতেছে, সে

থামিতে পারিল না। ভিতরে সাড়া-শব্দ নাই! সে একটা কোন শব্দ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া অপেক্ষা করিল, ঐ প্রেতপুরীর মত বাড়ীটা একটা আর্ত্ত বিলাপে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। সে ভিতরে প্রবেশ করিল। কোথা দিয়া কোথায় আসিল অনুভব করিতেও পারিল না, কিন্তু ছোট ছোট খাটে শয্যা শায়িত লোকদের মধ্য দিয়া কয়েকটা ঘর সে অতিক্রম করিতেছে এইটুকু বুঝিতে পারিল। সম্মুখের দ্বার অর্দ্ধমুক্ত ছিল, তার সঙ্গী আর্দ্দালি সেটা খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল—যন্ত্রচালিত কমলা নিঃশব্দ পদে ঘরে ঢুকিল। একটা প্রশস্ত হলঘর, সে ঘরে অনেক লোক, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা চৌকিতে বসিয়াছিল, কমলা প্রবেশ করিতেই সকলে তার দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। একজন সাহেব লোহার খাটের নিকটে চৌকিতে বসিয়া ঝুঁকিয়া খট্টা-শায়িত ব্যক্তির দিকে চাহিয়াছিলেন—আরেকজন একটু দূরে একটা কেদারা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তিনিও ইউরোপীয়। দুজনেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া নত মস্তকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে কমলাকে অভিবাদন করিলেন। কমলা কোন দিকে না চাহিয়া যথাপূর্ব্ব ধীরপদে অগ্রসর হইতে থাকিল।

হাসপাতালের রোগীদের অন্যতমরূপে ও'কে এখানে পড়িয়া—কে'ও?—কমলা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শায়িতের পানে চাহিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিল।

—রোগীর যন্ত্রণার সীমা ছিল না—বাহ্যজ্ঞান তো নাই, অন্তর্জ্ঞানও লুপ্ত-প্রায়। অবর্ণনীয় যাতনার অব্যক্ত সে ধ্বনি পাষাণকেও বোধ করি বিগলিত করিয়া দেয়।—চিকিৎসক, পুলিশ কর্ম্মচারী, শুশ্রূষাকারী সকলের পক্ষেই এ দৃশ্য অসহনীয়।

সহসা রোগী সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল, দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া দৃষ্টিহীন নেত্র দুটী বিস্ফারিত করিতে গেল, নিদারুণ যন্ত্রণা-ধ্বনি কণ্ঠ ভেদ করিয়া ঘরের স্তব্ধতাকে সহসা এমনি একটা আকুল আঘাত করিল যে, অকস্মাৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোল হইতে টুপিটা গৃহতলে সশব্দে পড়িয়া গেল। কমলার শরীরের প্রতি শিরার মধ্য দিয়া একটা বরফের শীতধারা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া

বহিয়া গিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দিল—সে অবসন্নতায় সবেগে বসিয়া পড়িয়া খাটের গায়ে মাথা রাখিল।

রোগীর শরীরের স্পন্দন ক্রমেই স্থির হইতে স্থিরতর হইয়া আসিতেছিল। নিশ্বাসের দ্রুত তাল ধীরে ধীরে মৃদু ও বিলম্বিত হইল—অকস্মাৎ সেইক্ষণে শব্দহীন কণ্ঠ পরিষ্কার স্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল!—"বল কমলা বলো, আমি পাপী নই?—বল—আমায় তুমি ক্ষমা করেছ?"—

ডাক্তার বাবু মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন—চেয়ার সরাইয়া সিবিল সার্জ্জন একটু হঠিয়া গেলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুপি কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কমলা মুখের উপর হইতে হাত সরাইয়া যে ব্যক্তি তার সম্মুখে নিস্পন্দ নিঃসাড় পড়িয়া আছে—তারই বিভীষিকা পূর্ণ শোচনীয় মুখের দিকে চাহিল। সমস্ত পৃথিবী—জীবনের সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিচিত্র ঘটনা-জাল—সমস্তই তার মন হইতে এককালে পুরাতন চিত্রের মতই নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল তার মনে আছে—এই অনাদৃত হতভাগ্য তার অসঙ্গত অনুরোধে নিজের আশা-উদ্দীপ্ত নবীন জীবন উৎসর্গ করিয়াছে! তার শব-শুভ্র মৌন অধর কোনও ধ্বনি মাত্র উচ্চারণ করিল না—কিন্তু তার অন্তঃস্থল হইতে গভীর অনুতপ্ত চিত্ত এমন কোন ক্ষমার কথা সেই সদ্যোবিমুক্ত প্রাণের উদ্দেশ্যে কি প্রেরণ করিতে পারিয়াছিল, যাহা অন্য কোন জাগরিত কর্ণ না শুনিতে পাইলেও তাহার নিকটে পৌঁছিতে বাধা পায় নাই—এবং তার সমুদয় সংশয়াকুল উদ্বেগ দূরে ঠেলিয়া দিয়া উহা তাহাকে যে প্রশান্ত শান্তি প্রদান করিয়াছিল—সেই পরিত্যক্ত দগ্ধ দেহেও তাহারই চিহ্ন যেন সেইক্ষণেই প্রকটিত হইয়া উঠিল।

সাতান্ন

একটা মানুষে কত বড় বড় দুঃখের চাপের ভিতর পড়িয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে কমলার সারা জীবন ধরিয়াই যেন এই পরীক্ষাই চলিতেছে। দুঃখ—যেমন তেমন নয়, তীব্রতম দুঃখই সে আজন্ম ভোগ করিয়া আসিয়াছে। দৈন্য বিয়োগ অপমান এ সবই পূর্ণ মূর্ত্তিতে তাহাকে কুক্ষিগত করিতে ছাড়ে নাই, আজ আবার তার অদৃষ্ট আরও এক মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার নিকট প্রকটিত হইল। কিন্তু সেই সকল সংহার মূর্ত্তির প্রলয় পূর্ব্বেকার বিষাণ-শব্দিত উন্মত্ত তাণ্ডবের চেয়েও এ-রূপ যেন আরও ভয়ঙ্কর! সকল দুঃখের অন্ধকারেই একটু না একটু জোনাকির আলোর মত ক্ষীণ চঞ্চল আলোটুকুও না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না—আজিকার এ যে মহাপ্রলয়ের পরবর্ত্তীকার নৈশব্দ ও নিরালোক শূন্যতা, এর যেন কোথাও সীমা নাই।

যে ডাক্তারের স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে শচীকান্ত প্রাণ দিল, তাঁহার গৃহে কমলার সেবা-সান্ত্বনার কোনই অভাব ছিল না। সে গৃহের গৃহিণী সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাকে বড় বোনের স্নেহ দিয়া কোলে টানিতেছিলেন, কিন্তু কমলার ইহাতে কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি? কিসেরই বা সান্ত্বনা? যখন তার বাড়ীর দাসী আসিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহাকে বিধবার বেশ পরাইয়া দিল, তখন অন্তরের মধ্যে তার একবারের জন্য ঘোরতর বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাধা সে দেয় নাই। কার জন্য আজ সে বৈধব্য গ্রহণ করিবে? যাকে সে তার স্বামী বলিয়া স্বীকার পর্য্যন্ত করে নাই, না অন্তরে না বাহিরে—তাহারই জন্য। কিন্তু এত বড় একটা প্রচণ্ড অস্বীকার করিবার মত মনোবলই বা আজ তার কোথায়?—তাহারই ওই মৃত্যু পণ রক্ষা করিয়া সে যেন তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হইয়া চলিয়া গেল। ইহলোক ত ফুরাইয়াছে তার বহু পূর্ব্বেই এবার পরলোকও সেই সঙ্গে ফুরাইল!

আত্মসুখী, স্বার্থপর মানুষের মধ্যে যে কত বড় এক ত্যাগশীল তপস্বীর প্রাণ লুকানো ছিল—সে বস্তুকে বস্তুতঃ কেহ কোনদিনই খুঁজিয়া দেখে নাই। বাহিরে বস্তুতান্ত্রিকতার উপাসকরূপেই দেখিয়াছে, হুতাশন-ভক্ষিত দগ্ধ-দেহের সেই মহা অধিকারীকে হঠাৎ সে আজ মুখমুখি দেখিতে পাইল।—রত্নাকরে পরিণত বাল্মীকিব মতই যেন সে এক অমৃতময় প্রেমেব স্পর্শে স্বার্থত্যাগী আত্মত্যাগী মহানুভবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিল। ভিতরেবও পূত পৈত্রিক রক্তধারা প্রবল হইয়া না উঠিলে এত বড় সাধ্য ক'জনের হইতে পারে? এমন একটি জীবন এমন নিষ্ঠুর ভাবে এই কর্ম্মময় জগৎ হইতে চলিয়া গেল, আর সেই তাব নিমিত্ত এ ভাবিয়া বানাহত বিহঙ্গীর মতই আর্ত্ত প্রাণ তার লুটাইতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাক্তারবাবু স্ত্রীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, কমলা এখন কোথায় থাকিতে চায়? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সবকারের তরফ হইতে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বস্ত উচ্চ কর্ম্মচারীর বিধবার যাবজ্জীবন ভরণপোষণ ভার বহিতে প্রস্তুত। এই অল্পদিনেই শচীকান্ত যে কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ। তার উপর এই সাক্ষাৎ মৃত্যু জানিয়াও পরপ্রাণ রক্ষার জন্য দাবাগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়া এর ত কথাই নাই। কমলা সেই অর্থ লইয়া আত্মীয়-গৃহে কিম্বা যথেচ্ছ স্থানে বাস করিতে পারে। কমলাকে কথাটা বাবে বারে বলিতে হইল, মনটা তার এমনই শূন্য হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের রূপ রস শব্দ-স্পর্শ কিছুই যেন সেখানে গিয়া সহজে পৌঁছায় না। শুনিয়া সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল—"না।"—ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"এ'তো মা, তোমার জোরের টাকা কেন নেবে না? সংসার বড় বিষম ঠাঁই মা, নিজের নিজস্ব করে কিছু থাকা তো ভাল—চারটে কাল এখন ত তোমায় কাটাতে হবে।" কথাটা সে হয়ত শুনিল না, শুনিলেও, তার কিছুই মর্ম্ম বুঝিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার জানাইল। তার মন প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়া বলিল, জীবনে যার কোন সম্বন্ধই স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই তার জীবনের মূল্য লইবে সে তারই বিধবা সাজিয়া!—না। ডাক্তার বাবু বা তাঁর স্ত্রী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও বেশী কিছু

আর বলিতে সাহস করিলেন না—পাছে সে মনে করে ইহারা তাহাকে ভার বোধ করিতেছে।

এমন করিয়া কিছু দিন গত হইলে একদিন অতর্কিতে আপনা আপনি তার মনে হইল, কাজটা বড় ভাল হইতেছে না। তাহাকে লইয়া এই গৃহস্থ দম্পতি একান্ত বিব্রত হইয়া আছে। সে তাদের কে, যে এমন করিয়া এদের ঘাড়ে চড়িয়া থাকে? গৃহিণী গৃহকর্ম্মের অবসরে কাছে আসিয়া বসেন, দুই-একটা দুঃখের কথা পাড়েন, মৃতের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অশ্রু প্রেরণ করেন, আবার চোখের জল মুছিয়া কর্ম্মান্তরে উঠিয়া যান। কমলা কেবল অর্থহীন দৃষ্টিতে একটা দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে—সে যেন কিছুই ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারে না। একমাত্র এই বিভীষিকার ছায়া সেই শূন্যতলে নগ্ন প্রেতের মত নাচিয়া নাচিয়া বলিয়া বেড়ায়, তার সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

অথচ কেন গেল? কি করিয়া গেল? ইহারও স্পষ্ট অনুভূতি তার মনের মধ্যে নাই। মনে বল থাকিলে বিচার-শক্তিও সজাগ থাকে, কিন্তু মন বিকল হইয়া গেলে অন্তর্নিহিত ভীরুতা জড় মানুষের মনকে ভূতগ্রস্ত করিয়া দেয়। তখন মনে হয় কি যেন আবছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, এমনি ধারণা প্রবল হইয়া গা ছম্ ছম্ করে, অথচ পিছন ফিরিয়া দেখিবার সাহস থাকে না।

সেদিন ডাক্তার গৃহিণী আসিলে সহসা বলিয়া ফেলিল—"আমায় নিয়ে আপনারা কি করবেন?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এই প্রথম তার মুখে এতগুলো শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিলেন এবং সেই সঙ্গে তাকে নিজের কথা ভাবিতে দেখিয়া একটু আশ্বস্তও হইলেন। কহিলেন—"কেন মা! আমাদের মা হয়ে এইখানেই থাকবেন।"

কমলা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

"থাকবেন না? বলুন তবে কোথা যাবেন, সেইখানেই আমরা আপনাকে সঙ্গে করে রেখে আসব।"

কোথায় যাইবে?—এ বিশাল বিশ্ব রাজ্যে তার জন্য এতটুকু স্থানই বা কোথায়?—কোথায় যাইবে সে?—বহুক্ষণ পরে—সংশয়জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল "কাশী।"

"কাশী? তা' বেশ—তাই যাবেন। সেখানে কে' আছেন, মা?" উত্তর না পাইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন—"আপনার দাদা মশাই থাকেন বুঝি? তাঁর নাম?—বাসা জানেন ত?"—কমলা এবার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল—"জানি।"

সেই ঘর—সে ঘরে কম্বলাসনে পুস্তক-বেষ্টনী মধ্যে সেই গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিতুল্য লোকটী তেমনি অধ্যাপনা-নিরত। কমলার জীবনে ইতিমধ্যে সঞ্চরণ করিয়া গিয়াছে, স্থিতির—পর প্রলয় ঘটিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর বহির্ভূত শিব-ত্রিশূলস্থিত কাশীধামে কি কালের প্রবেশাধিকার সত্যই নাই? ডাক্তার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন কমলা দ্বারের বাহিরে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনাদি অনন্ত এবং অনাদি সান্ত—ব্রহ্ম ও জীব—চৈতন্যস্বরূপ ও মায়ার বিষয়েই কথা হইতেছিল। ডাক্তার একপাশে বসিয়া থাকিয়া অবসরক্রমে কহিলেন—"আমি আপনার পুত্র স্বর্গীয় ডেপুটি বাবুর স্ত্রীকে এখানে এনেছি" ছাত্রটি চলিয়া গেল। সার্ব্বভৌম মহাশয় ঈষৎ উঠিয়া বসিলেন। তাঁর পুত্র—শচী! স্বর্গীয় সে? তিনি ত সংসারের খবর রাখেন না।

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে শোকপূর্ণ স্বরে সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে একবার উঠিয়া দ্বারের নিকট বর্ত্তিনী কমলার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"ভিতরে আসুন মা।"

কমলা কম্পিত পদে গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া অনতিদূরে বসিয়া পড়িল, প্রণাম করিতেও তার মনে রহিল না। দুরন্ত পূর্ব্বস্মৃতি তরঙ্গস্ফীত সমুদ্র তরঙ্গের-ন্যায় তার মূর্চ্ছিত হৃদয়বেলার উপর মুহুর্মুহুঃ আঘাত হানিতেছিল। প্রলয়াবসানের পর নব সৃষ্টির উন্মেষে উল্কাপিণ্ডদের প্রথম বিশৃঙ্খল বিস্রস্ত জাগরণের ন্যায় কোথা হইতে কি একটা রুদ্র তাণ্ডব অন্তর্জগতে জাগিয়া উঠিতেছে! গৃহ স্তব্ধ গম্ভীর! গম্ভীর নিস্তব্ধ গৃহে কেবলমাত্র বাতাসের অতি মৃদু বিলাপপূর্ণ শ্বাসপ্রশ্বাস মাত্র শুনা যাইতেছে! কমলা অধোমুখে মৃত্তিকালগ্ন নেত্রে

চাহিয়া আছে। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শান্ত ললাটে গভীর চিন্তারেখা দেদীপ্যমান। ডাক্তার বাবু কি বলিয়া বিদায় লইবেন, ভাবিতেছিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে কহিলেন—"আপনাকে আর কি বলবো বাবা! স্ত্রীপুত্রের জীবনদাতা পিতা স্বর্গে চলে গেছেন—মা'কে আমার এখানে রেখে গেলাম—প্রাণটা আমার শ্মশান হয়ে গেছে বাবা! এ হতভাগ্যের জন্যই লক্ষ্মীপ্রতিমা মায়েব আমাব আজ এই অবস্থা! এ কথা তো এ-জন্মে কখনও ভুলতে পারবো না। প্রণাম ঠাকুর!—প্রণাম করি মা!—অপরাধী ছেলে আজ তবে বিদায় নিলে। সুবিধে পেলেই এসে খবর নেবো মা!"

ডাক্তার চলিয়া গেল। শোকের ছায়া যেন নিবিড় করিয়া দিয়া গেল—তাব পায়ের শব্দ কণ্ঠস্বর অস্ফুট কান্নার মতই মুহূর্ত্ত-কাল ঘরের মধ্যে জাগিয়া রহিল।

আবার কতক্ষণ চলিয়া গেল। সহসা কমলা শুনিল—কি অভয় মন্ত্রই যেন শুনিল, "কমলা কাছে এস—বড় দুঃখ পেয়েছ মা!" কমলার মাথাটা নিঃশব্দে সেই পবিচিত পা দুখানাব উপরে নামিয়া আসিয়া সেইখানেই নিঃশব্দে লুটাইয়া পড়িল। এমন একটি স্নেহের স্বর এখনও তার শুনিবার জন্য বাকি ছিল?—তাব কণ্ঠ চিরিয়া আকুল আর্ত্তনাদের মতই মর্ম্মবিদারী ধ্বনি নির্গত হইল—"আমি খুন করে এসেছি—আমি—আমিই খুন করেছি, আমার জন্যে, শুধু আমাব জন্যেই—"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি ধীরে তার মাথার রাশীকৃত রুক্ষ চুলের উপর হাত রাখিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"না মা! তুমি তাকে রক্ষাই করেছ—ক্ষতি করোনি!"

"আপনি এ'কি বল্‌চেন বাবা?" কমলা সবেগে উঠিয়া বসিল। কিন্তু এ কি! সেই সৌম্য সবল মূর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে একি দুর্ব্বল রুগ্ন বৃদ্ধের রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! মুখে সেই শান্তি—চোখে সেই দীপ্তি—তথাপি কি বিষণ্ণ কি ম্লান স মুখ!

"আমিই বলচি মা—তুমি তার ক্ষতি করতে পারোনি!—যে জীবনে অভ্যুদয়ের আশা ছিল না, পতনেরই আশঙ্কা প্রবল তার শেষ যদি ত্যাগের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে, তা'তে কল্যাণ বই অকল্যাণ ঘটে না।"

কমলা আবার তাঁর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা, আমার কি হবে ?"

"তোমার ভাল হবে মা আমার। তুমি আমার কাছেই থাকো মা। সন্তানের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত পিতার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ত্রুটি হবে না মা !"

সস্নেহে তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইলেন, প্রাণখুলিয়া কমলা এত দিন পরে আজ প্রথম আকুল হইয়া কাঁদিল।

আটাশ

"আমার ভাল হবার কি কিছু আছে ?"—একথা কমলা মুখ ফুটিয়া বলিল না বটে, কিন্তু দিনে রাত্রে এই একই আকুল প্রশ্ন তার মনের মধ্যে একই সুরে বাজিতে থাকিল। যার আশা করিবার মত কোথাও বাকি পড়িয়া নাই, তার আবার এ জগতে ভাল কি হইবে ? তথাপি মন যেন একটা কিছু আশা করিতে চাইতেছিল। তীব্র হতাশার অন্ধকারের মধ্য হইতে মন যেন কি করুণ আশ্বাসে বলিতেছিল—তোমার ভাল হইবে—উনি যখন বলেছেন—তখন নিশ্চয়ই হইবে।—উনি দেবজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, ওঁর কথা কি কখন মিথ্যা হয় ?"

দীর্ঘদিন পরে সে আবার নিজস্ব করিয়া একটা কাজও তো পাইয়াছে।—সে দেখিল, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি ও সহাস্য মুখ তেমনই থাকিলেও সে অটুট স্বাস্থ্য আর তাঁর শরীরে নাই, জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে ! তখন সে নিজের জন্যই বিশেষ করিয়া ভীত হইল। এমনই ছাই ভরা ভাঙ্গা কপাল তার, যে আশ্রয়টা সে অবলম্বন করিতে যায়, তাহাই তার হস্ত স্পর্শে যেন খসিয়া পড়ে। এ আশ্রয়হারা হইলে তার মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই—অথচ এখন এই মৃত্যুর মত বিভীষিকা তার পক্ষে যেন আর কিছুই নাই ! তাকে যে কোথায় লইয়া যাইবে, এ অনিশ্চিততার মধ্যে ডুবিতে তার আদৌ সাহস হয় না !—হায়, এত বড় অভিশপ্ত জীবন লইয়াও কেহ জগতে জন্মগ্রহণ করে ?

মধ্য রাত্রি। এদিকে জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত জন-মর্দ্দিত রাজপথ বিশ্বনাথের কণ্ঠভূষণ বিশ্রামশীল সুবৃহৎ অজগরের মতই নিঃসাড়া পড়িয়া আছে। ওদিকে কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা মায়ের রজতমেখলাসন্নিভ শুভ্র বারিরাশি জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। তীরের মন্দির, হর্ম্ম্যমালাও সেই জ্যোৎস্নাজালে বিজড়িত হইয়া সুন্দর রূপ ধরিয়াছে। কমলা ছাদে বসিয়াছিল। চরাচর নিদ্রামগ্ন কেবল বীতনিদ্রা প্রকৃতি তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডালি সাজাইয়া বিশ্বনাথের চরণ-প্রান্তে চাহিয়া স্তব্ধ রহিয়াছেন।

দূরে—অদূরে ইতস্ততঃ কোথাও মন্দিরের উচ্চ চূড়া কোথাও মসজিদের উচ্চ গম্বুজ, কোথাও সমুন্নত প্রাসাদ চূড়া স্ফুট জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হইতে হইতে শত পৌরাণিক ঐতিহাসিক যুগের পতন অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরপারে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে রাজদুর্গ রামনগরের আলোক-মালা প্রকাশ পাইতেছিল।

কমলা বহুক্ষণ সেই অগণ্য নক্ষত্র-খচিত অসীমের পানে নির্নিমেষ চক্ষে তাকাইয়া রহিল তাহারা প্রতিদিনের মতই চির অবোধ্য! দৃষ্টি নামাইয়া সম্মুখে সলিল-রেখার দিকে উন্মাদনাহীন স্থির লক্ষ্যে সেই একই পথেই সেওতো চির যাত্রিণী। সে সুগভীর শ্বাস মোচন করিয়া আত্মগত মৃদু স্বরে কহিল—"আমার মনে অমনই একনিষ্ঠা কেন থাকতে পেল না? এ' আমি কি করি! উঃ—কি করিগো আমি?"

এই প্রত্যাশাহীন আকুল প্রশ্নের উত্তর অতি স্নিগ্ধকণ্ঠেই কে' তাহাকে প্রদান করিলেন—"ক্ষুদ্র কামনা সেই এক পারাবারে ডুবিয়ে দাও মা! একনিষ্ঠ তুমিও হবে।" এ' কি দৈববাণী?—কমলার দুর্ব্বল দেহমন বিস্ময়পুলকে আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের ন্যায় চমকিয়া ঈষদুচ্চ আর্ত্ত-কণ্ঠে কহিল—"কে' সেই এক?—বলে দাও—বলে দাও—আর এ সন্দেহ যে আমি সহ্য করতে পারছিনে—বল, বল, এ জন্মের সব সম্বন্ধ কেমন করে আমি মুছে ফেলব?—আমার কি হবে?"

জলেও যেমন স্থলেও তেমনি চন্দ্রছায়া থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সেই কম্পিত আলোকে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রে তিনি অধিকাংশ কালই এই ছাদে মুক্ত আকাশ তলেই কাটান, কমলা তা' জানিত না, অথবা সে কথা তার মনে ছিল না। তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"যদি নিষ্ঠা দান করতে পার তবে ভঙ্গুর নশ্বর পদার্থের উপর ঐকান্তিকতার অপব্যয় কেন কর্ব্বে মা? যাঁকে পেলে পাবার কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে একবার পেলে আর হারাবার ভয় নেই—যদি পেতে চাও—যদি নিতে পার, তবে তাঁকেই কেন চাও না, তাঁরই পায়ে সব সঁপে দাও না, মা!"

কমলা সেই হৈম জ্যোৎস্নায় পরিস্ফুট মূর্ত্তি তাঁর পানে চাহিল। সেই সৌম্য শান্তমূর্ত্তির মধ্যে প্রকট রহিয়াছে দুঃখ-হরণ দয়ালরূপ! যে সন্দেহে,

যে সংশয়ে তার পীড়িত চিত্ত কঠোর পাষাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা এই মুখের আশ্বাস বাণীতে গলিয়ে গেল। সে একটীও কথা কহিল না—নীরবে জ্যোৎস্না-জড়িত অঙ্গার জলে চাহিয়া রহিল। ঐ সুশীতল পবিত্র সলিল—কার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছে? উর্দ্ধে চাহিল—ওই যে সচন্দ্র তারকাদল নীলাম্বরে চিরগাম্ভময়—সেই বা কার প্রেমে? এই দৃশ্য অদৃশ্য—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ছোট বড় জীবন সেই একজনের পানে চাহিয়াই ত বাঁচিয়া আছে! তিনি আছেন—তিনি আছেন। ফুলের কলি যেমন ঊষার বাতাসে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তেমনি করিয়া তার অন্ধকার হৃদয়-মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ আলোক রেখা সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সে রুদ্ধ শ্বাসে ডাকিল—"বাবা!—আমি ত কিছুই জানি নে, আমায় আপনি শিখিয়ে দিন। কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয় ভুলেই গেছি।—নিষ্ঠুর পাষাণ বলে, অবিচারক বলে তাঁকে বহুকাল ধরে ডাকাই ছেড়ে দিয়ে ছিলাম—তিনি কি সে পাপ আমার ক্ষমা করবেন, বাবা?"

"সে কি মা! ক্ষমা করবেন না?—তিনি যে ক্ষমাময়—মানুষের সমস্ত ভুল, তার সব অপরাধই তিনি ক্ষমা করে থাকেন—ক্ষমা করাই যে তাঁর ধর্ম্ম। শুধু প্রাণভরে ব্যাকুল চিত্তে ডাকতে হবে, প্রাণমন ঢেলে দিয়ে ডাকতে হবে।"

"তিনি সকলকেই ত ক্ষমা করেন? আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, আমি তাঁর জন্যেই ক্ষমা চেয়ে নেবো।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁর উদার দৃষ্টি রজত জ্যোৎস্না-মণ্ডিতা শুভ্র বসনা ব্রতচারিণীর প্রতি স্থাপন করিলেন—শান্তস্বরে কহিলেন—"ভালই হবে মা! বন্ধন-ভয় ঘুচে যাবে।"—কমলা দুই হাতে তাঁর পদধুলি মাথায় লইল—কহিল—"আপনার কাছেও ক্ষমা চেয়ে গেছেন—আপনিও ক্ষমা করবেন কি?"

"আমি!—আমার মনে ত তার প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই, মা! জগতে কাহারও উপর ত কখনও আমার মনে বিরুদ্ধ ভাব আসে না—তবে সন্তানের পাপে পিতারও অংশ থাকে—সেইটুকু গ্লানি মাত্র! ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন—এ আশীর্ব্বাদ আন্তরিক ভাবেই করি।"

কমলা আর কথা কহিল না। প্রসুপ্ত যামিনীর এই মধ্যযামে আপনা ভুলিয়া সে আজ যাহা বলিবার—যাহা জানিবার, সবই বলিয়াছে, সমস্তই জানিয়া লইয়াছে—বলার বা শোনার আর তার কিছুই বাকি নাই।—এখন শুধু কঠোর তপস্যায় নিজেকে দগ্ধ করিয়া সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তখনই মরণে শান্তির একবিন্দু আশা, এত বড় আশা আর যে কিছুই তার পক্ষে নাই। সে পলকহীন নেত্রে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া গড়া মূর্ত্তির মত খদ্যোতিকা-ঝলমলায়মান পরপারের অন্ধকার তরুশ্রেণীর পানে চাহিয়া রহিল। গভীর হতাশায় নূতন আশার উন্মেষে মনের মধ্যেও শত শত খদ্যোতবিন্দু ফুটিয়া উঠিতেছিল।—'যাঁকে পেলে আর কারুকে পেতে হয় না—সেই একমাত্রকে পা'বার কামনা ছাড়া অন্য সকল বাসনাই তাঁর চরণে নিবেদন করে দিলাম—হে বিশ্বনাথ! তুমি আমার এই একমাত্র প্রার্থনা পূর্ণ করো।

উনষাট

ত্রিপাদগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণে বহু লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইযাছে।

রাজপথে নরমুণ্ডের সারি সমুদ্র তরঙ্গের মত কলরব মুখর। কমলা অসিঘাটে স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভূতাহতবৎ অস্থির হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রাণভয়ে ভীতা শঙ্কিত হরিণীর মত ছুটিয়া দুর্গা বাড়ীর গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ধ্যান, জপ, মন্ত্র তন্ত্র এক মুহূর্ত্তে যেন সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িযাছে—এমনই অপ্রত্যাশিত—অতর্কিত এ আঘাত।

দুর্গামন্দিরে সে সময় মানুষ বেশী ছিল না—বানরেরই পূর্ণ রাজত্ব!—সে পিছনের অশ্বত্থতলায় আসিযা বসিয়া পড়িল। আকস্মিক উত্তেজনায় একটা কাজ সে করিযা ফেলিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণে দারুণ অবসাদে শরীর মন যেন ভাঙ্গিযা পড়িতে চাহিতেছে। মনে হইল, সেই মানব-তরঙ্গের মধ্য হইতে আজ মাথাটা টানিয়া না তুলিলেই ত সবহ চুকিয়া যাইত। সে নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল। রশ্মিহীন রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মনে হইল—জগতের প্রাণ রূপ সূর্য্য—এঁর এত বড় সর্ব্ববিশারী শক্তিও ক্ষণেকের জন্য প্রতিহত হয়ে থাকে—কিছুই ত জগতে বাধাহীন নয়—আমি কতটুকু!

সহসা শিহরিয়া শুনিল, কে তার পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—“এ’কি!”

কমলা মুখ ফিরাইল।—দুর্গে! এ দৃশ্য আবারও দেখাইলে? গঙ্গাতীরের সে তবে স্বপ্ন নয়? সত্যই সে আসিয়াছে?

নিশ্চল চরণ উঠাইয়া স্তম্ভিত মণীশ ঈষৎ অগ্রসর হইয়া শুভ্রবসনা বিধবার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণ পরে বিস্ময়মথিত স্খলিত কণ্ঠে কহিল—“তুমি এখানে—এ বেশে—কমলা!”

কমলা এখান হইতে উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অবসন্ন শরীর তাতেও তার সহায় হইল না। বিহ্বল মণীশ আবার তেমনি সন্দেহ-বিস্ময়ে মৃদু কণ্ঠে কহিল—“চিনতে পারছো না—কমলা? আমি মণীশ। তোমার এমন বেশ?”

মণীশ তাহাকে এত সহজে সম্বোধন করিতে পারিল, শচীকান্তর স্ত্রী

বলিয়াই এ আত্মীয়ভাব। সীসা গলিয়া অঙ্গে পড়িলে অসহ্য জ্বালায় দেহ যেমন জ্বলিয়া উঠে—নিজেরই অকস্মাৎ পতিত অশ্রুবিন্দুতে তার কোমল গণ্ড তেমনই জ্বালা করিয়া উঠিল। সে বিন্দু দুইটি দ্রষ্টার চক্ষে অদৃশ্য ছিল না। বিষাদ ক্লিষ্ট গভীর স্বরে সে কহিল—"সে নেই!—খবরের কাগজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শচীকান্তের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের কথা পড়েছিলাম, সে যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল জানতাম না, পদবীও লেখেনি, বিশ্বাস করি নি যে, সে—আমারই বন্ধু—আমার আবাল্য সখা সেই, সে অমন হয়ে চলে গেছে!"

মণীশের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। তার শোকপূর্ণ কণ্ঠ কমলার বক্ষ বিদ্ধ করিল। সে বিহ্বল নেত্রে তার পানে চাহিল!—কে'এ কথা বলিতেছে?—বন্ধু! সখা! বন্ধুপ্রেমে একান্ত বিশ্বাসঘাতক যে, সে তার বন্ধু? তার সখা? ওরে অভাগিনী কমলা! কা'র প্রতীক্ষায় তুই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলি? আজও কা'র দুরন্ত স্মৃতি-ভারে তোর সত্য সঙ্কল্প পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে,—সে কি এই তোর প্রতি এতটুকু আকর্ষণ হীন—বন্ধু-প্রেমিক মণীশ? শচীকান্ত ঠিকই বলিয়াছিল, মণীশ তাকে চিত্ত-কোণেও ঠাঁই দেয় নাই। দেখা হইয়া ভালই হইল।

বহুক্ষণ পরে মণীশ ব্যথাকাতর চক্ষে কমলার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কোথায় রয়েছ? খুড়িমা এসেছেন, তাঁর কাছে যাবে কি? আমরা এই কতক্ষণ এসে পৌঁচেছি। আমি আজ পিতৃহীন—আমার কাকাবাবুও আর এ জগতে নেই—খুড়িমা তোমায় পেলে খুসী হবেন।" কমলা এ কথা শুনিয়া বারেকের জন্য সকল বাধা ভুলিয়া সাগ্রহে মাথা তুলিল—তারপর সাশ্রুনেত্রে ঘাড় নাড়িল—"না।"

"খুড়িমা বড় কাতর হয়েছেন—তাঁর কাছে যাবে না?" এবার উদভ্রান্ত দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কমলা কহিল, "সেখানে আমার যাওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন কমলা?" মানুষের কণ্ঠে এমন স্বর বোধ করি কমলা এর পূর্ব্বে কখন শুনে নাই—কিন্তু মন তার তখন প্রতিঘাত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, নিজের বা অন্যের প্রতি মমতার লেশ মনে তার ছিল না—প্রাণপণ বলে চক্ষুলজ্জা

পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াই এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"সেখানে আপনি থাকবেন।"

মণীশকে সে যেন অগ্নিতপ্ত শেল দিয়া বিঁধিল, এত বড় অপমানজনক মন্তব্য তার মুখের উপর উচ্চারিত হইতে পারে এ ধারণা তার ছিল না—মুহূর্ত্তকাল আর্ত্ত চোখে তাহার দিকে সে চাহিয়া রহিল—তারপর শ্বাস গ্রহণের শক্তি ফিরিলে ক্ষীণ স্বরে কহিল—"তবে আমি সেখানে থাকবো না। তুমি গুরুদেবের কাছে যেও—তুলসী ঘাটের সেই বাড়ীতেই খুড়িমা উঠেছেন। আমি এখনি সেখানে ফিরেই বিদায় নেবো—তুমি পৌছবার পূর্ব্বেই আমি কাশী ছেড়ে চলে যাব, তুমি যাবে ত?" মণীশ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ মৃত মুখের চেয়েও বোধ হয় অধিকতর বিবর্ণ। সে যে আজ কতখানি দান করিল, কমলা হয় ত তা' বুঝিতেও পারিল না। জগতের একমাত্র সুখ খুড়িমার কোল, শোকজর্জ্জরিতা করুণাময়ীর সেবা ভার, গুরুর চিরপ্রার্থিত সঙ্গসুখ এক নিমেষে জীবন হইতে সমস্ত সার অংশটাই নিঙড়াইয়া ফেলিয়া সে তাহাকে দান করিল, নিজের জন্য রাখিল শুধু সুখহীন আশাহীন—নিঃস্বত্ব শুষ্ক কর্ম্মময় অংশটুকু। কিন্তু কমলার অত কথা বুঝিবার সাধ্য ছিল না, তারও সারা চিত্ত তখন নূতন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইতেছিল—সে তখন মানবীয় দুর্ব্বলতা-ভস্মকারী মহানলকে প্রাণপণ ফুৎকারে জ্বালিয়া নিজেকে দাহ করিতে নিযুক্ত ছিল—আর কিছুই সে ভাবে নাই, মাথা হেলাইয়া শুধু সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মণীশ কহিল—যাই কমলা!—এ জগতে আর হয়ত দেখা হবে না।"

"না না, এ জগতে নয়। অন্য কোন জগতের কোনখানেই যেন কখন আর দেখা না হয়, শুধু এইটুকু আশীর্ব্বাদ করে যান।" মণীশ আহত নেত্রে চমকিয়া চাহিল, এ জগতে বলিয়া সেকি তার অজ্ঞাতেও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে?—মুখ তার বিষ জর্জ্জরিত মুখের মৃত্যু-নীলিমার ন্যায় কালো দেখাইল। "কোথায়ও না দেখা হয়?—যদি না জেনে অপরাধী

হয়ে থাকি, ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—" স্খলিত জড়িত মত্ত চরণে মণীশ মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন কমলা উঠিয়া মন্দিরের আড়ালে পাষাণ চত্বরে লুটাইয়া পড়িয়া সকাতরে ডাকিল—"আমার মনে বল দাও—হে ঠাকুর! হে বিশ্বনাথ! ধ্বংস করো না, বাঁচতে দাও—যে পথ দেখিয়েছ যেন সেই পথেই আমি স্থির থাকতে পারি, অতীত যেন আমার মন হতে মুছে যায়।"

ষাট

সত্য তার পাঠ-কক্ষে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ নিরত। মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য চলন্ত চিত্রের ন্যায় ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। গৃহ সুসজ্জ আসনে, বসনে, আধারে, ভিত্তিতলে, দেওয়ালে সর্ব্বত্রই সুরুচি ও সম্পদশালীতা ব্যক্ত হইতেছে। পাঠশীল ছাত্রের কোন দিকে লক্ষ্য নাই। গভীর মনোযোগের সহিত সে পাঠে নিমগ্ন। পিছন হইতে একটি তরুণ মুখ চাপা হাসিতে মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিল—কানের কাছে হাসি ভরা গোলাপী অধর নামিয়া আসিয়া শব্দ করিল, "কুউ!" কৌতূহল মধ্য-পথেই বাধা প্রাপ্ত হইল—"ছিঃ গৌরী!—" বলিয়া সত্য ভ্রুকুটি করিয়া মুখ তুলিল।

"ছি—কিসের শুনি তো?" গৌরী ঈষৎ দমিয়া গেল।

"পড়ার সময় বাধা দাও কেন?" বলিয়া সত্য আবার পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

"ভারী ত পড়া!--বাব্বা!—কতো পড়বে বলতো, চব্বিশ ঘণ্টা!"

"দাদা যাবার দিন তোমায় কি বলে গেছেন—মনে নেই?—ভাল করে পড়লে মানুষ হবো--হ'লে দাদা সুখী হবেন- তুমি কি চাও না, যে দাদা অতটুকু সুখ পান?"

গৌরীর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল—কহিল- "হই।"

"তবে কেন বাধা দাও?"

"আর দোব না। তুমি দাদাকে বিয়ে কর্‌তে বলো না- কেন?"

সত্য এবার ফিরিল—"তাঁকে আমি কি বল্‌বো গৌরি? কি দুঃখে তিনি আজীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিলেন, তা' কি জানি নে, যে, বল্‌তে যাবো? তাঁর মনের দাগ ত জলের দাগ নয় যে মুছে যাবে, সোনার খোদাই।" সত্যর কেদারার হাতায় বসিয়া গৌরী কহিল—"তাঁর জন্য আমার ভারি দুঃখ হয়। কমলা যদি থাকতো—কত ভাল হ'ত, কেন যে তাকে ছোটমামা কেড়ে নিলে!"

সত্যেন্দ্র গভীর নিশ্বাসত্যাগ করিল—"বাবা সেই দুঃখ বুকে করেই তো চলে গেলেন। মৃত্যুকালেও দাদার মাথায় হাত দিয়ে বলে গেলেন, 'তোমায়

শুধু কর্ম্মই দিয়ে গেলাম, সুখী করতে পারলাম না।"

সত্যর দু চোখ সজল হইয়া আসিল, সে গভীর নিশ্বাস মোচন করিল।

"তুমি এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলো না—আমার কষ্ট হয়। সহসা কে' ডাকিল—"সতু—"

"এ'কি, দাদা!—এমন সময় হঠাৎ ফিরে এলেন যে!"

সত্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। গৌরী সলজ্জ মুখে দ্বারান্তর-পথে ছুটিয়া পলাইল। ভাসুরকে সে লজ্জা করে না কিন্তু ভয় করে—এ সময় সত্যর পাঠগৃহে তাহাকে দেখিয়া যদি মনে করেন, সে তাঁর ভাইয়ের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়, ভাইকে সরাইয়া লই।

মণীশের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাগমনে বিস্মিত নন্দকিশোর তার কুশল বার্ত্তা লইতে আসিলেন। সে তাঁহাকে বুঝাইল, খুড়িমা গুরু-গৃহে কতকটা শান্ত হইয়াছেন, বুঝিয়াই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার নৈশ বিদ্যালয়গুলি তার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। আর সতুকে ছাড়িয়া অত দূরে থাকাও তার ভাল লাগিল না!—নন্দকিশোর খুসী হইয়াই গেলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শিবনারায়ণ তাঁহাকে জানাইয়া ছিলেন—তাঁর স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি তিনি মণীশকে দান করিতেছেন—সে ইহা ইচ্ছানুরূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবে। নন্দকিশোর প্রসন্ন চিত্তে উত্তর দিয়াছিলেন—"খুব ভাল কথা!" তিনিও ইতিমধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কন্যা জামাতা উভয়কেই তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়া উইল-পত্র লিখিয়াছেন—বলিলেন, ওদের পক্ষে সেই যথেষ্ট।

করুণাময়ী সংসারে বীতস্পৃহা হইয়া যখন কাশীবাস করিতে চলিয়া গেলেন, তখন নন্দকিশোর নিজের স্বার্থ ভুলিয়া গৌরীকে তাঁর সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পতিহীনা সর্ব্বত্যাগিনী সতী পুত্র পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অবিচল কণ্ঠে কহিয়া ছিলেন—"সতি! গৌরী! তোরা আর আমায় জড়াতে চাস্‌নে—তোরা সুখে ঘর কর্‌ তা' হলেই আমি সুখী হ'ব।—এ শুধু আমাদের সন্ন্যাসী মায়ে-পোয়ের বাসা বাঁধা—তোরা সেখানে কোথায় যাবি।"

সকলে বুঝিয়াছিল করুণাময়ীর চিত্ত তাঁর স্বামীর সঙ্গেই সহমৃতা হইয়াছে, তাঁর ব্রহ্মচর্য্যপূত দেহখানা যে ক'দিন এ পৃথিবীর মাটিতে থাকে, শান্তির স্থলেই আশ্রয় পাক্—সত্য বুক ফাটিয়া কাঁদিল, বাধা দিল না। সে জানিত তার দাদাকে লইয়া মা অনেক আবামেই থাকিবেন।

নন্দকিশোর চলিযা গেলে মণীশ চাহিয়া দেখিল সত্য তার মুখের দিকে ঠায চাহিযা আছে তাব সারামুখ লাল হইযা উঠিল। সত্য কাছে আসিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকিল—"দাদা ?"

"সতি !—"মণীশ মুখ নত করিল।

"কি হযেছে দাদা ? মা,—মা বেঁচে আছেন ত ?"

নত মস্তকে মণীশ বলিল—"হ্যাঁ সতি, মা ভাল আছেন।"

উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিযা উৎকণ্ঠিত স্ববে সত্য কহিল—"তবে কি হয়েচে—আমায তুমি বলবে না, দাদা ?—নিশ্চয় কিছু একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে, যাতে তোমাব তেমন মুখকেও এমন কবে দিতে পারে !—দাদা ! আমায় বলবে না ?"

মণীশ মুখ তুলিল—কহিল—"তোকে কেন অনর্থক কষ্ট দিই সতু ? এই একটা দিন আমায় মাপ কর ভাই। আব কখনও তোর দাদাকে এমন আত্মবিস্মৃত দেখতে হবে না।"

"দাদা ! আমি কি তোমাব দুঃখেব সঙ্গী নই ?—শুধু তুমি আমায় দেবে, কিছুই কি ফিবিযে নেবে না ? আমায কেন লুকোচ্চ ?"

মণীশ তাব ব্যথা কাতর মুখখানা কম্পিত হস্তে বুকে টানিয়া লইল—ততোধিক কম্পিত স্ববে কহিল—"বলছি সতু !"—তার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, গলা ঝাড়িয়া বলিল—"আমার এ জগতের শেষ সুখ আজ আমি তাকে দিয়ে এসেছি—যে কোলে একা আমারই স্থান ছিল—তোরও যেখানে ভাল করে জায়গা হয়নি, সেখানে আমি আব কখনও যাব না সতি ! সেখান থেকে আমার চিব নির্ব্বাসন হয়ে গেছে।"

সত্যও অনেকক্ষণ কিছু বুঝিল না, তাই সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বহিল, পবে একটা সম্ভাবনার কথা হঠাৎ মনে

পড়িয়া যাওয়াঙ্গ সে কহিয়া উঠিল—"কাকে ?—তিনি—বৌদি, কমলা—কি এখানে ?"

"হ্যাঁ—সে এখন বিধবা। শচী বেঁচে নেই, সে অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনে পুড়ে প্রাণ দিযেছে।"

"দাদা"

অকস্মাৎ নিবিড অন্ধকাবে সত্যর চিত্তে যেন একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। মুখ তার আশায ও সন্দেহে আবক্ত হইয়া উঠিল, কহিল—"একটা কথা বলবো দাদা ?—বল—রাগ করবে না ?"

মণীশ এ আবেদনে চমকিযা উঠিল, বাধা দিয়া আকুল কণ্ঠে কহিল—"না, না, সতু ! না না,—তুমি যা বলতে চাইচো আমি বুঝেছি। তাকে কথা দিয়ে এসেছি, এ জগতে তাব সঙ্গে আমাব আব কখনো দেখা হবে না। সে আশীর্ব্বাদ চেয়েছিল, 'শুধু এ জগতেই নয, ইহ পব কোন লোকেই যেন আর আমাদের দেখা না হয়।'—কিন্তু সে তো হয়না রে। আমি জানি এ জীবনের পরপাবে যে আনন্দময অনন্ত লোক আছে। সেখানে আমবা প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেই 'আবার তাঁবই পাদ পদ্মে পবম শান্তিব মধ্যে সম্মিলিত হবো। সেখানে জাগতীক সুখ দুঃখ বন্ধন মুক্তি কিছুই নেই, আছে শুধু পরিপূর্ণ আনন্দ—আর সেই আনন্দই তো ব্রহ্ম।



সমাপ্ত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।